দ্বারমণ্ডল

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাইমা পাবলিকেশনস্
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭১

উপমা সেনগুপ্তা, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
সুকুমার ঘোষ, ইউনিক প্রিন্টার্স, ৯এ, রামধন মিত্র লেন হইতে মুদ্রিত।

দ্বারমণ্ডল

১

নিশীথ রাত্রি

পল্লীগ্রামে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ঘড়ি নাই এমন নয়। শিবকালীপুরের জগন ডাক্তারের একটা পকেট-ঘড়ি আছে, হরেন ঘোষালের একটা রিস্টওয়াচ আছে, বর্তমান পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষের একটা ক্লক আছে, চেন-ঘড়িও আছে, কিন্তু তবুও সকলকে রাত্রি আন্দাজ করিয়া বাহির হইতে হইল। ডাক্তারের ঘড়িটা সময় ঠিক রাখে না, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, ডাক্তার রেসপিরেশন দেখিবার সময় বার দুই নাড়া দিয়া ঘড়িটাকে চালু করিয়া রোগীর বুকের উপর রাখিয়া দেয়—তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়। আজ ডাক্তারের ঘড়িয়া আটটা বাজিয়াই বন্ধ হইয়া আছে। ঘোষালের ঘড়িটা চলে না, চালাইলে এমন ছুটিয়া চলে যে, সন্ধ্যা ছয়টায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া যায়। শ্রীহরি ঘোষের বাড়িতে ঘড়ি দেখিতে কে যাইবে, বাড়ির দরজায় আজকাল একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান বন্দুক লইয়া পাহারা দেয়।

আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বাঁকানো দাঁড়াটা ঠিক মধ্য আকাশের দিকে প্রসারিত। পূর্বদিগন্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জঙ্গলটার মাথায় আকাশ লালচে হইয়া উঠিয়াছে। নিচে দিগন্তে কৃষ্ণা একাদশীর চাঁদ উঠিতেছে। এগার দণ্ড গুণে বাইশ-দণ্ড রাত্রি পার হইতেছে, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পার হইয়া তৃতীয় প্রহরের দরজায় টোকা মারিতেছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া নলিন বৈরাগী দেখিল—আকাশে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ছায়াপথে জ্যোৎস্নার আমেজ ধরিয়া চলিয়াছে ঠিক বন্যার জলের আগে সঞ্চরমান মাটি-বিছান জলের রেশের মত। পূর্বদিকে তারা-ফুলের ক্ষেত্র জ্যোৎস্নায় ডুবিয়া গিয়াছে। অল্প কতকগুলি তারা জাগিয়া আছে—বড় গাছের মাথায় ফুলের মত। নলিন ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে, প্রতিমা তৈয়ারী করে। সে মুগ্ধ হইয়া আকাশে এই জ্যোৎস্না সঞ্চারের খেলা দেখিতেছিল। জগন ডাক্তার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—হাঁ-করে আকাশ পানে তাকিয়ে আছে, দেখ! চল, আলো নে।

দশ-বারোজন বাহির হইল। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মাতব্বর জন আষ্টেক ও তাহাদের সঙ্গে নলিন এবং সতীশ বাউড়ীও চলিয়াছে—তাহাদের হাতে দুইটা হ্যারিকেন। হরেনের কাছে দুর্বল ব্যাটারির একটা টর্চও রহিয়াছে। গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া তাহারা মাঠে নামিল।

পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠ। পূর্বদিকে দেখুড়িয়া, তারপর মহাগ্রাম; মহাগ্রামের পর শিবকালীপুর। এদিকে ঐ কুসুমপুর, তার ওদিকে কঙ্কণা। সম্মুখে মাইল খানেক দূরে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ। বাঁধের উপরে ঘন গাছের সারি, কালো উঁচু পাঁচিলের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পূর্বদিকে গাছগুলির মাথায় চাঁদের আলোর লালচে ছটা লাগিয়াছে; দক্ষিণদিকে গাছগুলির মাথায় ঊর্ধ্বলোকে সাদা আলো ভাসিতেছে। জংশন স্টেশনের ইয়ার্ডে কেরোসিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। জংশন দ্বারমণ্ডল। লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া থাকে—জংশন।

কার্তিক মাসের পাঁচ তারিখ। আজ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, আগামী অমাবস্যায় কালীপূজা। বাঁধের গাছের বেড়ের মাথা ছাড়িয়া চাঁদ এখনও উপরে উঠে নাই। পঞ্চগ্রামের মাঠ এখনও অন্ধকার। মাঠে মাঠভরা ধান। আলো হাতে দলটি মাঠে নামিল, দুই পাশে কোমর পর্যন্ত উঁচু ধানের মধ্যবর্তী আল-পথ—আলোর শিখা ধানের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিকে মহাগ্রামের সামনেও মাঠের মধ্যে আলোর ছটা। দেখুড়িয়া হইতেও আলো বাহির হইয়া আসিল। ধানের আড়াল হইতে শিখা ঢাকা হ্যারিকেনের আলোর আভাস উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আলোর সঙ্গে চলন্ত মানুষগুলিকে ছায়ামূর্তির মত মনে হইতেছে। গ্রামগুলি হইতে সারি সারি ছায়ামূর্তি চলিয়াছে। সব চলিয়াছে একমুখে—ওই পাঁচ-ভাইয়ের বাঁধ, অর্থাৎ বন্যারোধী বাঁধের অভিমুখে।

বাঁধের উপর তাল, শিমুল, শিশু, শিরীষ, অর্জুন, বেল, বাবলা প্রভৃতি গাছের ঘন সন্নিবেশ ; দুই পাশে বাঁধের কোলে ঘন শর জঙ্গল। শিমুল গাছটার মাথা সকল গাছকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

হরেন ঘোষাল চিরকালের চিৎকার-ঝঙ্কার করা মানুষ। মাঠে পড়িয়াই সে ভূত-প্রেতের স্তোত্র আরম্ভ করিল। এখানকার দেশ-প্রচলিত স্তোত্র কবে কোন্ গ্রাম্য অর্ধ-সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত রচনা করিযাছিল কে জানে ?

ব্রহ্মপ্রেত বিল্ববৃক্ষে শ্যাওড়া গুল্মেচ প্রেতিনী
নৃত্যতি শাল্মলী শীর্ষে শাঁকচুন্নী ভয়ঙ্করী
ঝুলমান শিংশপায়াং কণ্ঠে রজ্জু গলায় দড়ে,
ডাকিনাঃ ধাবন্তি মাঠে—মুখে অগ্নি ধ্বকং ধ্বকং।
নমো অগ্রে ব্রহ্মপ্রেতং ॥

জগন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—ঘোষাল, এত বয়েস হল তবু ছেলেমানুষী গেল না তোমার ? ছিঃ !

হরেন হাতের টর্চটা শিমুলগাছের মাথার দিকে ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—ছেলেমানুষী ? ছেলেমানুষী হল ? ভূত নাই ? বিশ্বাস কর না তুমি ? রাত্রে একলা হাঁটতে পার ওই বাঁধের উপর দিয়ে ? বাঁধ তো বাঁধ, দুর্গা মরল বিষ খেয়ে—দুর্গার পোষা বিড়ালটা কাঁদে ; আমরাও বাবা মানুষ, চালের ভাত খাই, ধানের ভাত খাই না—

জগন বলিল—নাঃ গেল যাঃ ! তাই বলছি নাকি আমি ? ভূতের তর্ক আমি করি নাই, ভূতপ্রেত আমি মানি, হাজার বার মানি। দেবুমাস্টারের মত প্রাইভেটে বি-এ পাসও করি নাই—এত বড় ইংরিজিনবীশ লায়েকও হই নাই। আমি বলছি সবেরই একটা সময় আছে। একটা বড় কাজে চলেছিস—একসঙ্গে দশ-বারোজন রয়েছি—এখন আর ভূত-ভূত কেন ?

—বাস্ বাস্। ভূত মানো যখন বলছ, তখন আর ঝগড়া নাই, আমি চুপ করছি।

রামনারায়ণ বলিল—ভূত আছে বৈকি। স্বগ্য আছে, নরক আছে, আর ভূত নাই ? তাই হয় নাকি ? তবে 'পেত্য' ভূত নয়, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শেয়ালের মত একরকম জন্তু। বুয়েচ না—হাঁ করবে আর আলো জলে উঠবে মুখের ভেতর।

আরেঃ বাপ্‌রে—সে এক তাজ্জব ব্যাপার!

জগন ডাক্তার ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। বড় কাজের ভাবনা।

সমস্ত অঞ্চলটা থমথম করিতেছে। সমস্ত নির্ভর করিতেছে একটি লোকের কথার উপর। মহাগ্রামের শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন। দশ বৎসর পূর্বে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া কাশী গিয়াছেন। বাড়িঘর-জমি সব ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহারই একজন ছাত্র ন্যায়রত্নের পিতৃপুরুষের টোলটি কোনমতে বজায় রাখিয়াছে, সেই এখানকার দেবকর্ম চালায়। জমি-জেরাতের উৎপন্ন হইতে এখানকার খরচপত্র চালাইয়া উদবৃত্ত যাহা থাকে পাঠাইয়া দেয়। তাও পাঠানো হয় ন্যায়রত্নের পৌত্র-বধূর নামে। ন্যায়রত্ন নাকি স্পর্শও করেন না এসব টাকাকড়ি। তিনি নাকি কাশীর ঘাটে বসিয়া ভাগবত কথকতা করেন। সমাগত শ্রোতারা যাহা দিয়া যায় সেই অর্থ হইতেই তাঁহার চলে। সেই মানুষকে আজ বাধ্য হইয়া এ-অঞ্চলের সকলের অনুরোধে সরকারী অনুজ্ঞায় ফিরিয়া আসিতে হইতেছে।

আজই রাত্রি সাড়ে-তিনটায় ডাউন বেনারস এক্সপ্রেসে জংশন দ্বারমণ্ডলে তিনি নামিবেন। সেই কারণেই তাহারা এ-রাত্রে দ্বারমণ্ডল জংশনে চলিয়াছে।

শুধু তাহারা নয়—ওই মহাগ্রামের দল, ওই দেখুড়িয়ার দল, সব এই জন্যই চলিয়াছে। শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ সন্ধ্যাতেই গরুর গাড়ি জুড়িয়া দ্বারমণ্ডল চলিয়া গিয়াছে, ডাকবাংলায় আছে। কঙ্কণার বাবুদেরও কেহ একজন ওখানেই থাকিবে। এ ছাড়াও, অর্থাৎ এই পঞ্চগ্রাম ছাড়াও এ অঞ্চলের আরও অনেক গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিয়াছে। দ্বারমণ্ডল জংশনের মাড়োয়ারি এবং অ-নগণ্য ব্যবসাদারেরা তো আছেই। সদর শহর হইতে হিন্দু মহাসভার লোক, কংগ্রেসের লোক এবং ব্যক্তিগতভাবে আরও বড় বড় উকীল, জমিদার, ব্যবসায়ীরও আসিবার কথা। তাঁহারা হয়তো রাত্রে আসেন নাই, কাল সকাল সাড়ে-আটটার ট্রেনেই সকলে আসিয়া হাজির হইবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিবেন, পুলিশ সাহেব সম্ভবত দ্বারমণ্ডল বাজারেই আছেন, এস-ডি-ও আসিবেন, সার্কেল-অফিসারের দ্বারমণ্ডলেই আপিস। কলিকাতা হইতে হিন্দুমহাসভার কোন হোমরা-চোমরাকে আসিবার জন্য তার করা হইয়াছে। কেহ-না-কেহ নিশ্চয় আসিবেন বলিয়াই জগনের অনুমান।

* * *

সমস্ত অঞ্চলটা থমথম করিতেছে। দ্বারমণ্ডল জংশনের চারিদিকে চারিটি পঞ্চগ্রাম, অর্থাৎ বিশখানি গ্রামে বোধহয় এক মুহূর্তে আগুন লাগিয়া যাইবে। রক্তগঙ্গা বহিবে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রোশ ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

দ্বারমণ্ডল জংশন স্টেশন হইতে দুই-তিন মাইল দক্ষিণে হাট দ্বারমণ্ডল এ-অঞ্চলের বহু প্রাচীন বাজার। প্রাচীনকালে এখানে বহু প্রসিদ্ধ হাট বসিত। হাট আজও আছে, কিন্তু হাটের সে প্রসিদ্ধি আর নাই। দ্বারমণ্ডল বাজারের উত্তর প্রান্তে হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ দেবীস্থান আছে। জয়তারা দেবীর আশ্রম; লোকে বলে সিদ্ধপীঠ। জঙ্গলে ঘেরা মনোরম স্থান। প্রাচীনকালের মন্দির, একটি দীঘি এবং আরও খানদুয়েক খড়ো ঘর

ঘিরিয়া চারপাশে বুনো শ্বেতকাঞ্চন, পলাশ, বেল এবং বনশিরীষের জঙ্গল। তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কম নয়। এই দেবীস্থানের পশ্চিম দিক দিয়া—উত্তর মুখে চলিয়া গিয়াছে দ্বারমণ্ডল বাজার হইতে নদীর খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রাচীনকালের সড়ক। দ্বারমণ্ডল হাটের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে যে বাদশাহী সড়ক—সেই সড়ক হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে; রেললাইন বসিবার আগে হাট দ্বারমণ্ডলের উত্তর দিকটায় তিন মাইল ব্যাপী একটা পাথরে প্রান্তর ধূ ধূ করিত। শুধু বর্ষার সময় এই প্রান্তরটার ওই খেয়াঘাটের চারিপাশে খড়ের চালা তুলিয়া বাজার বসিত। নদীর ঘাটে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর মোহানা হইয়া এখানে দেশ-বিদেশের নৌকা আসিয়া কেনা-বেচা করিত। এই হেতু ওই খেয়াঘাটের নামই দ্বারমণ্ডল ঘাট বা ঘাট দ্বারমণ্ডল। রেলস্টেশন হওয়ায়—ঘাট এবং হাট দ্বারমণ্ডল দুই-ই প্রায় বিলুপ্তির মুখে, লোকে বলে কানা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে-সব কথা থাক।

হাট দ্বারমণ্ডলের উত্তরপ্রান্তে এই জংশনে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পীঠ হিসাবে আরও অনেক প্রাচীন, কিন্তু সে পীঠ-মাহাত্ম্য নাকি অজ্ঞাত ছিল, স্বপ্নাদিষ্ট এই ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া সাধনা করিয়া নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই গুপ্ত-পীঠকে প্রকাশ করেন এবং এখানকার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পীঠ সম্পর্কে এখানে প্রবাদ—দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মানুষ আরোগ্য লাভ করে, মহাসঙ্কটে মানুষ পরিত্রাণ পায়, রাজরোষ প্রশমিত হয়, হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার হয়, ভিক্ষুক রাজপদ পায়, নিঃসন্তান সন্তান লাভ করে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হয়, দেবী প্রসন্না হইলে সবই হইতে পারে। মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হওয়ার কাহিনীও লোকে আজও বলিয়া থাকে। সেকালে ঘাটে যত নৌকা আসিত—হিন্দুর হউক, মুসলমানের হউক, কেরেস্তানের হউক—প্রত্যেক নৌকা হইতে পূজা আসিত। আজকাল নৌকা আসে না কিন্তু মুসলমানেরা এখনও আসে; মানসিক মানিয়া যায়, মানস পূর্ণ হইলে পূজা দেয়; হিন্দুরা পাঁঠাবলি মানসিক করে, মুসলমানেরা জঙ্গল প্রান্তে মুর্গীটিকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। হিন্দুদের নিম্নস্তরের মধ্যে সেকালে শূকর খাওয়ার প্রচলন ছিল। সে প্রচলন ক্রমেই বিরল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দুই বৎসর আগে পর্যন্ত দুর্গা পূজার সময় বিজয়া দশমীর ভোরবেলা জংশনটির অগ্নিকোণের প্রান্তে তাহারা শূকর বলি দিয়াছে।

দেবীস্থানের পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ঘাট-দ্বারমণ্ডল হাট-দ্বারমণ্ডলের পাকা সড়ক; সড়কের খানিকটা জঙ্গলটার নৈর্ঋত কোণের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এইখানে সড়কটার পশ্চিম দিকে একটা প্রাচীন নিমগাছের নিচে একটা উঁচু ঢিপি ছিল; ঢিপিটা মকদমশাহের ঢিপি বলিয়া পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান যাহারা এখানে পূজা দিতে আসিত তাহারা ওই ঢিপিটিতেও একটি প্রদীপ অথবা বাতি জ্বালিয়া দিত। কালের সঙ্গে হিন্দুদের প্রদীপ দেওয়া কমিয়া আসিয়াছে, ওদিকে মুসলমানদেরও জয়তারার স্থানে আসা বিরল হইয়াছে।

বিরোধ বাঁধিয়াছে এইখানে।

জংশন দ্বারমণ্ডলে তিরিশ বৎসর পূর্বে এক দিল্লিওয়ালা দরিদ্র মুসলমান আসিয়া ছোট একটি মনিহারির দোকান করিয়াছিল। সে এখন লক্ষপতি। গোটা জেলায় মনি-

ভারি মাল সরবরাহের ব্যবসা তাহার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। জংশন শহরে প্রকাণ্ড দোকান--পাঁচ-সাতখানা বাড়ি। আশপাশের গ্রামে প্রায় দুই-তিনশো বিঘা ধানজমির মালিক সে। ফৈজুল আলি সাহেবের ছেলে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বসিয়াছে। এই ফৈজুল সাহেব বৎসর কয়েক পূর্বে মকদমশাহের ঢিপিটা ছোট একটি সমাধির আকারে বাঁধাইয়া দেয় এবং ঈদ-রমজানের সময়ে এখানে নামাজ পড়িয়া ও বেড়া-ভাসানের সময় আলোকসজ্জা করিয়া স্থানটার মর্যাদা বাড়াইয়া আসিতেছিলেন।

গত বৎসর বিজয়া দশমীর সময় দেবী-স্থানের অগ্নিকোণে শূকর বলিতে তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায় আপত্তি তুলিয়াছিল। আপত্তি সফলও হইয়াছে। শূকর বলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চলিত প্রথা বলিয়া কোন আপত্তি না-করিলেও শূকর বলি সমর্থন করে না। যাহারা বলি দিত--তাহারাও ইদানীং এ-বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে।

এ-বৎসর রমজানের সময় স্থির হইয়াছে ওখানে একটি মসজিদ তৈয়ারী করিতে হইবে এবং দেবীস্থানের বাজনাতেও আপত্তি তুলিয়াছে মুসলমান সম্প্রদায়। আবার কানা-ঘুষা শুনা যাইতেছে—এবার বকর-ঈদের সময় ওখানে কোরবানী করা হইবে।

কালবৈশাখীর টুকরাখানেক মেঘ যেন বজ্রপাত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। ঘোষণা করিল, বিপর্যয় আসন্ন!

সমস্ত অঞ্চলটার মানুষ অকস্মাৎ চকিত পাখির মত কলরব করিয়া উঠিল।

সোমনাথ আক্রমণের কাল হইতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এইখানে বাসা গড়িয়া আছে। এ অঞ্চল—ও অঞ্চল কেন, সমগ্র রাঢ়ভূমিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিসম্পন্ন--দেশের ভূমির অধিকারীও তাহারাই। তাহারা চিৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

দ্বারমণ্ডলের জয়তারার স্থান এ-জেলার প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। বর্তমানকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্মে বিশ্বাস টলিয়াছে. তাহারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিতেছে, জয়তারার আশ্রমে তাহারা বড় আসে না। কিন্তু এ-সংবাদে তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় ব্যবসাদার, জমিদার, গৃহস্থ হইতে জেলার উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-মাস্টার, সকলেই বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, লাট-সাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাইল; খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশিত হইল, দেশের ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

ওদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ও আয়োজনের ত্রুটি রাখিল না।

বাংলাদেশে গত বৎসর হইতে মুসলিম লীগ দল মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়া দেশ শাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে এখানকার মুসলমানদেরও চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। জেলার মুসলিম লীগ কিছুদিন আগে সমারোহ করিয়া কনফারেন্স করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে—এ জেলার দরিদ্র, নির্যাতিত মুসলিম সম্প্রদায় অনেক সহ্য করিয়াছে, আর সহ্য করিবে না। সম্প্রতি এই ঘটনার প্রথমেই একদিন জেলা মুসলিম

লীগের সভাপতি ও সম্পাদক দ্বারমণ্ডলে আসিয়া ফৈজুল আলি সাহেবের বাড়িতে অতিথি হইয়া স্থানীয় মুসলমান মাতব্বরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন. মকদমশাহের দরগায় গিয়া সেখানে নামাজ পড়িলেন, সরেজমিনে নিজেরা সমস্ত দেখিলেন। তারপর একদিন চার হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া—মসজিদ তৈয়ারীর ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিলেন। কলিকাতায় প্রাদেশিক লীগ আপিসে নক্শার জন্য লেখা হইল, আরও লেখা হইল একজন মুসলিম নেতাকে পাঠাইবার জন্য—তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। ঘটনাটা জটিল হইয়া উঠিল। হিন্দুরা প্রতিবাদ করিল, দরখাস্ত পাঠাইল। মুসলমানেরাও দরখাস্ত পাঠাইল। ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, লাটসাহেব—উপরন্তু মন্ত্রীদের কাছেও দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

হিন্দুরাও তিন-চারিটি মামলা দায়ের করিযাছে। দেওয়ানী ফৌজদারী, দুই রকমের মকদ্দমাই দায়ের করিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উভয়পক্ষের প্রধানদের লইয়া মিট-মাটের চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুরা বলিতেছে—ওই দরগা আসলে মুসলমানদের তীর্থ-স্থানই নয়। তাহারা বলে—মুসলমান ফকিরের সমাধিস্থল একথা সত্য; কিন্তু মকদমশাহ জন্মগত জাতিত্বে মুসলমান থাকিলেও আসলে ছিলেন হিন্দু সাধক। হিন্দুমতে সাধনা করিবার জন্যই তিনি এই সিদ্ধপীঠের এক কোণে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প এখানকার প্রচলিত প্রবাদ-এর উল্লেখ করিয়া বলে—মকদমশাহ আজমীর শরিফে সাধনা করিতেন। সেখানকার খাদেমের তিনি প্রধান শিষ্য ছিলেন। সাধনায় প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়া তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণে বাহির এখানে আসিয়া দেবীস্থানের সিদ্ধপুরুষ সাধকের কথা শুনিয়া সাধকের কাছে লোক পাঠান—যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি যেন প্রস্তুত হইয়া থাকেন। পরের দিন ভোরবেলা দেবীর সেবক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ মুখ ধুইবার জন্য একটি প্রাচীরে উঠিয়া নিম-গাছের ডাল ভাঙিতেছেন—এমন সময় বাঘের গর্জনে সমস্ত দেবীস্থান থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মকদমশাহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কোথায় রে তুই, কাফের? শোন, আমার কথা তুই মন দিয়া শোন! তোর সাধনা যদি মিথ্যা হয়, ভণ্ডামি হয়—তবে আমার এই বাঘ থাবা মারিয়া এক লহমায় তোর বুকের পাঁজরা চুর করিয়া তোর কলিজা বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিবে। একমাত্র তুই যদি তোর ভণ্ডামি ছাড়িয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিস, তবে আমি তোকে রক্ষা করিব। কে, কোথায় তুই? মনেও ভাবিস না যে লুকাইয়া তুই পরিত্রাণ পাইবি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—অপেক্ষা কর। আমি যাইতেছি। বলিতে বলিতেই তিনি যে পাঁচিলের উপর দাঁড়াইয়া নিমের ডাল ভাঙিতেছিলেন, সেই পাঁচিল তাঁহার বাহন বা থ স্বরূপে চলিতে আরম্ভ করিল। বড় বড় গাছ পাশে কাত হইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। তাঁহার পাঁচিল আসিয়া মকদমশাহের সম্মুখে থামিল। তিনি বলিলেন—আমার আজ মহাভাগ্য, আজ প্রভাতেই আমি আপনার মতো মহাপুরুষকে অতিথি স্বরূপে পাইয়াছি।

ফকির মকদমশাহ অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। একটা মাটির পাঁচিল এমনভাবে

চলিয়া আসিতে পারে—এ তাঁহার কল্পনাতীত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার বাহন বাঘটার গর্জন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে সে স্থানটার চারিদিক দেখিতেছিল। ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—ওটা গত জন্মে এখানে কুকুর ছিল। সমস্ত জীবন এই আশ্রমে কাটাইয়াছিল, সেই পুণ্যে এ জন্মে বাঘ হইয়াছে। এই বলিয়া পাঁচিল হইতে নামিয়া তিনি বাঘটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলেন—বাঘটাও সানুরাগে ব্রাহ্মণের হাত চাটিতে শুরু করিল।

ফকির মকদমশাহ সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণকে বলিলেন—তুমি কে ?

—আমি সামান্য একজন মানুষ।

—তুমি সামান্য নও, অসামান্য।—বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের হাত চাপিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করিলেন। তারপর হইল কত বিচিত্র কথা। সাধনার গূহ্যতত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইল। অবশেষে দিনান্তে মকদমশাহ বলিলেন—এইবার আমাকে আতিথ্য গ্রহণের দক্ষিণা দাও।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—বল, কি দক্ষিণা চাও।

—তোমার সাধনতত্ত্বে আমাকে দীক্ষা দাও।

—তথাস্তু।

দীক্ষান্তে মকদমশাহ প্রশ্ন করিলেন—কতদিনে আমার সিদ্ধিলাভ হইবে? ব্রাহ্মণ যে নিমের ডালটি হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন—সেই ডালটির প্রান্ত হইতে একটি নিম-ফল লইয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—এইটাকে এখানে পোত। এটিতে জল দিও। এই বীজ হইতে অঙ্কুর হইবে, সেই অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ হইবে, সেই বৃক্ষে ফুল ধরিবে তাহার পর ধরিবে ফল—সেই ফল পাকিয়া মাটিতে খসিয়া পড়িবে। যেদিন প্রথম ফলটি মাটিতে খসিয়া পড়িবে—সেইদিন তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে। হইয়াছিলও তাই। এই নিমগাছটি সেই নিমগাছ। বর্তমানে হিন্দু জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে বাঁধানো দরগার নিচের ঢিপিটি সেই ফকিরের যোগের আসন। ওখানেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং মকদমশাহ জন্মগত জাতিত্বে মুসলমান থাকিলেও আসলে তিনি ছিলেন হিন্দু যোগী। এ-স্থানের সাথে মুসলমানদের কোন সংস্রব থাকিতে পারে না।

মুসলমানেরাও ইহার জবাব দিয়াছে।

তাহারা বলিয়াছে—ইহা একটি আষাঢ়ে গল্প। পৌত্তলিক হিন্দুর অলৌকিক কাহিনী ও প্রবাদ রচনার শক্তির একটি প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন। সামান্য সত্যকে কেন্দ্র করিয়া রাশি রাশি মিথ্যার খড়, মাটি ও রঙ সমন্বয়ে তাহাদের পুত্তলি নির্মাণের মতই একটি পুত্তলিকা মাত্র। আসল সত্য হইতেছে যে, মকদমশাহ আজমীর শরিফের একজন সাধক ছিলেন। এখানকার একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান তীর্থভ্রমণে আজমীর শরীফ গিয়া মকদম-শাহের নিকটে এখানকার মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। বলেন—সেখানে এমন কেহ মৌলানা নাই, এমন কোন ফকির হজরত নাই, যিনি হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের পৌত্তলিকতার অন্ধকার হইতে মুসলমানদের আত্মাকে আলোর সন্ধান দিতে পারেন। হজরত মকদমশাহ ব্যথিত হইয়া আজমীর শরিক হইতে এখানে মুসলমানদের

হিন্দুতান্ত্রিকতার ব্ল্যাক-ম্যাজিকের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসেন। সড়কের পশ্চিমদিকে ওই নিমগাছ এবং তাহার চারিদিকের জঙ্গলটুকু হিন্দুদের দেবীস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র স্থান। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমদিকে সুদীর্ঘকাল মুসলমান জাতির দুয়োরানী নামে ইংরাজের অপ্রিয়ভাজন এবং সন্দেহভাজন হইয়া থাকা ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুরা ইংরাজের সুনজরে থাকিবার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপর এ-অঞ্চলে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহারাই অর্থসম্পদ ও জমিদারীর অধিকারী হইয়া বসিয়া আছে। তাহারই ফলে মকদমশাহের দরগাকে তাহাদের দেবীস্থানের সামিল বলিয়া জবরদস্তি অধিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু চিরকাল একটা মহান ঐতিহ্যশালী জাতি ঘুমাইয়া থাকে না। ভারতবর্ষে মহান ইসলামের পুনরভ্যুদয় ঘটিতেছে। মুসলমানেরা জাগিয়াছে। আমাদের অধিকার আমরা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া ফিরিয়া পাইতে চাই। হজরত মকদমশাহের কালে এই স্থানে হাজার মুসলিম নামাজ পড়িয়াছে, হাজার বাতিতে রোশন জ্বলিয়াছে, মহান আল্লাহতালার নামে কত কোরবানী হইয়াছে। সে সবের প্রমাণ আজ বিলুপ্ত। কিন্তু যেখানে মুসলমান আছে, সেখানেই ইসলাম আছে, তাহার হাদিশ আছে, তাহার সকল প্রথা-পদ্ধতি অবশ্যই আছে। সুতরাং মকদমশাহের দরগার উপর আজ মুসলমানদের নবজাগরণের দিনে মসজিদ নির্মাণ করিবার অধিকার এবং ইসলামের নির্দেশ মত সকল আচরণ পালন করিবার অধিকার অবশ্যই তাহাদের আছে। এই অধিকার একবিন্দু ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আপস করিতে তাহারা নারাজ। পূর্ণ অধিকার তাহারা যে কোন মূল্যে অর্জন করিতে বদ্ধপরিকর।

অবশেষে দ্বারমণ্ডল জংশনে গভর্নমেণ্ট এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। সম্মেলন ঠিক নয়, আসলে সরকারীভাবে ব্যাপারটার তদন্ত হইবে। এ-অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিদের আহ্বান করা হইয়াছে। তাহারা সাক্ষী দিবেন। এই হিসাবে সর্বাগ্রে নাম উঠিয়াছে মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্নের। বয়স তাঁহার আশি পার হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার বাল্যকালে তাহার প্রপিতামহকে দেখিয়াছেন। এ-অঞ্চলের অন্তত আড়াইশ বৎসরের ইতিহাস তিনি জানেন। এ-ছাড়া এই মানুষটি সম্পর্কে এখানকার প্রত্যেকেরই একটি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা আছে: ন্যায়রত্ন মিথ্যা বলিবেন—এমন অপবাদ মুসলমানেরাও মুখ ফুটিয়া প্রচার করিতে পারে নাই। কুসুমপুরের দৌলত হাজির বয়সও অনেক, সত্তর-বাহাত্তর হইবে; এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে একজন বর্ধিষ্ণু এবং বিষয়ী লোক; আপন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাকে কুচক্রী বলিয়া অপবাদ দেয়—কটুভাষী বলিয়াও তাহার অখ্যাতি আছে। সেই দৌলত শেখ হাজিও তাঁহার নাম শুনিয়া বলিয়াছে—হাঁ, তা ন্যায়রত্ন ঠাকুরের বাত মানতে হয়। মানুষের মত মানুষ লোকটা। তা, সে আসুক। বিবেচনা করে বলুক না কেন ঠাকুর—হিন্দুরা যদি তাদের মতে পূজা করতে পায়, তবে মুসলমানেরা পাবে না কেন? তাদের কসুরটা কি? হিন্দুদের আস্তান আগের বটে, সে বাত তো কেউ না করছে না। তামাম হিন্দুস্তানে হিন্দুরা এসেছে আগে—তা বাদে এসেছি আমরা। সেই বিবেচনা করে সে কি বলে বলুক!

মোটকথা, হাজিও ন্যায়রত্নের কথা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিবার সংকল্প ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে, এমনি একটা শ্রদ্ধান্বিত সম্ভ্রমের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এখানকার লোক বলে—তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই।

শুধু সর্বসাধারণই নয়, সরকারী মহলেও তাঁহার এ-খ্যাতি খাতায় কলমে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথ ছিল বিপ্লবীদলের কর্মী। সেই সম্পর্কে একবার পুলিশসাহেব তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র পৌত্রের শুভাশুভ বিবেচনা করেন নাই। বলিয়াছিলেন—কথাটা যখন শুনেছি তখন জানি না বলব কি করে। আর যা সত্য, তা অস্বীকার করব কি করে? হ্যাঁ, বিশ্বনাথ বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছে সে কথা সে আমার কাছে স্বীকার করেছে। তবে এর অধিক কিছু সে বলেনি, আমিও আর প্রশ্ন করিনি।

পুলিশসাহেব বাঙালী হিন্দু। তিনি বলিয়াছিলেন—ন্যায়রত্নমশায়, আপনার একমাত্র পৌত্র, তাকে আপনি এইভাবে— আক্ষেপপূর্ণ অনুযোগ তিনি শেষ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন, তাই ওইখানেই চুপ করিয়া গিয়াছিলেন।

ন্যায়রত্ন উত্তর দিয়াছিলেন—বংশধারা গঙ্গা-প্রবাহের মত, সে প্রবাহ থেকে যে স্রোতটা পাশের ঢাল জমির আকর্ষণে কেটে বেরিয়ে যায়, তাকে কি টেনে ফেরানো যায়? সে চলে আপন বেগে, আর জমির ঢালের [illegible]। সেই তার পথ। সেই তার কর্মফলের গতি। ওতে আক্ষেপ করবার কিছু নাই।

একটু হাসিয়াছিলেন এইখানে। তারপর আবার বলিয়াছিলেন—দেখুন গঙ্গা থেকে পদ্মাস্রোত এমনিভাবে বেরিয়ে মহিমাহীন বলে অখ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ ভাগীরথী মজে এসেছে। গোমুখী থেকে যে জল যায় সাগর-সঙ্গমে, তাকে পদ্মার খাত ধরেই যেতে হয়। আজ আর তাকে মহিমাহীন বলে অপবাদ দিলে নিন্দুক-স্বভাবের পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। অন্তত, সত্য বলা হবে না। তাহলে পদ্মার সঙ্গে গোমুখীর মহিমাও অস্বীকার করতে হবে। আমাদের খাত মজে এসেছে।

এত সব কারণে সরকারি দপ্তর হইতেও তাঁহাকে সম্ভ্রমপূর্ণ আহ্বানপত্র পাঠানো হইয়াছে। দেশের সমস্ত লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই অনুরোধপত্র পাঠাইয়াছেন।

দেবু ঘোষ নিজে গিয়াছে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য। দেবু ঘোষের সঙ্গে সদর শহরের হিন্দুমহাসভার একজন সভ্যও গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন। এ ছাড়াও তাঁহাকে এ-যাত্রায় নিরাপদে লইয়া আসার দায়িত্ব আছে। অন্তত এখানকার লোকেরা তাই মনে করে। আরও একটা কথা আছে। দেবু ঘোষ আর আগেকার সেই দেবু ঘোষ নয়। সেই দেবু ঘোষ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নতুন মানুষে পরিণত হইয়াছে। প্রাইভেটে সে বি-এ পাস করিয়াছে। তিনকড়ি মণ্ডলের বিধবা মেয়ে স্বর্ণকে বিবাহ করিয়াছে। এখন সে জংশন শহরের বাসিন্দা, এখানকার কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি। জগন জানে কংগ্রেসের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দল আছে। দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী; তার মধ্যে আবার নানান দল। এমনি একটি বামপন্থী দলের সভ্য দেবু ঘোষ। অনেক বিচিত্র নতুন কথা বলে সে।

তাহার মধ্যে ধর্ম এবং সমাজ লইয়া এমন কতকগুলা কথা বলে সে যে জগনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়। দেশের সমস্ত কিছুকেই সে ব্যঙ্গ করিয়া, আঘাত করিয়া কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মুসলমানদের লইয়া এমন সব কথা বলে না। তাহাদের সম্পর্কে তাহার পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। কংগ্রেসও অনেকদিন হইতেই মুসলমানদের অযথা খাতির করিয়া আসিতেছে বলিয়া জগনের ধারণা, কিন্তু দেবু ঘোষের পক্ষপাতিত্ব কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি। এই সব কারণেই হিন্দুমহাসভাও একজন স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছে। খুব ভাল হইয়াছে।

বাঁধের উপর সকল দল একত্রে মিলিত হইল।

বাঁধের পর নদীর চর।

কার্তিক মাসের প্রারম্ভে এখনও পলিমাটি নরম রহিয়াছে। নদীতে এখন অনেক জল। শশীমাঝি খেয়া নৌকা লইয়া কিছুক্ষণ আগেই আসিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। নৌকার মাথায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।

এইটাই খেয়াঘাট।

এপারের ঘাটটার নাম পঞ্চগ্রামের ঘাট। ওপারে একটা বুড়া গাছ অজগরের পিঠের মত মোটা বাঁকা-শিকড় মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বহুকালের বট। ওপারে ওই বটতলাতেই নৌকা গিয়া লাগিবে। ওইটাই প্রাচীকালের দ্বারমণ্ডল ঘাট বা ঘাট দ্বারমণ্ডল। এইখানে একদা বর্ষার সময়ে বিশ-তিরিশখানা বড় বড় মালবাহী নৌকা বাঁধা থাকিত; ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাইত।

ঘাটের উপরে বসিত মেলার মত খড়ো চালার বাজার। জগন শুনিয়াছে সেকালে নাকি মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া, বর্ধমান প্রভৃতি শহরঅঞ্চল হইতে দশ-বারো ঘর দেহ ব্যবসায়িনী আসিয়া তিন-চার মাস থাকিয়া যাইত।

মধ্যে মধ্যে ডাকাত পড়িত। বড় বড় দল। লুটতরাজ করিয়া চলিয়া যাইত। সেই কারণে ফৌজদার এখানে তিন মাসের জন্য ফৌজ পাঠাইতেন।

ওই যেখানটায় এখন সাইডিং লাইনের সীমা আসিয়া উত্তর দিকে শেষ হইয়াছে—যেখানে সারি সারি বাক্সারগুলি রহিয়াছে, ওই জায়গাটিকেই বলে ফৌজদার মাঠ। আজও বলে।

সে-দিন আর এ-দিন। জগন মধ্যে মধ্যে দার্শনিক হইয়া উঠে।

আজ সারি সারি উজ্জ্বল কেরোসিন গ্যাসের আলোয় দ্বারমণ্ডল জংশনের বিস্তীর্ণ রেলইয়ার্ড ঝলমল করিতেছে। লাইন, লাইন আর লাইন। সারি-সারি, সারি-সারি লাইন আঁকিয়া-বাঁকিয়া পরস্পরের সঙ্গে বাঁধাবাঁধি করিয়া চলিয়া গিয়াছে অন্তত মাইলখানেকের বেশি। চওড়ায় অন্তত সিকি মাইল। ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া ইয়াড-টার দিকে তাকাইলে মনে হয়, এ যেন একটা অতিকায় কিছুর কঙ্কাল; যে পৌরাণিক যুগের কোন অতিকায় মহাবলশালী দৈত্য বা অসুরের কঙ্কালটা মাটি কাটিয়া বাহির করিয়াছে, অতৃপ্ত তৃষ্ণায় অবরুদ্ধ রোষ যাহা ছিল বুকের মধ্যে তাহারই স্পর্শে হাড়গুলা

এমনি কালো এবং কঠিন হইয়া গিয়াছে। অনবরত শান্টিং হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইয়ার্ডটা বিশ্বকর্মার পুরীর মত মুখরিত।

হরেন বলিল—জলদি কর। সিগনাল পড়ল, ডাউন দিলে—ওই দেখ। মুন-অর্নামেণ্ট—অর্থাৎ কিনা শ্রীমান শশীভূষণ জলদি কর।

খেয়া পার হইয়া তাহারা যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন প্ল্যাটফর্মটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। সকলে আসিয়া তাকাইয়া আছে ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের দিকে। ওই—ওই লাইনের উপর বেনারস এক্সপ্রেসের সার্চ-লাইটের ছটা পড়িয়াছে। চকচক করিতেছে। প্ল্যাটফর্মের উপর এই শেষ রাত্রেও দ্বারমণ্ডল হাটের চারিপাশের চার পঞ্চগ্রাম অর্থাৎ বিশখানি গ্রামের দুই-চারিজন করিয়া লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে লাইনের দিকে।

মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন আসিতেছেন। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুম হইতে চেয়ার আনিয়া রাখা হইয়াছে। বাহিরে একখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছে। দ্বারমণ্ডলের মাড়োয়ারী ধনী সুরজমলজীর বাড়িতে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তীব্র আলোক এবং উত্তাপ ছড়াইয়া এক্সপ্রেসখানা আসিয়া দাঁড়াইল।

প্ল্যাটফর্মের জনতা উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া খুঁজিতেছিল দেবু ঘোষকে অথবা হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবকটিকে। তাহাদের কেহ-না-কেহ জানালায় বা দরজায় মুখ বাড়াইয়া থাকিবে।

কৈ? কৈ? কোথায়? কোন্ দিকে?

দেবু! দেবনাথ! দেবু!

এইদিকে! পিছনের দিকে এই যে! এই যে!

সকলে ভিড় করিয়া পিছনের দিকে ছুটিল। এই যে! এই যে! গার্ডের গাড়ির ঠিক আগের গাড়িখানা হইতে দেবু ঘোষ এবং পনের-ষোল বৎসরের একটি কিশোর দুইজনে গাড়ির খোলা দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দরজার মুখে শীর্ণদেহ গৌরবর্ণ পক্ককেশ ন্যায়রত্ন গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তাঁহার পিছনে হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবকটি।

কে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল—বলো ভাই ন্যায়রত্নকী জয়!

ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। পাকা ভ্রূ-জোড়ার নিচে চোখ দুইটি চকচক করিতেছে। শুভ্র মালিন্যহীন চোখ। হাত তুলিয়া তিনি ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন—না!

দেবু ঘোষ উচ্চকণ্ঠে বলিল—উনি একাদশীর উপবাস করে আছেন, তার উপর হঠাৎ একটু অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। আপনারা গোলমাল করবেন না, ভিড়ও করবেন না।

কিশোর ছেলেটি বলিল—আমার কাঁধে ভর দিন।

হাত নাড়িয়া বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাইলেন—না। বিনা সাহায্যেই তিনি সাবধানে তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িলেন।

সর্বাগ্রে শ্রীহরি ঘোষ হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল।

ন্যায়রত্ন এক-পা পিছাইয়া গেলেন এবং ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—না।

কিশোর ছেলেটি বলিল—প্রণাম করবেন না। উনি কারুর প্রণাম নেন না।

ন্যায়রত্ন সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আমি একটু বিশ্রাম করব। বড় ক্লান্ত আমি।

হিন্দু মহাসভার সম্পাদক আগাইয়া বলিলেন—চলুন, গাড়ি আছে বাইরে—ব্যবস্থা সব ঠিক করা আছে।

ঘাড় নাড়িয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। এইখানে—এইখানে বিশ্রাম করব আমি। অজয়মণি কম্বলখানা বিছিয়ে দাও তো! একটু—একটু স্থান করে দিন। আর কাল, কাল সকলের সঙ্গে দেখা হবে। আজ একটু বিশ্রাম।

হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন তিনি।

প্রায় ঠিক তেমনটি আছেন ন্যায়রত্ন। মাথায় খাটো গৌরবর্ণ পক্ককেশ মানুষটি শুধু একটু শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, রঙটা উজ্জ্বলতর হইয়াছে। দ্বারমণ্ডলের চারিদিকে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। ন্যায়রত্ন বিস্ময়হীন ঔৎসুক্যহীন বিচিত্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলাইয়া একবার দেখিয়া লইলেন।

জংশন দ্বারমণ্ডল।

উত্তরে ওই বটগাছের খেয়াঘাট। ঘাট-দ্বারমণ্ডল।

দক্ষিণে জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছে ওই জনতারার আশ্রমের জঙ্গল। তার ও-পাশে ওই হাট-দ্বারমণ্ডল।

২

অধিকাংশ লোকই ফিরিয়া গেল। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিল। তাহারা কি কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল সেটা তাহাদের নিজেদের কাছেও খুব একটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এমন সংক্ষিপ্ত কলরবহীন একটা ঘটনা তাহাদের কল্পনায়, সে-কল্পনা যতই অস্পষ্ট হোক—তাহার বিপরীত। গোটা অঞ্চলটা উত্তেজনায় কালবৈশাখীর অপরাহ্ণের মতো উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে; একটা ঝড় বজ্রাঘাতের সঙ্গে বর্ষণ তাহাদের প্রত্যাশা। সেখানে এমন শব্দহীন আলোড়নহীন এমন একটা স্তিমিত ঘটনা কোনমতেই মনঃপূত হইবার কথা নয়; যেন বহুপ্রত্যাশিত এক টুকরা মেঘ দিগন্ত হইতে উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, না একটা বিদ্যুত চমকে সৃষ্টির চোখ ধাঁধাইয়া জানাইয়া দিল—হাঁ, আমি আসিয়াছি। না তাহার গর্জনে সমস্ত কাঁপাইয়া বলিল—ভয় নাই। এমন কি খানিকটা ঝড় উঠিয়া ধুলা উড়াইয়া দিল না, যাহাতে মানুষ ঠাণ্ডা বাতাস আসিবে—এ প্রত্যাশাতেও একটু আশ্বস্ত হয়।

অনেকেই বলিল—ধু-র। এই ঠাণ্ডায় এই শেষ রাত্রে—ধু-র!

—চল, চল। বাড়ি চল। ভোর হতে হতে বাড়ি পৌঁছুব। মাঠে অনেক কাজ।

—আমি বলি, না জানি কি হবে। এই রাতেই হয়তো কিছু-মিছু হয়ে যাবে। যত সব—ছঃ। কার্তিক মাসের শেষ ঠাণ্ডা। কার্তিকের শিশিরে হাত পড়ে যায়, মানুষ তো মানুষ। একটা ধুম করে দিলে—চল, সব চল। ঠাকুরমশায় আসবেন, তাঁর কথাতেই সব মামদোবাজী ফুস-মন্তরে উড়ে যাবে। দে-বাবা। দে হ নষ্ট গুড়ের খাজা আমাদের—

নাম করিতে হইল না, নষ্ট গুড়ের খাজা নিজেই ত্রাস পাইয়া সাড়া দিয়া উঠিল—কি বলেছিলাম, বল আ, কি বলেছিলাম আমি ? বল— আমি কি বলেছিলাম ?

—বল নাই। চল সব, ঠাকুরমশায় আসছেন।

—ঠাকুরমশায় এসেছেন কি না ?

—হাঁ এসেছেন।

—তবে ? তবে ? বলি তবে তুই এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন ? নষ্ট গুড়ের খাজা। নষ্ট গুড়ের খাজা।

—এই দেখ, তুমি আবার 'তা-তা' করছ। হু, শেষ রাতে 'আগাআগি' ভাল লাগে না। আমি বলছি ঠাকুরমশায় এসেছেন, বেশ হয়েছে। তা এই শেষ রাতে এসে হল কি।

—কি হল ? বাবা রে, গ্রামবাসী সব ছি ছি করছে ঠাকুরকে—কি হল। এই বড় একটা মানুষ, দেখলে পুণ্য হয়। তিনি এসেছেন একা পরে—এলেন আমাদের জন্যে, আসবে না ছুটে ? ভক্ত বা শুনবার, হতে না পেলুম। ওরে—এর জন্যেই তো হিঁদুর সর্বনাশ হয়েছে। দেখেছিস সেদিন পাগলের সেক্রেটারি এসেছিল, সেদিন মিয়া সাহেবদের ভিড়। দেখেছিস ? ওদের ছত্রিশ জাতের একটা জাত, কেউ কারো ছোঁওয়া খাবি না, কেউ কারু বিপদে পাশে দাঁড়াবি না, ছত্রিশ জাতের মড়া মরলে তোরা ঘরে বসে মজা দেখিস, কুচক্রীর দল, নিমকহারামের দল, অবিশ্বাসীর দল, পাষণ্ডের দল—

বাজার দ্বারমণ্ডপের পার্শ্বদিকে দাঁড়াইয়া ভৈরব মিত্র সুদীর্ঘ একটি গালাগাল-পূর্ণ বক্তৃতা দিয়া শ্রোতাদের শোণিত উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। ভৈরব মিত্র গ্রামের মাতব্বর। অবশ্য বেচারার জমি-জেরাত, বিষয়-সম্পত্তির অভাব নাই তাহার। সামান্যতম কারণকে অবলম্বন করিয়া অসমান উৎসাহে সে তাহা আন্দোলিত করিয়া দেয়। কোথায় মেলা, কোথায় গিরিশ প্রভৃতি মহোৎসব, কোথায় বারোয়ারি কালীপূজা, কোথায় জমিদারের সঙ্গে মামলা, কোথায় কাহার সঙ্গে কাহার কলহ—এই লইয়াই সে চব্বিশ ঘণ্টাই নিজেও মাতিয়া থাকে, গ্রামকেও মাতাইয়া রাখে। এইখানেই তাহার মাতব্বরী সীমাবদ্ধ নয়, অন্তত সে তাহা রাখিতে চায় না। সে মাতব্বরীকে সে প্রমাণিত করিবার চেষ্টায় গত তিনবার ইউনিয়ন বোর্ডে মেম্বার হইবার জন্য ভোটে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হইয়াছে পাশের মুসলমানপ্রধান খায়েরপাড়া গ্রামের মাতব্বর আবু তাহের খানের নিকট।

ভৈরব মিত্র বলে, আবু তাহের পারে না এমন কাজ নাই।

লোকটার পরনে কয়েক বৎসর আগেও থাকিত তাঁতের খাটো বহরের লুঙ্গি। হঠাৎ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের মত লোকটা মোটা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের

মেম্বার হইয়াছে, আজকাল পরিতেছে ঢিলা-পায়জামা—আচকান।

হেবম্ব জানে আবু তাহেব তলে তলে নিজের গ্রামকে দাঙ্গার জন্য তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। হেরম্বও বসিয়া নাই। সে দ্বারমণ্ডল বাজার, দ্বারমণ্ডল জংশন, সদর শহর চরকির মত পাক দিয়া ফিরিতেছে। সমস্ত আন্দোলনটার খবরাখবর তাহার নখাগ্রে। ন্যায়রত্নের আগমন উপলক্ষে সে স্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গেই আসিয়াছে এবং দশজনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

প্রবীণ মানুষ ভগবান মণ্ডল ন্যায়রত্নের কালের মানুষ। ভগবান বলে—মহাগ্রামের ঠাকুরবাড়ির ব্রহ্মত্র এ অঞ্চলে প্রতি গ্রামে। ওই যে আবু তাহেবের খাঁয়েরপাড়া—ও সীমান্তেও দুবিঘে ব্রহ্মত্র আছে। আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে ওই জমি করছি। যখন দশবছরের ছেলে আমি তখন বাবা চাল দিতে যাবার সময় গাড়িতে চাপিয়ে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম দেখলাম টকটকে সোনার মত রং—বারো-চোদ্দ বছর বয়স ঠাকুরমশায়কে। আমাকে নাম জিজ্ঞেস করে নিয়ে গেলেন নিজের মায়ের কাছে। নাড়ু দিলেন মা—খেলাম, ঠাকুরমশায় নিজের হাতে আমাকে জল ঢেলে দিলেন—আমি খেলাম। ওরে বাবা, তখন কি জানতাম উনি সাক্ষাৎ আগুন। সেই মানুষকে আজ পঞ্চাশ বছর দেখি নাই। পঞ্চাশ বছর।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভগবান অপরাধ করিয়াছিল, সামাজিক অপরাধ। যৌবনের অতি ক্ষুধায় সে এক বিধবার প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। একদা সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেদিন ন্যায়রত্নই ভগবানের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান দিয়াছিলেন। লোকমুখে বিধান শুনিয়া সে বিধান অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছিল ভগবান। সেই দিন হইতে সে ন্যায়রত্নের সামনে আসে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সে যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, তাহাতে লোকে একবাক্যে বলিয়াছিল—মানুষের ভুল হয় বৈকি, কার না ভুল হয় বল? কিন্তু ভগবান মানুষের মতো মানুষ, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। শুধু শাস্ত্রীয় ও সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই ভগবান ক্ষান্ত হয় নাই। সে বিধবাটিকে নবদ্বীপে তাহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে খরচ যোগাইয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্ন এ খবর শুনিয়া খুশি হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ পাঠাইয়াছিলেন। হেরম্ব মিত্রের পিতামহ ছিলেন তখন গ্রামের গোমস্তা, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন - মিত্রজা, ভগবানকে বোলো, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপলব্ধিতে, মনের দহনে। শাস্ত্র, সেই উপলব্ধি, সেই দহন জাগ্রত করবার জন্য উপবাস, সর্বসমক্ষে মন্ত্রপাঠ করে পাপ স্বীকার, অপরাধ মার্জনার জন্য প্রার্থনা ইত্যাদির বিধান দিয়ে থাকে। সমাজ শাসন করে সেই বোধ জাগ্রত করতে চায়। আমি শাস্ত্রের বিধান দিয়েছি। ওইটুকুর বেশি তো আমার অধিকার নেই। সমাজ ভোজ আদায় করেছে—এখন সমাজের যেমন অবস্থা তাতে ওই আদায় হলেই সে খুশি। কিন্তু আমার দুঃখ ছিল অভাগা মেয়েটির জন্য। শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করেও তার পরিত্রাণ নাই। সমাজ ভোজ নিয়েও তাকে ঠাঁই দিতে পারবে না। তাই ভগবান যখন নিজের প্রায়শ্চিত্তের এই বিধানটা নিজের উপর চাপালে, তখন আমার মনটা শান্ত হল, প্রসন্ন হল। এই আমার আশীর্বাদ।

বলো তুমি ভগবানকে আমার নাম করে।

মিত্তিরজা এই কথা ভগবানকে জানাইয়াছিল। ভগবান সেইখান হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়াছিল, আশীর্বাদ পাইয়াও কিন্তু ন্যায়রত্নের সঙ্গে দেখা করে নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভগবান ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসে নাই। আজ কিন্তু থাকিতে পারে নাই; সে হেরম্বদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, বলিয়াছিল—একটু 'ধেরো ধেরো' চলো দাদারা। রাত্তিরি কাল,—শীতের রাত্রি—তার উপরে বয়েস বলছে—আসি আসি—আশির ঘরের ফটক খুলছে, পড়ে গেলে আর উঠব না। আক্ষেপ নাই তাতে, তবে একবার ঠাকুর মহাশয়কে দেখবার সাধ, পঞ্চাশ বছর আজ যাই কাল যাই করে লজ্জা আর কাটাতে পারলাম না। আজ লজ্জা কাটিয়েছি।

সমস্ত পথটা ভগবান আর কথা বলে নাই। স্টেশনে ন্যায়রত্নকে দূর হইতে দেখিয়াই ফিরিতে হইয়াছে, কাছে যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতেছে। হেরম্ব মিত্রের গালাগালপূর্ণ বক্তৃতায় বাধা দিয়া সে সবিনয়ে বলিল—মিত্তির ভাই, একটা কথা বলি, রাগ করো না যেন। গালাগালিকে লোকে বলে ঠাণ্ডা জল, তা ভাই শীতের রাতে ঠাণ্ডাজলে শরীর বড় শিরশির করছে। লোকে ক্ষুণ্ণ হবে বৈকি দাদা, একবার ভাল করে দেখতে পেলাম না, এই শীতের রাতে ইস্টিশনে থাকতাম—তা পর্যন্ত দিলে না।

এ কথাটা দেবু ঘোষ উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। একাদশীর উপবাস করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ কাশী হইতে বাংলাদেশ এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছেন—এই অবস্থায় তাঁহাকে এত লোকের উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন করিবার কল্পনাও করা যায় না; তাহার উপর ন্যায়রত্ন যত দেশের নিকটবর্তী হইয়াছেন, ততই যেন কঠিন শীতল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। ট্রেনে চড়িয়া প্রথম দিকটায় কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, সাহেবগঞ্জ পার হইতে বলিলেন—এইবার দেশ কাছে এল! সাহেবগঞ্জ।

আরও খানিকটা আসিয়া একটা বড় স্টেশন।

স্টেশনটার নামের হাঁক শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িতেই আধশোওয়া হইয়া দেহখানা বিছাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবু ভাবিয়াছিল—ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রপৌত্র মৃদুস্বরে বলিয়াছিল—না, ধ্যান করছেন।

ন্যায়রত্ন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছিল— শঙ্খপুর স্টেশন কি পার হলাম পণ্ডিত? দ্বারমণ্ডল আসছে? কথা বলিতে বলিতেই ন্যায়রত্ন উঠিয়া বসিয়াছিলেন, অজয়ের দিকে গভীরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—অজুমণি, তোমার দেশ এল ভাই।

ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের উপর ট্রেন উঠিতেই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া প্রপৌত্রকে বলিয়াছিলেন—প্রণাম কর, তোমার বহু পুরুষের ভিটের দেশ।

স্টেশনে নামিয়া যেন নিতান্ত অবসন্ন অসুস্থের মতো বলিলেন—অজয়, আমার বিছানাটা বিছিয়ে দাও তো ভাই।

যে কেহ কাছে আসিল সকলকেই বলিলেন—কাল—কাল—কাল।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে কথাটা শুনিলে লোকে সজল চক্ষে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া বাকি রাত্রিটা সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় পূর্বদিগন্তের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাঁহার একটা কথায় লোকে গলিয়া যাইত। যদি তিনি কথাটা উচ্চকণ্ঠে বলিতেন! সে তো জানে, তাহার চেয়ে একথা তো ভাল করিয়া আর কেহ জানে না। হয়তো ঠাকুর নিজেও জানেন না তিনি এখানকার মানুষের মনের কোন মণিবেদীতে বসিয়া আছেন।

দেবু কথাটা বলিয়াওছিল। জংশন শহরের শেঠ-মহাশয়রা, বড় মাতব্বরেরা, কঙ্কণার বাবুরা, তাহার গ্রামের জমিদার শ্রীহরি ঘোষ প্রভৃতি কথাটা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। স্টেশন কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল, পুলিশ কর্তৃপক্ষও আপত্তি করিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায় দরখাস্ত করিয়াছে। এমনভাবে হিন্দুরা এখানে জমায়েত হইলে যে কোন অজুহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। কথাটা যুক্তিযুক্ত। তবুও কর্তৃপক্ষ স্টেশনে সংবর্ধনার জন্য আসিতে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নাই। শুধু স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে শর্ত করিয়াছিলেন যে, কোন বক্তৃতা কেহ দিতে পারিবে না। এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিটি আগন্তুককে জংশন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই কারণেই জমিদার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ দেবু ঘোষের কোন কথাই কানে তোলেন নাই। দেবু বলিয়াছিল—বক্তৃতা তো নয়, ঠাকুরমশায় শুধু বলবেন, আমি ক্লান্ত।

—আরে, সেকথা তো উনি ট্রেন থেকে হাত জোড় করে বলে দিয়েছেন। স্টেশন থেকে নড়লেন না পর্যন্ত। না-না, ওসব হবে না। তোমাদের ওসব স্বদেশী ধারাধরন এ সবের মধ্যে খাটিসো না। পুলিশ তা হতে দেবে না।

পুলিশ সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন—যা বলবার আমি বলছি।—বলিয়াই তিনি ঘোষণা জানাইলেন—আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে স্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও। পর মুহূর্তেই নিজের কথা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—স্টেশন এলাকা থেকেই নয়, এ শহর থেকেই চলে যেতে হবে। আপন আপন গ্রামে চলে যাও।

স্টেশনে দশজন আর্মড-পুলিশ দশ গজ অন্তর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়াছিল, স্টেশনের বাহিরটা সাধারণ কনস্টেবল চৌকিদার—সে প্রায় জন পঞ্চাশেক, ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

মাতব্বরেরা গুরুগম্ভীর মুখভার লইয়া ঘন ঘন হাত নাড়িয়া ইশারায় এবং চাপাগলায়—যাও যাও, চলে যাও সব—জলদি যাও—বলিয়া ব্যস্ত হইয়া এমনভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন যে, পল্লীবাসীরা শঙ্কিত না হইয়া পারিল না। তাহারা পরস্পরের গা-টিপিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চলবে বাপু চল। বলছে সব এমন করে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া তাহারা বন্দুকধারী পুলিশ দেখিয়া ভীতও হইয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়াই নুরুল হক ইন্সপেক্টর পঞ্চাশজন আর্মগার্ডের একটি দল লইয়া গ্রামে গ্রামে প্যারেড করিয়া ইতিমধ্যেই মানুষের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে।

তাহারা চলিয়া গেল। ক্ষুব্ধ হইয়াই গেল।

স্টেশনে থাকিল জনকয়েক। একজন ইন্সপেক্টর, একজন এ-এস-আই থাকিলেন

সরকারী তরফ হইতে। শ্রীহরি ঘোষ এবং রামগোপাল ভকত চেয়ার পাতিয়া বসিয়া লেন, আর রহিল দেবু ঘোষ।

ন্যায়রত্ন নিষ্পলক শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়াছিলেন। এত সব কাণ্ডের তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। জানিতে চান নাই বলিয়া জানিতে পারেন নাই। মৃদুস্বরে হইলেও এত মানুষের কথা—সে একটা কোলাহল—সে শুনিয়াও তিনি ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্ন করা দূরের কথা, বারেকের জন্য সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখেন নাই পর্যন্ত।

দেবু বুঝিয়াছিল অন্তরে তাঁহার প্রচণ্ড আলোড়ন চলিতেছে। সুদীর্ঘ কালের কত কত স্মৃতি কত সুখ কত দুঃখ টগবগ করিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভের গলিত ধাতুসম্ভারের মত ফুটিতেছে। পাহাড় হইলে সে কম্পনে কাঁপিয়া উঠিত। কিন্তু মানুষ বোধকরি পাথরের চেয়েও অটল হইতে পারে। দেবুর অন্তর অকস্মাৎ ন্যায়রত্নের প্রতি গভীর সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মনে হইল, এর চেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা আর মানুষের হয় না।

যেন কোন সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ সুরবদ্ধ হইয়া মূক হইয়া গিয়াছে। অথবা কোন মানুষ অন্তিমমুহূর্তে বাক্‌রুদ্ধ হইয়া পঙ্গু হইয়া সংসারের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে।

ধূমায়মান গরমজল ভর্তি একটি পিতলের বালতি হাতে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন তবুও কোন কথা বলিলেন না। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াও মনে হইল না।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া কিছু ইঙ্গিত করিল। মেয়েটি জলের বালতি নামাইয়া রাখিয়া নতজানু হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি আমি।

ন্যায়রত্ন নীরবে ডান হাতখানি নাড়িয়া নিষেধ করিলেন—না।

—আমি স্বর্ণ, ঠাকুরমশায়, আমি তো একথা শুনব না।

ন্যায়রত্ন এবার ফিরিয়া তাকাইলেন। স্বর্ণ ?—কে স্বর্ণ— ও! দেখুড়িয়ার তিনকড়ি মণ্ডলের সেই বালবিধবা কন্যাটি ?

চিনিবার উপায় নাই। শুধু সধবা বেশের জন্যই নয়—একটা আসল রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, যেন চাষীর ঘরের গৃহস্থালীর নিত্য-ব্যবহার্য ধাতুপাত্র গলাইয়া নিপুণ যন্ত্র-শিল্পী কোন ধারালো দীপ্তিময় অস্ত্রে পরিণত করিয়াছে। ঠিক দেবুর মতই তাহার রূপান্তর।

দেবু মৃদুস্বরে বলিল—আমার স্ত্রী।

ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিলেন ন্যায়রত্ন —ও হ্যাঁ! দেবু তিনকড়ির বালবিধবা কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছে বটে। দেবু নিজেই তাঁহাকে অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মৃদুস্বরে বলিলেন—প্রণাম করো না। এক-একজন একটা বিশেষ আচরণকে মেনে চলে। সংসারে যেমন দেশাচার আছে, কুলাচার আছে, তেমনি আত্মাচারও আছে। ওটাতে আঘাত করতে নেই। আমি এমনি আশীর্বাদ করছি।

—কিন্তু আমি যে গরমজল নিয়ে এসেছি—পা ধুইয়ে দেব। শীতের রাত্রি—

—গরমজল ! ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন। জল গরম করে তো কোনকালে ব্যবহার করিনি মা। আজও অনুদয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান করি। একটু পরেই তো যাব ময়ূরাক্ষীতে স্নান করতে। তুমি ওটা রাখ। বস তুমি, তোমায় দেখে আনন্দ হচ্ছে ! পণ্ডিত !

—বলুন ?

—তোমাদের দুজনকে আমার আশীর্বাদ করা হয়নি। তোমাদের আশীর্বাদ করি।

স্বর্ণ পায়ের কাছে বসিয়া বলিল—তাহলে যে প্রণাম করতে দিতে হবে। মাথা যদি নোয়াতেই না দেন তবে আপনার আশীর্বাদ ধরব কোথায় ? ধরব কি করে ? ও তো হাতের অঞ্জলিতে নেওয়া যায় না—আপনি বলুন।

ন্যায়রত্ন মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—তর্কশাস্ত্রে তোমার অধিকার জন্মেছে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। তোমরা প্রণাম করতে চাইলে—আমি বললাম, আমার নিজস্ব আচার আছে একটি—তাতে প্রণাম নেওয়া নিষিদ্ধ। আমি আশীর্বাদ করতে চাচ্ছি, তবে যদি তোমাদের আচারে বাধা থাকে তবে অবশ্যই না বলবে তোমরা। আর মাথা নিচু করার কথা বলছ—তার দরকার নেই মা, আলো, জল, বায়ু এদের মত আশীর্বাদ সর্বাঙ্গে বর্ষিত হয়, তাছাড়া—তোমরা দুজনে যতোই লম্বা হয়ে থাক—আমি বুড়ো হয়ে যতই নুয়ে পড়ে থাকি, হাত বাড়ালে মাথার নাগাল অবশ্যই পাব, কি বল ?

দুজনের মাথার উপর দক্ষিণহস্তের স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—কল্যাণ হোক। আত্মার কল্যাণ।

ওদিকে রাত্রি শেষ ঘোষণা করিয়া পাখিরা কলরব করিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন, তারপর ডাকিলেন—অজয়।

অজয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যায়রত্ন তাহার দিকে চাহিয়া পায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তাহাতেই অজয় জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া বলিল—পাখি ডাকছে !

—হ্যাঁ। তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি আসছি স্নান করে।

—সে কি ? একা যাবেন কোথায় ? দেবু প্রশ্ন করিল।

—এখানকার সব যে আমার পরিচিত পণ্ডিত। আশি বছরের পরিচয়। মধ্যে কয়েক বছর কাশী গিয়েছি।

—না। সে হয় না ঠাকুরমশায়। আমি সঙ্গে যাব।

অজয় ততক্ষণে কাপড়-গামছা ঘটি লইয়া উঠিয়া দাড়াইয়াছে। অজয় মৃদুস্বরে বলিল—ঘুম হবে না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—চল, ঘুম হবে না যখন, তখন চল।

পুলিশ ইন্সপেক্টরটি এবং শ্রীহরি ঘোষ কাছে আসিয়া বলিল—কোথায় যাবেন ?

—স্নানে যাবেন ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

—দাঁড়ান, লোক সঙ্গে দিই।

—কেন, লোক কেন ? সবিস্ময়ে ন্যায়রত্ন প্রশ্ন করিলেন।

—দরকার আছে ঠাকুরমশায়। এখানকার ব্যবস্থা আপনি জানেন না। শ্রীহরি ঘোষ হাত জোড় করিয়াও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—আপনাকে এ অবস্থায় কোন মতেই আমরা এইভাবে—এই সময়ে নদীর ঘাটে নির্জনে যেতে দিতে পারব না। কোন কিছু যদি ঘটে যায় তবে—

—কিছু ঘটবে না শ্রীহরি। লোকের প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে অজয় যাচ্ছে—দেবনাথ যাচ্ছে।

—অজয় ছেলেমানুষ—আর দেবনাথ। শ্রীহরির চোখে একটা যেন ঝিলিক খেলিয়া গেল, বলিল—দেবনাথকেই কে রক্ষা করে ঠাকুরমশায়—তার ঠিক নাই। আপনি জানেন না বোধ হয়, দেবনাথ তিনকড়ি মণ্ডলের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে পতিত; শিবকালীপুর পরিত্যাগ করে জংশনে এসে বাস করে।

—আমি জানি শ্রীহরি। হাঁ, আমি জানি। লোকের কোন প্রয়োজন নেই।

—লোক আমাদের—মানে সরকারী লোক—কনেস্টবল দুজন আপনার সঙ্গে যাবে। দায়িত্ব দেবু ঘোষের নয়, দায়িত্ব আমাদের।

দেবু হাসিয়া এবার বলিল—শ্রীহরিবাবু, এতটা পথ আমিই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নিরাপদেই এনেছি। লোক যদি পাঠাতে চাও, পাঠাতে পার। সঙ্গে সঙ্গে যাবে—আমরা তাতে আপত্তি করব কেন?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—না দেবু, তোমাকেও আমি সঙ্গে নেব না। আমি আর অজয় দুজন যাব। এস অজয়!

বৃদ্ধ অগ্রসর হইলেন।

ময়ূরাক্ষীর ঘাট।

প্রকাণ্ড প্রাচীন বট, বহু শতাব্দী ধরিয়া ঘাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে ঝুরি নামিয়া সে এক মনোরম আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভিতরটা শুধু বালি। বট-গাছের পল্লবের জন্য রোদ পড়ে না। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই গাছতলাটি পথিকের আশ্রয়-স্থল। নদীর ধারের দিকে বাঁকা শিকড় উঠিয়া রহিয়াছে অনেকগুলি। আগেরকালে বন্দর ঘাট-দ্বারমণ্ডলে যেসব নৌকা আসিত, মোটা কাছি দিয়া ওই শিকড়গুলির সঙ্গে বাঁধা থাকিত। এখন একখানা জীর্ণ খেয়ানৌকা বাঁধা থাকে। কার্তিক মাস, ময়ূরাক্ষীতে এখন হাঁটু জল। নৌকাখানা বালির উপর কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্বদিগন্তে প্রতিমুহূর্তে আলোর আভাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। ওপারে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী পঞ্চগ্রামের বাঁধ।

ন্যায়রত্ন দাঁড়াইলেন।—অজয়!

—ঠাকুর।

—ছেলেবেলার কিছু মনে নেই? গ্রাম মনে নেই?

—না ঠাকুর। শুধু মনে পড়ে মস্ত একটা খড়ের চালা।

—হাঁ, আটচালা। টোল বসত সেখানে। বাঁধের উপর দাঁড়ালে বাড়ির পিছন-

দিকের তালগাছটা দেখা যাবে। যাবে ওপারে?

—চলুন।

ন্যায়রত্ন কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—যাব, পরে যাব, এখন থাক; আগে এ ব্যাপারটা মিটে যাক। আমার যা বলবার আছে—বলে দায়মুক্ত হই, তারপর যাব।

—বেশ।

—চল, ঘাটে নামি। এই ভোরে তুমি ঘাটে স্নান করো না। দেশ আমাদের ঘটে —বড় ভাল দেশ ছিল এককালে। কিন্তু এখন শ্মশান ভাই। ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি মুখহাত ধুয়ে নাও।

ন্যায়রত্ন নদীতে নামিলেন। অজয় মুখহাত ধুইয়া ঘাটে বসিল।

পূর্বমুখে চলিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষী। উত্তর দিকটায় পাঁচ-ভাইয়ের বাঁধের ঘন জঙ্গল একটা অরণ্য-প্রাচীরের মত ময়ূরাক্ষীর ধারার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে। ওই বাঁধের ওপারে গেলে তাঁহার বড় পুরুষের ভিটা দেখা যাইবে। এদিকে দক্ষিণদিকটা উঁচু। লাল কাঁকর মিশানো পাথরের মত শক্ত মাটি। ঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জংশন। সোজা দক্ষিণে ওই একটা দীর্ঘায়তন ঘন সবুজ—ওটা কি? তার ওপাশে আরও একটা সবুজ আভাস—দক্ষিণ-পূর্বে প্রান্তরটা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন স্নান শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

—দেখেছ?

—ওই সবুজ দেখাচ্ছে—ওটা কোন গ্রাম ঠাকুর?

—ওইটা? ওইটিই তো জয়তারা দেবীর আশ্রম। ওখানেই তো বিবাদ! তার দক্ষিণে ওই হল রাজার দ্বারমণ্ডপ। এই যে সোজা রাস্তাটা চলে গিয়াছে, এইটেই এক-কালের রাজপথ। এই বটতলা—এই ছিল বন্দর। কি বলব অজয়, এই যে আজ বিবাদ—

—আরে! ইটা কি বটে? আ! ন্যায়রত্ন ঠাকুর মালুম হচ্ছে?

ন্যায়রত্ন চকিত হন না কিছুতে। তিনি মুখ ফিরাইলেন ধীরে ধীরে।

একখানা ডুলি ওপারে নদীর ঘাটে নামিতেছে। আরও একজন কেহ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া সঙ্গে আসিতেছে।

—কে ঠাকুর? আপনাকে ডাকছে এমন ভাবে?

—কেন? মনে মনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছ? অপমান বোধ করছ? হাসিলেন ন্যায়রত্ন। কিন্তু উহারা কে তাহা চিনিতে পারিতেছেন না।

অজয় বলিল—একজন বুড়ো মুসলমান।

—বুড়ো মুসলমান?

—হ্যাঁ, মাথায় ফেজ টুপী, মস্ত লম্বা পাকা দাড়ি—

ডুলিটা ওপারের ঘাটে আসিয়া উঠিল। তাহার আগেই ঘোড়াটা আসিয়া উঠিয়া-ছিল। ঘোড়ার সওয়ার ঘোড়া হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল—আপনি? ভাল আছেন?

কুসুমপুরের ইরসাদ শেখ।

ডুলি হইতে নামিয়া বৃদ্ধ মুসলমান আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভাল আছ? চিনতে পারছ?—সে হাতখানা বাড়াইয়া দিল ন্যায়রত্নের হাতখানা ধরিবার জন্য।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হাজি দৌলত?

—হাঁ, সাক্ষী দিতে আসছ? কিন্তু ছুঁইবা না নাকি আমাকে? আঁ?

ন্যায়রত্ন নমস্কার করিলেন, বলিলেন—ওভাবে তো আমরা সম্ভাষণ করি না দৌলত।

হাজি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দোষটা কি?

—আছে।

—কি শুনি? আমি মুসলমান, আমাদের ছুঁইবা না। এই তো?

—তোমার সঙ্গে হাত ধরে কোলাকুলি করে সম্ভাষণ করার মতো গাঢ় সদ্ভাব তো কখনও ছিল না দৌলত। সেই জন্যেই করব না। আর মুসলমানের কথা যদি বল—তবে বলব, মুসলমান কেন, পৃথিবীর কেউই আজ আমার কাছে অচ্ছুৎ নয়। কিন্তু উপাসনার সময়টায়—ওই দেখ আমার প্রপৌত্র বিশ্বনাথের ছেলে বসে রয়েছে, ওকেও আমি ছোঁব না।

দৌলত ডুলিতে গিয়া উঠিল—উঠাও ডুলি। আরে আসো আসো, চলি আসো ইরসাদ।

ইরসাদ শেখ কিন্তু দৌলতের কথায় চলিয়া গেল না। সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমাকে কিছু বলবে ইরসাদ।

—বলব।

—কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে যে। ব্রাহ্মমুহূর্তে আমার উপাসনার সময়।

—কিন্তু—

—ব্রাহ্মমুহূর্ত স্বল্পক্ষণস্থায়ী ইরসাদ। তাছাড়া উপাসনার আগে কোন পার্থিব আলোচনায় মনকে ব্যাপৃত করাও ঠিক হবে না। তোমার মুখ দেখে—থাক সে কথা। তুমি অপেক্ষা কর—যদি না পার তবে সময় করে এস আমার বাড়িতে।

—সে সময় আমারও হবে না ঠাকুরমশায়। আমি আজই চলে যাব সদরে। আপনি বোধ হয় জানেন না আমি এখন মোক্তারি করছি।—সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল।

ন্যায়রত্ন ততক্ষণে পূর্বমুখে একপদে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে শুরু করিয়াছেন।

ইরসাদ ঘোড়াটার পেটে গোড়ালির গুঁতা দিয়া চালাইয়া দিল—কিন্তু যাইতে যাইতে আবার একবার ঘোড়াটাকে থামাইয়া বলিল—আপনি মাননীয় লোক, হিন্দুরা আপনাকে দেবতা মনে করে। আমরা মুসলমানেরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করি, মান্য করি, তার কারণ আপনি ভাল লোক, মহৎ ব্যক্তি। তার উপর আপনি বিশ্বনাথের ঠাকুরদাদা। সে আমাদের হামজুটি ছিল—তারে বড়ই ভালবাসতাম। কিন্তু আজ আপনি সাক্ষী দিবেন হিন্দুর তরফ থেকে। মুসলমানদের তরফ থেকে আমাকেই জেরা করতে হবে। আদালতে কখনও সাক্ষী দিয়েছেন কিনা জানি না। বিশেষ ফৌজদারী আদালতে। তাই বলে রাখছি—যদি জেরা করতে গিয়ে কিছু কঠিন কথা বলেই ফেলি, তবে যেন কিছু মনে

করবেন না।

সে ঘোড়াটার মুখ আবার ফিরাইল। কিন্তু অজয় ততক্ষণে ওদিকের গাছতলা হইতে উঠিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়াছে। ঘোড়ার সামনে দাড়াইয়া সে বলিল—নমস্কার।

—আদাব। তুমিই বুঝি বিশ্বনাথের ছেলে? সে আমার দোস্ত ছিল।

—হ্যাঁ, আপনি সে কথা এখুনি ঠাকুরকে বললেন, শুনেছি আমি। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনি ওঁকে যে সব কথা বললেন—তার কোনটাই হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু যে ভাবে বললেন—সেটা ভাল নয়। উনি—

মধ্যপথেই ইরসাদ বলিয়া উঠিল—ভাল নয় কেন? মন্দ হল কিসে?

—সুরে, মনে হল, ভাল কথাগুলি খুব হিসেব করে বললেন আপনি, কেবল সুরের রূঢ়তা দিয়ে ওঁকে আঘাত করবার জন্যে। কথাগুলির ভদ্র এবং বিনীত অর্থের আবরণ দিয়ে কঠিন সুরে শাসিয়ে গেলেন। কেন বলুন তো?

ইরসাদ বিচিত্রদৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। মৃদু অথচ ধারাল হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল—সে বলিল—হুঁ। গোখুরার ডেঁকা কি না। পাশ দিয়া মানুষ গেলেও ফণা তুলে ফোঁস করে উঠেছে। যাক, ছেলেমানুষ, আমার দোস্তের ছেলে তুমি। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করব না। এখন পথ ছাড়, আমার অনেক কাজ।

অজয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—কিন্তু আমার কথার জবাবটা যে আমি চাই। একজন বৃদ্ধ শ্রদ্ধাভাজন মানুষকে অকারণে এমন শাসালেন কেন?

ইরসাদ হাসিয়া বলিল—আমার আফশোস হচ্ছে ছোকরা—তোমার বাপজান বেঁচে নাই। থাকলে বলতাম তার কাছে জবাবটা জেনে নিও। এখন আমাকেই বলতে হচ্ছে তোমাকে—কি করব—উপায় নাই। সুরের কথা, ভঙ্গির কথা বললে না? তুমি ধরেছ ঠিক। কিন্তু তুমি নিজেই বল তো দেখি, যে লোকটা পণ্ডিত হয়ে ধার্মিক হয়ে আপনার ছেলেকে খুন করে, একমাত্র নাতি—তাকে ত্যাগ করে, তার স্ত্রী-পুত্রদের ছিনিয়ে নেয়, সে লোকটাকে ভয়ে বিস্ময়ে যতই শ্রদ্ধা করি—অন্তরের অন্তর তার উপর প্রসন্ন হয় কি করে? সুর কঠোর যে আপনি হয়ে ওঠে।

অজয় খপ করিয়া ঘোড়াটার মুখের পাশে লাগাম চাপিয়া ধরিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বলিল—এসব কি বলছেন আপনি?

ইরসাদ চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার মধ্যেও আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুখে হেঁচকা টান খাওয়া ঘোড়াটা জাতিগত স্বভাব মত সামনের পা দুটা উপরে তুলিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইরসাদ ঘোড়াটার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের দেহের সমগ্র ভার দিয়া তাহাকে মাটির উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার! ছোড় দো!

অজয়ের আয়ত চক্ষুদুটি খসিয়া পড়া তারার মতো অস্বাভাবিক প্রখরদৃষ্টিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে চোখ দুইটা ফাটিয়া এখনি উল্কার মত বাহির হইয়া

পড়িবে। সে বলিল—না।

সেই মুহূর্তেই পিছন হইতে স্থায়রত্ন শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—ছেড়ে দাও অজয়! আমার কথা শোন ভাই!

অজয় লাগামের মুঠা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু পথ ছাড়িয়া দিল না। বলিল—ওঁর কথা-গুলো আপনি শুনেছেন ঠাকুর?

—শুনেছি অজয়নি।

ইরসাদ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওই শুন কি বলছেন তোমার ঠাকুর,—শুন। প্রতিবাদে ওঁর বলবার কিছু নাই।

—ওর পথ ছেড়ে দাও অজয়।

ইরসাদ বলিল—হ্যাঁ বাপজান, আমার পথ ছাড়, তুমি বরং ওই তাঁর কাছে গিয়ে যাচাই করে নাও—কথাগুলি আমি সত্য বলেছি কি ঝুট বলেছি! দুনিয়ায় যে দোষ ওঁকে দি—উনি ঝুট বলেন, এ দোষ ওঁকে দিতে পারব না। ওই জন্মেই রাগ সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করি।

কঠিন এবং ধারালো হাসি অজয়ের ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া উঠিল—সে বলিল—মিথ্যে বললেন কথাটা। শ্রদ্ধা করেন না, প্রমাণ আপনার কথাতেই আছে। ওঁকে অপমান করবার সংকল্পটা আজ সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই কত বড় মিথ্যে আপনি চতুর মোক্তার হয়ে বলে গেলেন—তা হয়তো আপনি নিজেও বুঝতে পারেননি। আপনি নিজেই বললেন—উনি মিথ্যে বলেন, এ অপবাদ কেউ, এমন কি আপনিও দিতে পারেন না। অথচ গোড়াতেই শাসিয়ে রাখলেন—ওঁকে আপনি জেরা করবেন। যিনি সত্যবাদী তাঁকে জেরা করবার অভিপ্রায়টা কেন, বলতে পারেন? তাঁকে অপমান করবার জন্ম নয় কি? আপনি তো মোক্তার—বলুন না আপনি?

ইরসাদের চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অজয়ের কথার জবাব সে খুঁজিয়া পাইল না।

কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া একটা জবাব সে দিল, যে জবাবটা সাধারণ উকীল-মোক্তাররা হামেসাই দিয়া থাকেন। ইরসাদ বলিল—তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ঠিক বুঝবে না। আদালত জায়গাই আলাদা, সেখানে আমি মোক্তার উনি সাক্ষী। ওঁতে আর একজন সাধারণ সাক্ষীতে কোন তফাৎ নাই। জেরা সেখানে আমাকে করতেই হবে।

অজয় একটু হাসিয়া পথ ছাড়িয়া স্থায়রত্নের নিকট যাইতে যাইতে বলিল—তার অর্থ মিথ্যাবাদী সাক্ষীর মিথ্যাবাদকে প্রমাণ করার জন্ম জেরা করাই শুধু ওকালতী বা মোক্তারী নয়, সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার জন্ম জেরা করাটাও আপনাদের পেশার একটা অঙ্গ। সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, জেতাটাই হল মূল কথা। আইনের ফাঁকিটাই সত্য, আইন নয়—স্থায় তো নয়ই।

স্থায়রত্ন এবার বলিলেন—একটু দাঁড়াও ইরসাদ।

তাঁহার উপাসনা কিছুক্ষণ আগেই শেষ হইয়াছে। তিনি দুইবার অজয়কে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা এমনই দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতে-

ছিল যে চেষ্টা করিয়াও অজয় নিবৃত্ত হইবার অবসর পায় নাই। যে মুহূর্তে অজয় নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছে সেই মুহূর্তে ইরসাদ তাহাকে শুধু আঘাতই করে নাই, তাহাকে টানিয়া ফিরাইয়াছে। এবার অজয়ের আঘাতে ইরসাদ বিব্রত হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে অজয় পথ ছাড়িয়া তাঁহার দিকে সরিয়া আসিল। ন্যায়রত্ন এবার অবসর পাইয়া ইরসাদকে বলিলেন—একটু দাঁড়াও।

লাগাম টানিয়া অধীরভাব সঙ্গে রেকাবসুদ্ধ পা দোলাইয়া ইরসাদ বলিল—বলুন কি বলছেন? অপমানের জ্বালায় সে তখন অধীর।

—তুমি একটু পালটে গেছ ইরসাদ।

—পাল্টাব না? বয়েস বাড়ছে না? বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার ফাঁকিবাজী চোখে পড়ছে না? তখন ছিলাম মক্তবের মৌলবী—সে এক সময় গিয়েছে। তারপরে মোক্তারী পাস করে পুরানো কালের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত কথা জানলাম। আপনারা এখানে পুরুষানুক্রমে—ইরসাদের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল—সে বলিল কি সেকথা—ওই আদালতেই আপনাকে বলাব আমি। ওঃ—আপনার নাতি বিশ্বনাথ—থাক, সে কথাও থাক।—আর সে দাঁড়াইল না, ঘোড়াটাকে অকস্মাৎ ঘা কয়েক চাবুক মারিয়া ছুটাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন তাঁহার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অজয় কাছে আসিয়া বলিল—চলুন ঠাকুর। ওই দেখুন, অনেক লোকজন আসছে এই দিকে। দেবুকাকা রয়েছেন আগে। বোধহয় আমাদের দেবী দেখে আসছেন ওরা।

চল।

কিছুদূর আসিয়া হঠাৎ ন্যায়রত্ন ডাকলেন—অজয়।

—ঠাকুর।

—ইরসাদ শেষ না বলে গেল সে শুনে তোমার মন কি চঞ্চল হয়নি ভাই।

চঞ্চল হয়েছিল বৈকি ঠাকুর,—রাগ হয়েছিল। আপনি না থাকলে

—আমার আশঙ্কা হচ্ছিল অজয়মণি।

আমি ওকে ঘায়েল করে দিতাম ঠাকুর। ডাল রুটি আর পশ্চিমের বাতাসের গুণ অনেক। আমার গায়ে ওর চেয়ে বেশী জোর আছে। তাছাড়া আমি বক্সিং জানি।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—হাঁ, তোমার কাছে অস্ত্রও আছে।

অজয় চমকিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে গিয়েছিল ভাই। বালিশের তলায় রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে বোধ হয়। আমি ঘরে ঢুকলাম—দেখলাম, দেখলাম কালো শক্ত একটা জিনিস। শিয়রের আলো পড়েছে তার উপর। দেখলাম, প্রথমটা মনে হল খেলনার পিস্তল বোধ হয়। শখ করে কিনেছ। কিন্তু জিনিসটার গড়ন দেখে সন্দেহ হল। হাতে তুলে দেখলাম। ঠিক পরীক্ষার পদ্ধতি তো জানি না, তবে ওজন দেখে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল—খেলনা ওটা নয়। আমি সন্তর্পণে আবার তোমার বালিশ ঢাকা দিয়ে, তোমায় জাগিয়ে তুলে চলে এলাম। বলে এলাম—বিছানাটা ভাল করে

ঝেড়ে পেতে নিয়ে শোও ভাই।

অজয় চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—তোমায় বলিনি কিছু বলে বোধ হয় আশ্চর্য হচ্ছ। বলে কি করব? তোমার পিতামহ তোমার পিতা তাদের জীবন দিয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেছে যে, সে অধিকার আমার নাই।

অজয় কোন উত্তর দিল না। ন্যায়রত্ন বলিয়াই গেলেন—ইরশাদ শেখ যে কথাগুলি বলে গেল, সেগুলি একেবারে মিথ্যা নয় অজুমনি। পূর্ণ সত্যও নয়, অর্ধসত্য। তোমায় এখানে আমি সঙ্গে এনেছি সেই কথাগুলিই বলব বলে। দীর্ঘদিন মনের মধ্যে গোপন রেখেছি। তোমার মা জানেন কিন্তু তিনি কোনদিন সে কথা তোমাকে বলবেন না। আমাকেও তিনি বার বার বলেছেন—অজুকে আপনি এসব কথা বলবেন না, জেনে ওর কি হবে? জয়া মনে যা ভাবে সে আমি জানি। তার আশঙ্কা সে-সব কাহিনী শুনলে তুমি আমায় অশ্রদ্ধা করবে, ক্রুদ্ধ হবে আমার উপর, হয়তো বা এই শেষ বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে।

—আমি জানি ঠাকুর সে-সব কথা।

—তুমি জান? কে বললে?

—মা বলেছেন ঠাকুর।

—জয়া বলেছে?

—হ্যাঁ। এখানে আসবার আগের দিন আমাকে বললেন,—তুই দেশে যাচ্ছিস অজয়, সেখানে যাবার আগে তোর বংশ পরিচয়টা সম্পূর্ণ করে আমার কাছে জেনে যা। মানুষের সমাজ মানুষের মন অতি বিচিত্র বাবা। সেখানে আলোর পাশে অন্ধকারের মতো, সত্যের সঙ্গে মিথ্যে বাসা বেঁধে থাকে। যে মানুষের অন্তরে সত্য ছাড়া মিথ্যা স্থান পায় না—মিথ্যে তাকে আক্রমণ করে বাইরে থেকে। পিছন থেকে সাপের মতো ছোবল মারতে চায়। যে মানুষের সঙ্গে যাচ্ছিস—তাঁর জন্যে ভাবি না, বিষ তিনি জয় করেছেন। কিন্তু তুই? তুই আমার কাছে জেনে যা। সেখানে গিয়ে অনেক কাহিনী শুনবি বাবা। তোর বাপ তোর পিতামহকে নিয়ে দাদুর বিরুদ্ধে অনেক কথা অনেক জনে বলবে। সেই কথার আঘাত তুই যদি সহ্য করতে না পারিস—তাই আজ তোকে বলে দেব। নইলে এতদিন বলিনি, আরও কিছুকাল বলতাম না। সব শুনে যদি তোর শ্রদ্ধা ওঁর উপর অটুট থাকে তবেই তুই ওঁর সঙ্গে যা। সমস্ত শুনেই আমি আপনার সঙ্গে এসেছি।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—যাক, জয়া আমাকে একটা দায় থেকে উদ্ধার করেছে। ট্রেনে আসবার পথে সমস্তক্ষণ আমি প্রায় এই চিন্তাই করেছি।

অজয় এবার মৃদুস্বরে বলিল—ওঁরা এসে পড়েছেন ঠাকুর।

ন্যায়রত্ন মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিলেন, এবার তিনি মাথা তুলিলেন। সামনে প্রায় হাত পঞ্চাশেক দূরেই রেলওয়ে-ইয়ার্ড আরম্ভ হইয়াছে। তারের

বেড়ার মধ্যে একটি ছোট ফটক, সেই ফটকের মুখে সবাই দাঁড়াইয়া আছে।

দেবু বলিল—আমরা একটু ভাবছিলাম। গৌর অবশ্য আপনাদের সঙ্গেই আছে, তবু—

—কে? কে সঙ্গে আছে? তোমরা কি সঙ্গে লোক পাঠিয়েছিলে?

—সঙ্গে পাঠাইনি। গৌর নিজেই এসেছিল, তবে আমাকে বলে এসেছিল। আমি বারণ করেছিলাম, সে শোনেনি। তার বাপের তো সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন আপনি।

—গৌর? কার ছেলে?

—আমার শালা, তিনকড়ি মণ্ডলের ছেলে। ওই আসছে পিছনে পিছনে।

ন্যায়রত্ন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। সবল স্বাস্থ্যবান লম্বাচওড়া একটি ছেলে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। হাসিয়া ন্যায়রত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করছে ছেলেটি? তিনকড়ির জমিজমা সবই তো শ্রীহরি নিলাম করে নিয়েছিল।

—হ্যাঁ, জমিজমা অনেকদিনই গিয়েছে। বাড়িখানাও পড়ে গিয়েছে। ও এখানেই থাকে। করে না কিছুই বিশেষ, খবরের কাগজের একটা কারবার করে, করবেই বা কখন। এ জেলার ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছর জেল খেটে সবে মাস ছয়েক বেরিয়েছে। দেবু একটু হাসিল।

* * *

স্টেশন প্ল্যাটফর্মের উপরে লোকজনের বেশ ভিড় জমিয়াছে ততক্ষণে। কড়া পুলিশ ব্যবস্থা সত্ত্বেও লোকজনকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অধিকাংশ লোকই একখানা করিয়া পরের স্টেশনের টিকিট কাটিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সবাই প্রায় জংশন-দ্বারমণ্ডলের আইনের ফাঁক ও ফাঁকি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

ন্যায়রত্ন প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উঠিবামাত্র সকলে ভিড় করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীহরি ঘোষ এবং স্থানীয় প্রধান মাড়বাড়ী ব্যবসায়ী সুরযমল, প্রধান মিলওয়ালা মুখার্জি সাহেব এবং হাট-দ্বারমণ্ডলের অধিবাসী, এখানকার একজন বড় ব্যবসায়ী নবীনচন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শ্রীহরি মুখপাত্র হিসাবে বলিল—এইবার আপনি চলুন। কাল থেকে উপবাস করে আছেন—পারণ করবেন। তাছাড়া স্টেশন কর্তৃপক্ষের আপত্তি আছে আপনি থাকায়। জেলার কর্তারাও সদর থেকে টেলিগ্রামে খবর নিয়ে টেলিগ্রামেই হুকুম পাঠিয়েছেন যেন স্টেশনে আপনাকে না-রাখা হয়। আপনি বরং ইচ্ছে হলে থানায় থাকতে পারেন। সেখানে ইন্সপেকশন-রুম খুলে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। এদিকে ভিড়ও জমতে শুরু হয়েছে। আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি সুরজমলবাবুর বাড়িতে—আপনি সেখানে চলুন।

ন্যায়রত্ন কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—তাহলে আমি থানাতেই যাব।

—থানাতে যাবেন?

—হ্যাঁ।

সমস্ত জনতা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। থানা? থানার মতো কুটিল নিষ্ঠুর স্থান—আজ যে স্থানকে অপবিত্র বলিয়া লোক ঘৃণা করে, সেইখানেই যাইতে চান ন্যায়রত্ন!

ঠিক ওই সময়েই জনতার পিছন হইতে মেয়েদের গলার কথা শুনিয়া সকলে পিছন ফিরিয়া চাহিল।—আমায় একটু যেতে দেবেন দয়া করে? একটু পথ দেবেন?

এখানকার গার্লস হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস—মিসেস ভট্টাচার্য সম্মুখে আসিতে চাহিতেছিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। মিসেস ভট্টাচার্য সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবু ন্যায়রত্নের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। মিসেস ভট্টাচার্যকে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—অরুণা দেবী।

মিসেস ভট্টাচার্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন—সরুন! সামনে ছাড়ুন। তাঁহার চোখে বহ্নিচ্ছটা যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

দেবু বলিল—না, ফিরে যান। বাড়ি যান।

—কি ব্যাপার? কি চান উনি? উনি তো গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস।

—হ্যাঁ, প্রণাম করবেন উনি।

—না। মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলিল।—প্রণাম করব, কিন্তু সেইটেই একমাত্র কারণ নয় আমার আসবার। ওঁকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছি।

—তুমি কে মা?

—আমি আপনার পৌত্রবধূ। আপনার পৌত্রের সঙ্গে একসঙ্গে রাজনীতি দলের কাজ করতাম। আপনার মনে আছে বোধহয়—আপনি কাশী চলে যাবার আগে—আমরা এসেছিলাম এখানকার বন্যাপীড়িতদের অবস্থা দেখতে; এসে উঠেছিলাম এখানকার ডাকবাংলোয়। আপনি সকালবেলা আপনার পৌত্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—আপনি যখন ঘরে ঢোকেন—

স্থিরদৃষ্টিতে ন্যায়রত্ন মেয়েটির দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—হাঁ, মনে পড়েছে। আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন তুমি অন্য একটা ঘরে যাচ্ছিলে—বিশ্বনাথ তোমার হাত ধরে তোমায় আটকে রেখেছিল। তোমার দাদাও যেন তোমার সঙ্গে ছিলেন। তখন তোমার নাম ছিল অরুণা সেন।

—হ্যাঁ। আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করে—তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কাশী চলে গেলেন, তিনি তখন আমায় বিবাহ করেন। এখানকার লোকই আমাদের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন—দরকার হলে—তাঁকে ডাকছি আমি—

—সাক্ষীর প্রয়োজন তো নেই মা। তোমাকে তো মর্যাদাহীনা বলে মনে হয় না।

—আমি, আমি সেই সাক্ষী ঠাকুরমশায়।—কণ্ঠস্বর ইরসাদের।

ন্যায়রত্ন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অজয় এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন বলিলেন—বস অজয়। তোমার হাতখানা দাও। তিনি অজয়ের হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইরসাদ যেন উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে বলিল—তখন বলি নাই। সবার সামনে বলব বলে বলি নাই। আপনার নাতি আর উনি—এঁরা দুজনে মুসলমান হয়ে সাদী করেছিলেন। তাতে করে আপনার প্রথম পৌত্রবধূর সঙ্গে সাদী তালাক

হয়ে গিয়েছে। তারপর—সাদীর পরে—তুজনে শুদ্ধি করে আবার হিন্দু হন। জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা স্তব্ধ হইয়া গেল। মানুষ যেন হতবাক হইয়া গিয়াছে, পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। শুধু টেলিগ্রাফের খুঁটির গায়ে বাতাসের গোঁ-গোঁ শব্দ উঠিতেছিল। আর শোনা যাইতেছিল দূরে সাইডিং-এর মালগাড়ির শান্টিং-এর শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত পরে ন্যায়রত্ন মেয়েটিকে বলিলেন—মা! এখনও কি তুমি আমাকে যেতে বলছ তোমার ওখানে?

—বলছি।

চারিদিকে অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল।

মিসেস ভট্টাচার্য হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া ন্যায়রত্নের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া, পায়ের উপর মুখ রাখিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—নইলে আপনি আমাকে বলে দিয়ে যান আমি কি নিয়ে থাকব?

জনতার মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—আপনি পা ছেড়ে দেন ওঁর। ওকে আবার স্নান করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখের অর্গল মুক্ত হইয়া গেল।—কি নিয়ে থাকব? এ্যাঃ—হারামজাদি মাগী!

দেবু মিসেস ভট্টাচার্যকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—উঠুন আপনি—উঠুন! মিসেস ভট্টাচার্য!

ন্যায়রত্ন মেয়েটির মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—ওঠ মা, চল, আমি তোমার বাড়ি যাব।

আবার প্ল্যাটফর্মটা স্তব্ধ হইয়া গেল।

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অজয়! ওঠ, তোমার মায়ের হাত ধরে তোল।

অজয় অকস্মাৎ পাগলের মত মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—না—না—ঠাকুর না, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

—অজয়!

—না—না—না।

ঠিক এই সময়েই পুলিশ-ইন্সপেক্টর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ক্লিয়ার করুন—স্টেশন এরিয়া ক্লিয়ার করুন। বাইরে যান সব। কলকাতা থেকে স্পেশাল আসছে। মিনিস্টার আসছেন—একজন বড় কংগ্রেস নেতা আসছেন।' কলকাতায় আপোস হয়ে গিয়েছে দু'পক্ষের। সেই মত ব্যবস্থা হবে এখানে। বিকালে মিটিং হবে। বাইরে যান সব, বাইরে যান।

—সে কি?

—হ্যাঁ। এই টেলিগ্রাম। ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট!

'আপোস হইয়াছে—মুসলমানেরা ওখানে ছোট একটি মসজিদ করিতে পারিবেন। কিন্তু কখনও ওই এলাকায় গো-কোরবানী করিতে পারিবেন না। মুসলমানেরা হিন্দু

দেবস্থানের মর্যাদা কোনক্রমে ভঙ্গ করিতে পারিবেন না, জয়তারার আশ্রমে মসজিদে নামাজের সময় বাজনা বাজিবে না। অন্য সময়ে বাজনায়, পূজায়, বলিতে মুসলমানদের কোন আপত্তি চলিবে না।

হিন্দু মুসলমানের দেশ। উভয় দাবীকেই মানিতে হইবে।

আজ মিটিংয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে জয়তারা আশ্রমের এলাকার মধ্যে। সরকার হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে মিষ্টান্ন বিতরণ করিবেন।

কংগ্রেস নেতা মুসলমানদের হাতে মিষ্টান্ন দিবেন। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর মন্ত্রী দিবেন হিন্দুদের হাতে মিষ্টান্ন।

কংগ্রেস ও লীগ পতাকা ছাদাছাদি করিয়া বাঁধিয়া পোতা হইবে মঞ্চের উপরে।

*   *   *

উত্তেজনার মধ্যে অজয় প্ল্যাটফর্ম হইতে লাইনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাইডিং-এর মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। ন্যায়রত্ন দেখিলেন। মুহূর্তের জন্য তাঁহার সর্বশরীরে যেন একটা কম্পন বহিয়া গেল। বারেকের জন্য তাঁহার চোখ আপনা হইতে মুদিয়া গেল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটা নিদারুণ অন্তর্ঘাতী ছবি তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

জংশন-দ্বারমণ্ডল তখন জংশন হয় নাই। তখন দ্বারমণ্ডল ছিল একটি ছোট স্টেশন, এই স্টেশনের ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের কিছু আগে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যবর্তী রেল-লাইনের উপর পড়িয়াছিল রক্তাক্ত খণ্ড-বিখণ্ড কতকগুলি মাংসপিণ্ড আর অস্থির টুকরা। তাঁহার একমাত্র পুত্র শশীশেখরের দেহাবশেষ। শশীশেখর—তাঁহার শশীশেখর গৌরবর্ণ—মেদবর্জিত দীর্ঘদেহ—খড়্গনাসা—চোখ দুইটি ছিল ক্ষুদ্র—তাহাতে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁহার নিষ্ঠুর আঘাতে শশীশেখর আত্মহারা হইয়া রাত্রের অন্ধকারে রেললাইন ধরিয়া পথ চলিতেছিল। সম্ভবত হোঁচোট খাইয়া লাইনের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, শেষ রাত্রের ডাকগাড়িটা তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আজ আবার অজয় তেমনি আত্মহারা হইয়া সেই দ্বারমণ্ডলের রেল লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

শিহরিয়া উঠিয়া চোখ খুলিয়া ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল পরে বেদনাহত আর্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—অজয়! অজু ভাই! অজু!

দেবু বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না, গৌর তার সঙ্গে গিয়েছে। আমি দেখেছি—সেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে লাইনের পর।

ন্যায়রত্ন নীরবে চোখ বন্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্ভবত সুদীর্ঘকালের পর বাহির হইয়া আসা বেদনার উচ্ছ্বাসকে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

প্ল্যাটফর্মে জনতা তখন চলিতে শুরু করিয়াছে। পাথরের টালির উপর বহুসংখ্যক জুতার শব্দ একটা বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কথাবার্তার গুঞ্জন তখনও ফুটিতে পারিতেছে না। প্ল্যাটফর্মের ওমাথায় ইন্সপেক্টর তখনও ঘোষণা করিতেছে—স্টেশন থেকে চলে যান—আপনারা স্টেশন থেকে চলে যান। মিনিস্টার আসছেন—

কংগ্রেস লীডার আসছেন। সমস্ত মিটমাট হয়ে গেছে। স্পেশাল ট্রেন আসছে—চলে যান আপনারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই—বোধহয় দশ মিনিটের মধ্যেই স্টেশনটা প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। শহরের রাস্তা ধরিয়া জনতা উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়াছিল। বাবু সুরজমলের ওখানে হিন্দু মহাসভার আলোচনা বসিবে। ফৈজুদ্দিন সাহেবের ওখানে মুসলমানদের আলোচনা-বৈঠক বসিতে চলিয়াছে। দোকানে, গাছ-তলায় সাধারণ লোকে ইতিমধ্যেই জমিতে শুরু করিয়াছে। কংগ্রেস কর্মীরা চলিয়াছে নিজেদের আপিসে—মিটমাট হইয়াছে—মঙ্গল হইযাছে—এই মিটমাটকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে ; তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে রহিল শুধু মাল বাহকের দল, চা ও খাবারের স্টলের লোকেরা, আর পাহারারত পুলিশ কয়েকজন। আর রহিলেন ন্যায়রত্ন, অরুণা এবং আরও জন পাঁচেক।

ইন্সপেক্টর আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তা হলে ? আপনি যাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই ? এদিকের তো সব মিটে গেল। আপনার দায় তো চুকল। এখানে তো আর থাকতে দিতে পারব না।

ন্যায়রত্ন অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন—চল মা, চল, তোমার নিমন্ত্রণ আমি তো নিয়েছি।

অরুণা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। রক্তশূন্য মৃতের মতো শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল। ন্যায়রত্নের কথা বোধহয় তাহার বোধগম্য হইল না।

দেবু তাহাকে ডাকিল—অরুণা দেবী—মিসেস ভট্টাচার্য !

—এঁ্যা।

—চলুন। উনি আপনার ওখানে যাবেন।

পিছন হইতে গম্ভীরকণ্ঠে কে বলিল—তাহলে আপনাকে সমাজে পতিত হতে হবে ঠাকুরমশাই। বৃদ্ধ বয়সে মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি। আসুন ! যেতে যেতে আপনার কথা মনে করে ফিরে এলাম। আমরা এখানকার দশজনে আপনাকে এনেছি। চলুন, আমার ওখানে চলুন। ওর ওখানে আপনি কোন্ মুখে যেতে চাচ্ছেন ? ছিঃ।—শ্রীহরি ঘোষ, শিবকালীপুরের পত্তনীদার।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কে ? শ্রীহরি ?

—হাঁা, আমি।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—জাতি বল, ধর্ম বল—ওর আর কিছুই আমার নাই বাবা। ও সবই গিয়েছে। নতুন করে যাবার আর কিছু নাই। ওখানে আমাকে একবার যেতেই হবে। না গিয়ে আমার উপায় নাই। এতবড় জন-সমাগমের মধ্যে উনি যে বেদনায় যে মমতায় অধীর হয়ে—সকলের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করে চোখের জলে ভেসে আমার পা চেপে ধরলেন—তার ছোঁয়াচ আমাকেও লেগেছে শ্রীহরি—আমাকে যেতেই হবে। আমি যাব। দেবু—তুমি অজয়কে দেখ। তাকে ফেরাও। চল মা।

অরুণা এতক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—না, আপনার যথেষ্ট

অমর্যাদা করেছি আমি। আমার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আপনার লাঞ্ছনা আর বাড়িয়ে দেব না। ওদিকে অজয় চলে গেল রাগ করে!

—গেল, আবার ফিরবে। না ফেরে—

ন্যায়রত্নের ঠোঁট দুটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়াও কিন্তু ও কথাটা শেষ করিলেন না। ও কথাটা আর না তুলিয়া ক্ষীণ হাস্যের সঙ্গে বলিলেন —আর লাঞ্ছনার কথা বলছ, ওটা পাওনা না থাকলে কেউ দিতে পারে না মা। ওটা হয়তো পাওনা আছে আমার। চল, এখন চল।

৩

মাসখানেক পর।

দ্বারমণ্ডলের হিন্দু-মুসলমান বিরোধটা প্রভাতের মেঘডম্বরের মতোই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণতি লাভ করিয়া শেষ হইয়াছে। অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধ বলিয়া কেহ তুলনা দিল না। যুদ্ধ হইলে অজাযুদ্ধ হইবে না, শ্রাদ্ধ হইলে মাত্র কদলীপত্র ও আতপ তণ্ডুলের আয়োজনে শেষ হইবে না। অন্তত একটা বৃষোৎসর্গের মত কাণ্ড হইবে ইহাতে সংশয় কাহারও নাই বলিয়াই ও দুটো উপমা কাহারও মনে উঠিল না। এদিকে নির্দেশটা সচেতন মনের নয়, অবচেতন মনের।

প্রথম কয়েকদিন এই লইয়া সমালোচনার শেষ ছিল না।

এক দিকে লীগ আপিসে অন্য দিকে হিন্দুম হাসভার আপিসে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাকেই বরং অজাযুদ্ধ ঋষিশ্রাদ্ধের সহিত তুলনা করা যায়। লীগ আপিসে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু হয় নাই। দৌলত হাজি এবং ইরশাদের মধ্যে চিরকালের বিরোধটা এই উপলক্ষে দম-পটকার মতো প্রচণ্ড শব্দ করিয়া ফাটিয়াছে। হাজি এই মিটমাটকে আদৌ পছন্দ করে নাই। সে লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলী হইতে জেলা লীগ সভাপতি সম্পাদক পর্যন্ত প্রত্যেককেই নিষ্ঠুর ভাষায় সমালোচনা করিল। সে বাংলাদেশের লীগ-সভাপতি খাঁ-সাহেবের দলের লোক। আপোস তাহাদের দলের নীতিবিরুদ্ধ এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর দলের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিরোধ হেতু মন্ত্রীমণ্ডলীর উদ্যোগে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোসে তাহার আপত্তির আর সীমা নাই। সে দিক দিয়া তাহার বক্তব্য মন্ত্রিত্বের জন্য হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামের দাবী খর্ব করিয়া আপোস শুধু লজ্জার এবং ঘৃণার কথাই নয়, একেবারে আল্লাহ্‌তালার দরবারে গুনাহ্‌। দৌলত ওইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে আরও কঠিন গালিগালাজ করিয়াছে; তাহার কারণ রাজনৈতিক নয়, অন্তরে তাহার একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত আছে। সামান্য অবস্থা হইতে সে আজ এ অঞ্চলের বাসিন্দা মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইয়াছে, বয়সেও প্রাচীন সে। অঞ্চলের অবস্থাপন্ন হিন্দুদের এবং সমাজপতিদের অনেক অবজ্ঞা বিশেষ করিয়া ঘৃণার স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে ক্ষতের মতো দগদগ করিতেছে। সবচেয়ে দুঃখ পাইত সে—হিন্দু লেখাপড়া জানা বাবুরা বলিত দৌলতের প্রপিতামহ ছিল হিন্দু চাষী; তাহার বংশাবলীর কোন পুরুষের

রক্তে বিন্দুমাত্র আরব কি পারস্যের খাঁটি মুসলমানের রক্তের সংস্রব নাই। আর দুঃখ পাইত যখন তাহাকে ছুঁইয়া তাহারা স্নান করিত। জমিদারেরা, বাবুরা এটা খুব মানিত না, এটা মানিত ওই ন্যায়রত্ন ঠাকুরের মতো বামুনারা। বিশেষ করিয়া ন্যায়রত্ন ঠাকুর। দৌলতের মনে পড়ে—একবার সে ন্যায়রত্ন ঠাকুরের বাড়িতে একটা নালিশ লইয়া গিয়াছিল। তখন অবস্থা তাহার ফিরিতে শুরু করিয়াছে, ছোট ছোট চামড়ার কারবারীদের কাছে সে চামড়া কেনে, পাইকারদের কাছে ছাগল-ভেড়ার পাল কিনিয়া চালান দেয়। অন্যদিকে মহাজনী কারবারও সে ফাঁদিয়াছে, তখন সে অবহেলার লোক নয়। মহাগ্রামের জনকয়েক বখা ছোকরা তাহার ছাগলের পাল মাঠে বাহির হইলেই, খাঁসী-পাঠা ধরিয়া লইয়া গোপনে ভোজ লাগাইত। কুসুমপুরের সীমানা পার হইয়া মহাগ্রাম কি শিবকালীপুরের সীমানায় পা দিলে— আর সে খাঁসী-পাঠা ফিরিত না। দৌলত তিক্ত হইয়া নালিশ করিতে আসিয়াছিল ন্যায়রত্ন ঠাকুরের কাছে। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ তখন চার পাঁচ বছরের শিশু। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে মনের আবেগে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিয়াছিল—ঠাকুরমশায়, আপনার ঘরে আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে গো! কেমন লোকের পৌত্র দেখতে হবে।

ছেলেটিকে নামাইয়া দিতেই সে ন্যায়রত্নের কোলে উঠিয়া বসিতে গিয়াছিল; ন্যায়রত্ন দৌলতের সামনেই তাহাকে বলিয়াছিল—না দাদু। এখন আমার কোলে উঠতে নাই। যাও জামাটা ছেড়ে এস, হাত-পা ধুয়ে ফেল। দেখো, যেন গিয়েই মাকে ছুঁয়ে দিয়ো না! হ্যাঁ!

দৌলত মুখে কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু মর্মান্তিক অপমান বোধ করিয়াছিল। সে স্মৃতি আজও একটা দুরারোগ্য ক্ষতের মতো দগদগ করিতেছে। সেদিন ভোরবেলা ন্যায়রত্নকে দেখিয়া হাত বাড়াইয়া কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। নদীর ঘাটে ন্যায়রত্নকে সেদিন সে যে কথাটা বলিয়াছিল তাহা সেই বহুকালের পুরাতন কথার জের। সেই কারণেই হঠাৎ হাতটা গুটাইয়া লইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে আপোস! তাহার ইচ্ছা হয়—দৌলতের চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। সে ইরসাদকে বলিয়াছিল—তুই মিনিস্টারদের পা-চাটা, গদীর লেগে যারা ইসলামের সঙ্গে বেইমানী করে—তারা ওই কাফেরদেরও অধম। তুই কাফেরের কাফের।

ইরসাদ বুদ্ধিমান—নূতন যুগের মানুষ। আবেগ এবং ধর্মান্ধতাই তার সর্বস্ব নয়। সে রাজনীতি বুঝিতে শুরু করিয়াছে। ইতিহাস পড়িয়াছে। তাহার দেহে আরব বা পারস্যের মুসলমানের রক্ত নাই বলিলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাহার পূর্বপুরুষ এদেশেরই হিন্দু ছিল কথাটা স্বীকার করে।—এবং জোর গলা করিয়া এই কথাটা বলিয়া—এই সত্যটাকেই এ দেশের প্রতিটি পাদক্ষেপের ভূমির উপর মালিকানা-স্বত্বের দাবীর ফরমান স্বরূপ জাহির করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক তাহার বরাবরই সুস্থ এবং স্থির। আজকাল মোক্তারী করিয়া তাহার বুদ্ধি আরও শানিত এবং মাথা আরও ঠাণ্ডা হইয়াছে। দৌলতের সঙ্গে ঝগড়া তাহার প্রায়ই হয়, দৌলত আগুনের মতো জ্বলিয়া ওঠে কিন্তু ইরসাদ রাগে না, হাসিয়া উত্তর দেয়, দৌলত তাহাতে আরও জ্বলিয়া যায়। এক্ষেত্রে

কিন্তু ইরসাদও নিজেকে স্থির রাখিতে পারে নাই, কাফেরের কাফের কথাটায় সে ধৈর্য হারাইল, আস্তিন গুটাইয়া বলিয়াছিল—সুদখোর শয়তান, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

দৌলত বৃদ্ধ কিন্তু তাহার বড় নাতি মহম্মদ শক্তিশালী যুবা, সে কুস্তি করে, লাঠি খেলে, বন্দুক ঘাড়ে লইয়া শিকার করিয়া বেড়ায়—সে দৌলতকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।—তোমার কলজে আজ ছিঁড়ে ফেলব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা ছোরা সে বাহির করিল।

হয়ত একটা কিছু হইয়া যাইত, কিন্তু ফৈজুল্লা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর রূঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা আঙুল বাড়াইয়া ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটাই যেন চমকিয়া উঠিল। ফৈজুল্লা সাহেবের কঠিন তিরস্কারে দৌলত লজ্জা পাইল না, ভয় পাইল। ইরসাদ লজ্জা পাইল। ফৈজুল্লা বলিলেন—তোমাদের নিয়ে কাজ করা আমার বেওকুফি হয়েছে। এই জন্যেই তোমাদের আমরা, পশ্চিমদেশের লোকেরা মন্দ বলি। ছি-ছি-ছি!

তারপর মসজিদ তৈয়ারির কথা তুলিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া ব্যাপারটাকে অজা-যুদ্ধে পরিণত করিয়াছিলেন।

ওদিকে হিন্দুমহাসভার আপিসে দীর্ঘ বারোঘণ্টাব্যাপী অধিবেশন চলিয়াছিল। কংগ্রেসকে গালিগালাজ দোষারোপ করিয়া এই আপোসের প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছে। আরও দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অবশেষে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য সম্পর্কে যে লজ্জাকর ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে—সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হউক, উহা সত্য হইলে তাঁহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা হউক।"

প্রস্তাবটি খাতাকলমে কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে বাতিল করা হয় নাই।

আরও একটা প্রস্তাব আনিয়াছিল শ্রীহরি ঘোষ এবং কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির ছেলে ব্যারিস্টার নরেন মুখুজ্জে প্রস্তাবটা সমর্থন করিয়াছিল। "মহাগ্রামের পণ্ডিত মহা-মহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন ধর্মবিশ্বাসহীনা অরুণা ভট্টাচার্যকে পৌত্রবধূরূপে স্বীকার করিয়া তাহার হস্তে অন্নগ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের এবং সমাজের অপমান করিয়া-ছেন, নিজেও ধর্মচ্যুত হইয়াছেন—এ অঞ্চলের সমাজপতির পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হউক। সরকারকে অনুরোধ করা হউক তাঁহার মহামহোপাধ্যায় উপাধি যেন বাতিল করা হয়।" এ প্রস্তাবও শেষপর্যন্ত কাগজে কলমে কায়েম করা হয় নাই। প্রস্তাব দুটিকে লইয়া গবেষণা আলোচনা অনেক হইয়াছে। গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি শিক্ষয়িত্রী অরুণা ভট্টাচার্যকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তবে ভবিষ্যতে শুদ্ধি করিয়া কেহ আর হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না।

জংশন শহরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সুরপতি চাটার্জী প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দিয়াছেন। সুরপতি জজকোর্টে ওকালতি করেন, জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশসাহেবের প্রিয়পাত্র, উৎসাহী ব্যক্তি। তিনি উপস্থিত ছিলেন সভায়। তাঁর ভাই হিন্দুমহাসভার ধার-মণ্ডল শাখার সম্পাদক, তাঁহাদের বাড়িতেই মহাসভার আপিস। সুরপতিবাবুও অন্তরে অন্তরে মহাসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কোনদিন যদি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতেই হয় তবে মহাসভাতে যোগ দিবেন। মহাসভাও তাঁহাকে পাইতে ব্যগ্র, এমন কি আগামী আইনসভার নির্বাচনে মহাসভার প্রার্থী দাঁড়াইবার জন্য তাঁহাকেই তাহারা পাইতে চায়। এই সব কারণেই সুরপতিবাবু উপস্থিতও ছিলেন এবং পরামর্শদাতার মতো অকুণ্ঠিত অধিকারে কথাও বলিতেছিলেন। সুরপতিবাবু প্রথম বয়সে এ জেলার দুর্দান্ত নামকরা ছেলে ছিলেন—ফুটবলে মারপিট করিতে, থিয়েটারে হৈ-হৈ করিতে, সভাসমিতিতে ঢেলাবাজিতে বা ঢাক বাজাইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। কথা-বার্তার ঢঙও তাঁহার বিচিত্র। এককালে যে ঠোঁট-বাঁকানো মৃদুহাস্যের আভিজাত্য এবং বক্র-বাক্য-প্রয়োগপদ্ধতির ধারা বিদগ্ধমণ্ডলের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সুরপতি বাংলাদেশের প্রত্যন্তসীমার মফঃস্বল শহরে তাহারই অনুকরণ করিয়া একটা স্বকীয় ঢঙ দাঁড় করাইয়াছিল। ফুটবলে, থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে আজকাল সুরপতিবাবু গম্ভীর হইয়াছেন, পদমর্যাদা রাখিয়া চলিতে হয়, কিন্তু কথাবার্তার ঢঙ পরিবর্তন করেন নাই। সভার মধ্যেই তিনি ধনী শেঠ সুরযমলের তরুণ ছেলেটির গলা ধরিয়া কাছে টানিয়া কি যেন ফিসফিস করিয়া বলিতেছিলেন, প্রস্তাবটা উঠিবামাত্র তিনি ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া, তীর্যকদৃষ্টিতে চাহিয়া ঠোট বাঁকাইয়া বলিলেন—এই মরেছে রে বাবা! এসব করছ কি তোমরা? ঠগ বাছতে যে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে ভাইটি। যুগটা মনে রেখে কথা কও। ও রেজল্যুশন নেবার কথাটা মুখে এনো না, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কঙ্কণার বাবুদের ছেলে ব্যারিস্টার নরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল—তার মানে? What do you mean?

কথাটা তো খুব শক্ত নয় ভাইটি। এই নারী প্রগতির যুগে ডাইভোর্সহীন সধবা মেয়ে সধবা ছেলেরা পবিত্র ইসলামে দীক্ষা নিয়ে ডাইভোর্স আদায় করে খাঁচার পাখি বনের পাখির মতো উড়ে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষবার সুযোগ করে নিচ্ছে। তার-পর শুদ্ধি। ব্যাস ওয়া-ফতে, জাত ধরমকে জয় জয়কার। ডাইভোর্স মিলল—জাত ফিরল, সাপ মরল—লাঠি ভাঙল না। এ চালাকি জানতে পেরে মুসলমানেরা আইন বানাচ্ছে একবার কলমা পড়লে অন্তত আর বছর দুয়েকের মধ্যে অন্য ধর্মে যাওয়া চলবে না। এর উপর তোমরা যদি দরখাস্ত কর মিস্ট্রেসের বিরুদ্ধে যে, ও একসময় মুসলমান হয়েছিল—তাহলে মরবে যে তোমরাই বাওয়া! মেয়ে আর ছেলে—ঘি আর আগুন—প্রগতির যুগে ভাঁড়ার আর উনুন ছেড়ে যখন ঘি গড়িয়ে পথে গড়িয়েছে, আর আগুনও উলুখড় ধরে কাছাকাছি এসেছে—তখন গলবে আর জ্বলবে। মুসলমানপাড়ার পথ বেয়ে ফিরে এসেছে বলে তোমরা যদি না চাও, ওরা ফিরে গিয়ে মসজেদের চেরাগ জ্বালাবে মাণিক! তোমাদের যজ্ঞিকুণ্ড বিনা হনুমানের আবির্ভাবেই নিভে যাবে।

যতই রসিকতা করিয়া কথা বলুক সুরপতি—এ কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। অন্তত রাজনৈতিক জনসংখ্যার একটা যুক্তি ছিল, তাই রসিকতায় কেহ হাসিল না। শেঠ সুরয-মলের ছেলে বলিল—সুর্পতিবাবু বহুত ঠিক বাত বলিয়েছেন, উয়ো বাতিল কর দেনা। বাতিলই হইয়া গিয়াছিল।

ন্যায়রত্নকে লইয়া প্রস্তাবটাকে কেহ খুব বেশি আমলই দেয় নাই। তবুও নরেন মুখার্জি এবং শ্রীহরি ঘোষ অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিল। সুরপতি এটাতে খুব আপত্তি করে নাই। শুধু বলিয়াছিল—আরে, রাম-রাম। ধর্মের ষাঁড় পিঁজরেপোলে গেছে। বুড়ো মানুষ, কাশীতে বাস করছে—তাঁকে নিয়ে আর টানাটানি কেন?

নরেন মুখুজ্জে বলিয়াছিল—You don't know সুরপতিদা—

—I don't know? হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল সুরপতি—শিব-কালীপুরে দুর্গা বলে একটা মেয়ে ছিল জান? আমরা বলতাম—কালো-সরস্বতী। হ্যাঁ, একখানা চেহারা ছিল বটে। হঠাৎ শ্রীহরির দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিবাবুকে জিজ্ঞাসা কর। সেই বনকুসুমের গন্ধে অনেক দিকভ্রান্ত-ভ্রমর বোলতা মাছি ও অঞ্চলে উড়েছে ভাইটি। আমাকে ভ্রমর বল, বোলতা বল, মাছি বল আপত্তি করব না, মোটকথা পাখা আমার ছিল এবং উড়তামও। তোমার—। থাক থাক, তোমার গুরুজনদের কথা তোমার কাছে বলব না। ও অরণ্যে উড়েছি—আর অরণ্যের সবচেয়ে বড় গাছটার উপর যে শঙ্খচিলটা বসে আকাশ চিরে ডাক দিয়ে সাবধান করতো তাকে জানি না বলছ? তার উপব ওঁর নাতি বিশ্বনাথ আমার বয়সী ছিল যে।

শ্রীহরি ঘোষ বলিল—যদি জানেন, তবে অমত করছেন কেন? তারাই তো সমাজ-টাকে এমন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কত জনকে পতিত করেছে, কত জনকে কত মানী লোককে চোখ রাঙিয়েছে—মনে করুন তো। তবু আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। তাঁর এই ম্লেচ্ছ আচরণ?

সুরপতি এবার তাকিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—যা খুশী কর বাওয়া। আমি তোমাদের বাইরের লোক। তবে দরখাস্ত করলেই গভর্নমেণ্ট উপাধি কেড়ে নেবে না, আর পতিত করারও আজ মানে কিছু হয় না। গান্ধী করছে হরিজন—অস্পৃশ্যতা নিবারণ, তোমরা বাওয়া, চাও আর না চাও -মুখে না বল না বল। তার উপর শাস্ত্র-ফাস্ত্র পড়ি নাই, বুঝিও না খুব, ব্যাকরণ কৌমুদী কবে পড়েছি—মনে নাই, নর শব্দের রূপ শুধু এক লাইন মনে আছে—ব্যস, তারপর সব জলপান করে দিয়েছি। এত বড় একটা পণ্ডিত কাল তো মরবে—তাঁকে আজ পতিত করা, দুঃখ দেওয়া ভাল বুঝি না আমি।

একটা সিগারেট ধরাইয়া সে ধোঁয়ার রিঙ ছাড়িতে শুরু করিয়াছিল।

মজলিসের সকলেই চুপ করিয়া কথাটা ভাবিয়া না দেখিয়া পারে নাই। অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রায় সকলেই বলিয়াছিল—না—না, থাক।

—থাকবে? শ্রীহরি প্রশ্ন করিয়াছিল।

—থাক, থাক, ওঁরা ঠিকই বলেছেন। নরেন মুখার্জি বলিয়াছিল—ওরা ঠিকই

বলেছেন, যাঁকে ভগবান্ মেরেছেন তাঁকে আর মারা উচিত হবে না।

—That's good !

একপাশে বসিয়াছিল দেবকী সেন। পূর্ববঙ্গের ছেলে, সবল দীর্ঘ দেহ, এখানে সে বৎসরখানেক আসিয়া ছোট একটি কবিরাজী ঔষধালয় খুলিয়াছে। মুখে একমুখ ঘন দাড়িগোঁফ, কপালে একটা ক্ষত। এই দেবকী সেনই কাশী হইতে এখান পর্যন্ত ন্যায়-রত্নকে রক্ষা করিবার ভার লইয়া দেবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত দেবকী সেন একটি কথাও বলে নাই। এবার সে উঠিয়া বলিল—সুরপতিবাবু, আপনাকে প্রণাম করছি।

সুরপতি বলিল—কী ব্যাপার কবিরাজ মশাই ? হঠাৎ প্রণাম।

—হ্যাঁ প্রণাম। একেবারে অকপট অন্তরে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনি আজ আমায় বাঁচিয়েছেন। জানেন, আমি এককালে কংগ্রেস করেছি। একেবারে বোমা-পিস্তল নিয়ে কংগ্রেস। বছর পাঁচেক দ্বীপান্তর বাস করেছি, পাঁচ বছর পর আন্দামান থেকে ফিরলাম। ফিরে—ফিরে এসে দেখলাম আমার আর কেউ নেই ত্রিসংসারে। ছিল বিধবা একটি ছোট বোন। তাকে মুসলমান গুণ্ডারা একদিন রাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। তার কোন সন্ধান পর্যন্ত নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কয়েকমুহূর্ত পরে বলিল—ফিরে সব দেখলাম। দেখে, আর ইচ্ছা হল না কংগ্রেসে যেতে। কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ দেখে যেতে ইচ্ছে হল না। পৈতৃকবৃত্তি কবিরাজী পড়লাম, তার আগে এম-এ পাস করেছিলাম, আন্দামানে অনেক পড়েছি—হিন্দুদর্শন, মার্কসবাদ অনেক কিছু। কিছুদিন কম্যুনিজমকে সার ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বুকের দগদগে ঘা নিয়ে বরদাস্ত করতে পারিনি। আপনাদের এখানে এসে হিন্দুমহাসভার সভ্য হয়েছি। শাস্ত্র মানি, রাজনীতি বুঝি, কাশী থেকে ন্যায়রত্নমশাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে লোকটিকে কিছু-কিছু জেনেছি। আজ যদি আপনি ওই লোকটিকে পতিত করবার চেষ্টা করবার দুর্মতি থেকে এইসব লীডারদের রক্ষা না করতেন তবে আমাকে হিন্দুমহাসভা ছেড়ে নিরালম্ব বায়ুভুকের মতো ভেসে বেড়াতে হত। আমাকে বাঁচিয়েছেন আপনি। আপনাকে সতি সত্যিই প্রণাম করছি। আচ্ছা উঠলাম।

দেবকী কবিরাজ উঠিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া গেল। বহু সভ্যের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কংগ্রেস আপিসেও আলোচনার শেষ ছিল না।

এ আলোচনার ধারাটা অন্যরূপ। কংগ্রেসের এই আপোস করার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই। শুধু যাহারা গান্ধিজীর জন্য কংগ্রেসের প্রতি আস্থাবান—তাহারাই এটাকে সমর্থন করিয়াছিল। বিপক্ষের দল সবই বামপন্থী। তাহারা অবশ্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধপন্থী নয়, তাহারা বলে অন্য কথা। এইভাবে তোষণ করিয়া মুসলমানদের সহিত আপোস অসম্ভব। তাহাদের মত—ধর্ম সে হিন্দু এবং ইসলাম—দুইটাকেই বিলুপ্ত করিয়া

দাও। তাহার পন্থা তাহারা জানে; কিন্তু কংগ্রেস সে পন্থা গ্রহণ করিতে চায় না। বিরোধ বাধিয়াছে সেইখানে। এখানে হিন্দুমুসলমান বিরোধের সূত্রপাতেই ইহাদের প্রস্তাব ছিল—জংশন শহরে, মিল এবং রেল শ্রমিকদের লইয়া কোন একটা অজুহাতে ধর্মঘটের আন্দোলন জুড়িয়া দেওয়ার। অন্যদল বলিয়াছিল—সেটা এখন আকাশকুসুম। বামপন্থীরা হাসিয়াছিল।

দেবু বলিয়াছিল—বিজ্ঞানের যুগে বারুদে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়লেই আকাশে ফুল ফোটান যায়। আগুনের ফুল। দেখুন না, আপনারা মত দিয়ে দেখুন। আপনাদের ফুলটাও তো আসল ফুল নয়—ওটাও কাগজের ফুল। আগুনের ফুল তার চেয়ে ভাল।

আপোসের পরও সেই আলোচনারই জের চলিয়াছে।

আলোচনার মধ্যে মিস্ট্রেস অরুণা ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও অনেক কথা উঠিয়াছে। অরুণা দেবুর দলের কর্মী। কর্মীই শুধু নয়, নেত্রীস্থানীয়া। কংগ্রেসের মধ্যে ও-আলোচনাটা প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কারণ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অরুণা কংগ্রেসের সভ্য নহেন। তবে কর্মী হিসাবে সুপরিচিতা। দেবুদের গোপন সমিতির কর্মী। কংগ্রেসের বৈঠকের শেষে দেবুদের দলের আলোচনার মধ্যে সকলেই একবাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিল—অরুণাদি এ কি করলেন?

দেবু উত্তর দিতে পারে নাই।

প্রশ্নটা সকলে দেবুকেই করিয়াছিল। দেবুর সঙ্গে অরুণার অন্তরঙ্গতা সকলেই জানে। তাহারা ভাবিয়াছিল, ব্যাপারটা হয়তো দেবুর জ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছে। রাজনীতি বুঝুক-না-বুঝুক, তাহারা এটা বেশ বুঝিতে পারে যে, প্রয়োজন হইলে যেমন জীবন দিতে হয় তেমনি মান-মর্যাদা সবকিছুই ওই প্রয়োজনে ভাসাইয়া দিতে হইতে পারে।'

দেবুকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার তাহারা প্রশ্ন করিল—দেবুদা!

—এঁ্যা!

—উনি এটা করলেন কেন? এ কি ভাল হল?

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—বুঝতে পারছি না।

* * *

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ন্যায়রত্ন।

দেবু দলের একান্ত গোপনীয় কথাগুলি গোপন রাখিয়া বাকি সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। উপদেশ সে চায় নাই, ন্যায়রত্নের মতো অদৃষ্টবাদী হিন্দু পণ্ডিতের কাছে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক কর্মী সে, উপদেশ চাহিতে পারে না; তবে এই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা তাহার অপরিসীম এবং এই পরিস্থিতির প্রায় প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়াই বিশেষ করিয়া খুলিয়া বলিয়াছে। শেষপর্যন্ত বলিয়াছিল—ঠাকুরমশায়, সেই ছেলেবেলায় বাবা বলতেন—গোটা পঞ্চগ্রামের লোক বলত—উনি সাক্ষাৎ দেবতা। তাই বিশ্বাস করেছিলাম। তারপর আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হলে মনে হত—আমার সকল বিপদ সকল অকল্যাণ কেটে গেল। বড় হয়েছি ক্রমে ক্রমে—কত দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে কত

শিক্ষা পেলাম। সমস্ত দুর্ভাগ্যের দিনে আপনার যে সান্ত্বনা, অমৃতের মতো যে সব উপদেশ পেয়েছি—সেসব আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। আপনার আশীর্বাদে কত বই-ই তো পড়লাম, জ্ঞানবিজ্ঞানের বড় বড় বই, কিন্তু এটা বলব যে তা সত্ত্বেও আপনার উপদেশ আমার কাছে সেই অমৃতই রয়েছে। আপনি আমার কাছে আজও সেই দেবতার মতোই আছেন। আপনি এইটুকু শুধু বিশ্বাস করবেন ঠাকুর-মশাই—যে এ ব্যাপারটা ঘটে গেল আমার অজ্ঞাতসারে। আরও একটা কথা—অরুণা দেবীকে বিশুভাই বিয়ে করেছিল—এটা আমি জানি। আপনি হয়তো জানেন না, আপনার সঙ্গে বিশুভাইয়ের যখন ছাড়াছাড়ি হল—আপনি এই জংশনের ডাকবাংলোয় অরুণা আর বিশুভাইকে দেখে, বিশুভাইয়ের গলায় পৈতে না দেখে অজয় আর বউদিকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন—তখন আমি কিছুদিন মনের দুঃখে আপনার প্রতি বিশু-ভাইয়ের অভক্তি দেখে তার সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর আবার তার সঙ্গে মিললাম জেলখানায়, উনিশশো তিরিশ সালে। বিশু তখন অর্ডিন্যান্সে আটক রাজবন্দী, আমি আন্দোলন করে মেয়াদ খাটছি। সেইখানে সে আমাকে টানলে। আমাকে নতুন দীক্ষা দিলে, পড়বার সুযোগ করে দিলে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবু স্তব্ধ হইল। স্মৃতির আবেগ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। দেবুর কথা শেষ হয় নাই বলিয়া তিনি কোন কথা বলেন নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—নারায়ণ—নারায়ণ।

দেবু ইঙ্গিতটা বুঝিয়াছিল, আত্মসম্বরণ করিয়া সে আরম্ভ করিয়াছিল—ওই জেল-খানাতেই সে আমাকে জানিয়েছিল অরুণাকে বিয়ে করার কথা। কিন্তু এমনভাবে তালাকের জন্যে মুসলমান ধর্ম নিয়ে যে বিয়ে করেছে এই কথা আমাকে বলে নাই সে। আজও পর্যন্ত জানতাম না। এইটুকু আপনি বিশ্বাস করবেন।

মৃদু শান্তস্বরে ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—বিশ্বাস আমি করলাম পণ্ডিত।

দেবু প্রতীক্ষা করিল—তিনি আরও কিছু বলিবেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন ওইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন, অত্যন্ত স্থির শান্তদৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেবু আবার বলিল—উনি যে কেন এমন করলেন? সে হতাশভাবে বার বার ঘাড় নাড়িল। তারপর বলিল—এ যে হল—এর ফল? বাক্য শেষ করিতে পারিল না—প্রশ্নের সুরটাই বড় হইয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের উদ্বেগের পরিমাণটা ফুটাইয়া তুলিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভালই হয়েছে পণ্ডিত। ভালই হবে। ভাবছ কেন? তারপর বলিলেন—এ সংসারে যা ঘটে পণ্ডিত, তা অবশ্যম্ভাবী। অনুশোচনা কর না, তা হলে ভয় পাবে। সাহস করে দাঁড়াও পণ্ডিত, আঘাত এলেও—তা থেকে মঙ্গলই হবে।

দেবু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়াছিল—উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই।

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—অজয় কাশীর টিকিট কিনে ট্রেনে উঠেছে? গৌর সঙ্গে গেছে।

—হাঁ। সে আমি নিজেই খবর নিয়েছি। গৌর ট্রেনে চড়বার সময় বলে গিয়েছে।

আমি কাশীতে টেলিগ্রাম করেছি। কাশীতে পৌছে গৌরও নিশ্চয় টেলিগ্রাম করবে।

সকরুণ হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—কিশোর চিত্ত, আঘাতটা অত্যন্ত বেশি হয়েছে।

দেবু লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছিল।

বিশ্বনাথ যে দলের সভ্য হইয়া এই কাজ করিয়া গিয়াছে সেই দলেরই সভ্য সে। সে নিজেও বিধবা বিবাহ করিয়াছে। ধর্মসঙ্গত বিবাহের আদর্শ তাহাদের কাছে মূল্যহীন। সে জানে—অজয়ের মা জয়ার ভালবাসাকে বিশ্বনাথ করুণার চক্ষে দেখিত। দুরূহ দুর্গম জীবন পথে চলিতে গিয়া পথের সঙ্গিনী অরুণাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পাইবার জন্য বিশ্বনাথ—তাহার জীবনধর্ম জীবনাদর্শ বুঝিতে অক্ষম জয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অরুণাকে বিবাহ করিয়া—তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের বিশ্বাসমতে কোন অন্যায়ই করে নাই। ঠিক এই কারণেই ন্যায়রত্নের ওই শেষ কথা কয়টিতে লজ্জা পাইল। যতই বস্তুতান্ত্রিক হউক- একটি কিশোর চিত্তের বেদনার সত্যটা মনে করাইয়া দিতেই বিশ্বনাথের লজ্জা যেন তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছিল।

ঠিক এই সময়েই অরুণা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। ঝড়ের রাত্রের পর প্রভাতের বিপর্যস্ত পৃথিবীর মতো তাহার মুখখানার উপর মানসিক বিপর্যয়ের ছাপ পড়িয়াছে। সারাটা দিন পর সে ফিরিল।

সকালে ন্যায়রত্ন তাহার বাসায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়াছিলেন—আমাকে শুধু একগ্লাস সরবত করে দাও। আর কিছু না।

অরুণার উপায়ান্তর ছিল না। তবু সে একবার বলিয়াছিল—না। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।

ন্যায়রত্ন পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি কেন সঙ্কোচ করছ?

অরুণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—মুখে উত্তর দেয় নাই, চোখের কয় ফোঁটা জল যাহা জানাইবার তাহা জানাইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—বিশ্বনাথ আমার পৌত্র, সে তোমাকে যে কোন মতেই হোক বিবাহ করেছিল, তুমি—।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—যতদূর আমার জানা আছে—যতটুকু অনুমান করতে পারি তাতে তোমরা কোন ধর্মকেই মান না। আমাদের ধর্মানুযায়ী বৈধব্য ধর্মে তোমাদের আস্থা নাই। স্বচ্ছন্দেই তুমি আবার বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু তা তো তুমি করনি। সুতরাং তার প্রতি তোমার অনুরাগকে তো অস্বীকার করতে পারি না। আমার জাতিধর্মের কথা তুমি ভেবো না। যতদিন পর্যন্ত আচার লঙ্ঘনের দ্বিতীয় সুযোগের জন্য মনকে চঞ্চল করে, ততদিন ধর্ম বল জাতি বল আচারগত থাকে। আচার লঙ্ঘন করলেই লোভ মাথা ঠেলে ওঠে, আমার ধর্ম আর আচারগত নাই ভাই। তুমি আমাকে সরবত এনে দাও। আমি পিপাসা অনুভব করছি।

অরুণা সরবত আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—এইবার আমাকে নিষ্কৃতি দিন।

আপনি—। আমারও—সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

—আমায় যেতে বলছ? কিন্তু অজয় না ফেরা পর্যন্ত তো যেতে পারব না আমি।

অরুণা পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পর সে বাহির হইয়া আসিল। বলিল—আমি স্বর্ণকে বলে যাচ্ছি সে আপনার খাওয়ার উদ্যোগ করে দেবে। যেমন বলবেন—তেমনি ব্যবস্থাই আগে থেকে করা আছে। ইস্কুলের হেডপণ্ডিত মশায়ের বিধবা মেয়ে—তিনি আমাদের ইস্কুলে শিশু-দের ক্লাশে পড়ান, বড় মেয়েদের রান্না শেখান, তিনি রান্না করবেন। যদি নিজে রান্না করতে চান—তিনি যোগাড় করে দেবেন। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

অপরাহ্ণে দেবু অজয়ের সংবাদ লইয়া আসিল।

অজয় বেলা তিনটার আপ ট্রেনে কাশীর টিকিট কিনিয়া চড়িয়াছে। গৌর তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—সে ফিরে নাই। গৌরও তার সঙ্গে গিয়াছে।

অজয়ের সংবাদ দিয়া দেবু ন্যায়রত্নকে ওই কথাগুলিই বলিতেছিল—এমন সময় ফিরিয়াছিল অরুণা।

দেবু সবিনয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল—আপনি সারাদিন কোথায় ছিলেন? এ কি চেহারা হয়েছে আপনার।

অরুণা বলিয়াছিল অজয়ের খবর পেয়েছেন। সে ফিরল না। কিছুতেই ফিরল না। আমি খুঁজে তাদের বের করেছিলাম। সারাটা দিন—ময়ূরাক্ষীর ধারে বসেছিল। গৌর অনেক বুঝিয়েছিল, আমি শুধু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কাছে যেতে পারলাম না।

সে হাঁপাইতেছিল। ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—বস তুমি, শান্ত হও। সুস্থ হও। মিথ্যে তুমি বুকের উপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে কষ্ট পাচ্ছ ভাই।

—না। বসব না। আমি রওনা হব।

—সে কি? কোথায়?

—কাশী, কাশী যাব আমি। আধঘণ্টার মধ্যে ট্রেন, আপনি নিষেধ করবেন না আমাকে।

মৃদু হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—না নিষেধ করব না।

অরুণা চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ন্যায়রত্নের টোলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকটি আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় ছাত্রেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। ধর্ম তাহারা বিসর্জন দিবে কি করিয়া? অধ্যাপক মহাশয়ও চাবি দিতে আসিয়াছেন। তিনিও—।

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—কিছুদিন অন্তত না গেলে—। অর্থাৎ ব্যাপারটা সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করে—। মানে—আপনার অবিদিত তো কিছুই নাই, সামান্য ব্যক্তি আমি—।

ন্যায়রত্ন হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন—দাও—চাবি দাও।

তাহার পর উঠিয়া বসিয়া দেবুকে বলিয়াছিলেন—পণ্ডিত, মহাগ্রামে যেতে হবে আমাকে।

*　　　　*　　　　*

মাসখানেক পর ন্যায়রত্ন ময়ূরাক্ষী পার হইয়া দ্বারমণ্ডলের বন্দর ঘাটের বটতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাড়ির বিগ্রহসেবার নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি। একদা তাঁহারাই ছিলেন পঞ্চগ্রামের বিধানদাতা, সমাজপতি। আজ পঞ্চগ্রাম হইতে দ্বারমণ্ডলে তাঁহার বংশদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে তাঁহাকে।

অজয় কাশীতে পৌঁছিয়াছে। গৌর ফিরিয়াছে। অরুণার সংবাদ গৌর জানে না। আর কোন সংবাদ আজও তিনি পান নাই।

দ্বারমণ্ডল ঘাটে দাঁড়াইয়াছিল দেবকী সেন কবিরাজ। সে সসম্ভ্রমে আগাইয়া আসিল।

সারা পঞ্চগ্রাম ধ্বংসোন্মুখ। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ জীবনও ন্যায়রত্নের দিকে যেন শেষ শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিমুখ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে।

টোল হইতে ছাত্রেরা চলিয়া গেল। অধ্যাপক ন্যায়রত্নেরই ছাত্র, তিনিও সবিনয়ে বিদায় লইলেন। ন্যায়রত্ন তাঁহার হাত হইতে চাবি লইয়া দীর্ঘকাল পরে বাড়িতে ফিরিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া আপন মনেই হাসিয়াছিলেন। আগের কাল হইলে এই প্রস্তর বিগ্রহের সঙ্গেই আপন মনে কয়েকটা কথা বলিতেন। কিন্তু আঘাতের পর আঘাতের মধ্য দিয়া তিনি এমন এক উপলব্ধির স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন যে, বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলিবার মতো হৃদয়াবেগ বা বিশ্বাস তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন অথবা অতিক্রম করিয়াছেন। যাক সে কথা। ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তিগদগদচিত্তে কথা বলুন বা না-বলুন, তাঁহাদের বংশের গৃহদেবতার পূজা তাঁহাকে করিতে হইবে। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হইতে দিবেন না।

কিন্তু আশি বৎসর বয়সে কাজটা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। সমস্ত সংসারটায় মানুষ তিনি একা, প্রথম দিনই ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানে বাহির হইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাড়ির দরজায় জল দিয়া মার্জনা করার প্রয়োজন। তাহার পর—বাড়িটা পরিষ্কার করিতে হইবে, ঝাঁট দেওয়া—নিকানো—পূজার বাসন মাজা—কাজ অনেক। কাজগুলির হিসাব তাঁহার ভুল হইবার নয়, কিন্তু এসব কাজের অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই। খুঁজিয়া পাতিয়া ঝাঁটা গাছটা হাতে করিয়া ন্যায়রত্ন হাসিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ হাসিটা বাড়িয়া গেল—তবু তো এঁটো বাসন নাই। কিছুক্ষণ ঝাঁটা টানিয়া ঝাঁটা-গাছটাকে শেষ পর্যন্ত ফেলিয়া দিতে হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহের গণ্ডীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিলেন। ঠাকুরের ঘর—ঠাকুর ঘরের বারান্দা—এবং টোলবাড়ির মাত্র একখানি ঘর—এই লইয়া গৃহের গণ্ডী স্থির করিলেন। সেইটুকু পরিষ্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন স্নানের জন্য। ময়ূরাক্ষী এখান হইতে খানিটা দূরে। গোটা পঞ্চগ্রামের মাঠখানা পার হইতে হয়। এখানে স্নানের জন্য দীঘি আছে। গ্রামের প্রান্তে বহুকালের মজা দীঘি।

দীঘির ঘাটে আসিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

পঞ্চগ্রামের মাঠের পাঁচটি আলপথে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষের সারি। চলিয়াছে দ্বারমণ্ডল ঘাটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। পাঁচটা গানের সুর ও কথা একসঙ্গে মিশিয়া এমনি বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছে যে বুঝিবার কিছু উপায় নাই।

—বাবাঠাকুর।

ন্যায়রত্ন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন—একটি প্রৌঢ়া বিধবা একটা বোঝাই ঝুড়ি মাথায়, তাঁহাকে দেখিয়া বোধহয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বোঝার ভারে তাহার ঘাড়টা কাঁপিতেছে। মুখখানা সম্পূর্ণ অনাবৃত। এই অগ্রহায়ণের শীত-শীতল প্রভাবে—কতকটা ঠাণ্ডার জন্য কতকটা লজ্জার জন্য মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে; ভারের চাপে সে এমনি আড়ষ্ট যে চোখ তুলিয়াও চাহিতে পারিতেছে না। বাবাঠাকুর বলিয়া ডাকিয়াও সে মাটির দিকে চাহিয়া আছে। ন্যায়রত্ন চিনিতে পারিলেন না—প্রশ্ন করিলেন—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, মা?

—আমি বাবাঠাকুর—। একটু থামিয়া বোধ হয় ভাবিয়া লইল—কি বলিয়া অর্থাৎ কাহার নাম বলিয়া পরিচয় দিবে। অবশেষে বলিল—আমি বাবাঠাকুর—নারকেলে কুলতলা বাড়ির কন্যে চম্পার ভাইয়ের পরিবার।

চমকিয়া উঠিলেন ন্যায়রত্ন। বর্ধিষ্ণু সদ্গোপ বাড়ির বধূ। নারকেলকুলের গাছ বাড়িতে ছিল বলিয়া কুলতলার বাড়ি নামেই বাড়িটা এ অঞ্চলে পরিচিত। ঐ বাড়ির বিধবা কন্যা চম্পা এককালে সদ্গোপ পাড়ার মুখপাত্রী ছিল। অদ্ভুত মেয়ে ছিল সে। যেমন তাহার সাহস—তেমনি মার্জিত কথাবার্তা—তেমনি ছিল তাহার উদার হৃদয়। চম্পা অনেকদিন মারা গিয়াছে। বিশ্বনাথের বিবাহের বৎসরেই বোধ হয়। সেই বাড়ির বধূ এই শীতের ভোরবেলা—এতবড় একটা বোঝা মাথায় কোথায় চলিয়াছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন—কোথায় চলেছ মা? এই বোঝা মাথায়—।

মেয়েটি বলিল—জংশনে যাচ্ছি বাবা। ক্ষেতের বেগুন, মুলো, পালং শাক নিয়ে যাচ্ছি।

—তুমি নিজে—

—হ্যাঁ বাবা। নিজে বেচলে দুটো পয়সা বেশি পাই। পাইকারেরা আসে—তারা তো বাবা জংশনের দাম দেবে না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর বাবা—সে বয়েসও নাই—সে অযুধ্যেও নাই। এখানে কে কিনবে। কে আসে? হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল—আম যাই বাবাঠাকুর—ওই সব এসে পড়েছে।

ন্যায়রত্ন দেখিলেন—মেয়েপুরুষে আরও প্রায় দশ বারোজন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দ্বারমণ্ডলের ঘাটের পথ ধরিল। মেয়েদের মাথায় ঝুড়ি। পুরুষের কাঁধে ভার। ন্যায়রত্ন বলিলেন—ওরা? ওরা কারা মা? ওই যে পিঁপড়ের সারির মতো। মেয়েরা গান গাইতে গাইতে চলেছে—? ওরা? ওরা সব মজুরেরা না? কলে খাটতে যাচ্ছে? তিনি দেখাইয়া দিলেন—যাহাদের তিনি ঘাটে আসিয়াই দেখিয়া বিস্মিত

হইয়াছিলেন।

—হাঁা বাবাঠাকুর। সব চললো জংশনে খাটতে। তিনপহর খাটবে—বেটাছেলে আটআনা মেয়েছেলে দু'আনা মজুরী। গাঁয়ে ঘরে কাজও নাই। থাকলেও মজুরী কে দেবে বলুন। ওদের দোষ কি বাবা—এই আমি হতভাগী—আমার কি নিজের মাথায় ঝুড়ি বয়ে জংশনে তরকারি বিক্রির কথা বাবা? কিন্তু কি করব?

মেয়েটি চলিয়া গেল, তরিতরকারিবাহী মেয়ে পুরুষের দল—দীঘির ওদিকের পাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল—সে দ্রুতপদে গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিল। ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন সে কালের কথা! সমৃদ্ধ পঞ্চগ্রাম। ফসল-সমৃদ্ধ মাঠ, ধান-ভরা মরাই, মরাই-ভরা বিচালী-ভরা খামার। ঘরে ঘরে তরির বাগান শাকের ক্ষেত। লাউ-কুমড়া উচ্ছের মাচা, জোয়ান চাষীর দল, কত মানুষ—নাতিপুতিতে ভরা সুখের সংসার, সাদামাথা আশি—পচাশি—নব্বুই বছরের মাতব্বর সব। হা-হা করিয়া প্রাণমাতানো হাসি। বারো মাসে তের পাবন। সে সবের আর কিছুই নাই। দশ বৎসর পূর্বেও তিনি যখন কাশী যান—তখন যাহা ছিল—আজ তাহা নাই। বারো বৎসরে একটা যুগ হয়—বারো বৎসরও লাগিল না।

ঘাটে নামিতে শুরু করিলেন। হঠাৎ নজরে পড়িল - ওদিকের পাড়ে তরিতরকারি-বাহীর দল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে দেখিতেছে। কুলতলাবাড়ির চাষী বউ আঙুল দিয়া তাঁহাকেই দেখাইতেছে। ম্লান হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

স্নান সারিয়া ফিরিলেন। সমস্ত পথটার মধ্যে একজনও পুরুষের সঙ্গে দেখা হইল না। কয়েকটি অল্পবয়েসী মেয়ে—ঘাটের উপর বা পথের ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিল। মহাগ্রাম পূর্বে ছিল আঠারো পাড়ার গ্রাম। তিনি নিজেও আঠারো পাড়া দেখেন নাই। তবে বারোটি পাড়া তিনি দেখিয়াছেন। পণ্ডিতপাড়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পল্লী, কায়স্থপল্লীর নাম ছিল মুন্সীপাড়া। বাজারপাড়াটা ছিল সর্বাপেক্ষা বড়ো—গন্ধবণিক, মোদক, তৈলিক, স্বর্ণকারদের বাস ছিল—দোকানও ছিল। একটা পাড়ায় বাস ছিল সদগোপ ও গোপেদের, তন্তুবায় পল্লী, কর্মকার পল্লী, কুম্ভকার পল্লী, রজক পল্লী, সাহা পল্লী,—গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ছিল বাগদী, বাউড়ী, ডোম, হাড়ি প্রভৃতির বাস। আর একটি পল্লী ছিল গ্রামের উত্তর দিকে—একটি পুকুরের পাড়ে কয়েক ঘর বৈষ্ণবের বাস—বৈরাগী পাড়া, তাহারই কাছেই ছিল পটুয়া পাড়া।

বহু পূর্বে শঙ্খবণিকদের একটি স্বতন্ত্র পল্লী ছিল। যোগী সম্প্রদায়েরও বাস ছিল। ওই দক্ষিণ দিকে ছিল পাউড়ে পাড়া বা মাঝিপাড়া। বন্দর ঘাটের নৌকা চলাচলের কাজ—তাহারা বড় বড় নৌকা লইয়া দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আসিত। সে সব অনেককাল পূর্বেই—অনেক কাল।

—কে গো? কে? কে যাও গো?

গ্রামের মধ্যেই খানিকটা বসতিহীন খোলা জায়গা। অনেকখানি জায়গা—প্রায় তিন-চার বিঘা তো বটেই—বেশিও হইতে পারে; ন্যায়রত্ন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। 'ও—কঙ্কণার পল্লীর পড়িয়ানি কাটার মাঠ। ওই যে সারিবন্দী চারিটা গাছ। একটা

বকুল—একটা অশথ—একটা শিরীষ—একটা বট। তন্তুবায় পল্লীর মধ্যে এই স্থানটুকু চিরকাল খালি পড়িয়া আছে। এইখানে তন্তুবায়েরা কাপড় বুনিবার পড়িয়ানি সুতা বাঁটিয়া লইত। মোটা মোটা পাথরগুলি আজও পড়িয়া আছে। ওই গাছ চারিটা ছায়া রচনা করিবার জন্য বহুকাল পূর্বে তন্তুবায়দের প্রধানেরা লাগাইয়াছিল। বকুল এবং অশথ গাছ দুইটা তাহাদের প্রতিষ্ঠা করা গাছ। কিন্তু কে ডাকে? গোটা জায়গাটাই তো খাঁ-খাঁ করিতেছে।

—বলি সাড়া দাও না ক্যানে গো? কানা মানুষ নিয়ে আমোদ লাগছে বুঝি।

ন্যায়রত্ন এবার সাড়া দিলেন—আমি শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন, বাবা তুমি কে?

লোকটি যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল—বাবাঠাকুর। ইহার পরই খানিকটা আবেগময় ভাষাহীন স্বর—যেন আপনি তাহার গলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—তুমি কে বাবা? তুমি কই? হৃদয়াবেগে তিনি খানিকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিয়াছেন—বয়স্ক বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ যে তাঁহার সমসাময়িক হইবে—ইহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সম্ভবত তন্তুবায় পল্লীর কেহ হইবে। কে? দশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি দেশত্যাগ করেন—তখনও পল্লীতে প্রধান ব্যক্তি তিনজন বাঁচিয়াছিল, ফকির দাস, রমন দাস ও ষষ্ঠী দাস।

—বাবাঠাকুর। বাবাঠাকুর। লোকটি কাঁদিতেছে। এইবার ন্যায়রত্ন দেখিলেন—গাছতলার আড়াল হইতে লাঠি ধরিয়া উঠিয়া দাড়াইয়াছে এক বৃদ্ধ। বাঁকিয়া গিয়াছে বুড়া। ন্যায়রত্নের দৃষ্টি এখনও আছে, কিন্তু বয়সের প্রভাবে দূর হইতে চিনিতে পারিলেন না। লোকটি লাঠি ঠুকিয়া পথের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। দৃষ্টিহীনতার মধ্যে সে চলাফেরার অভ্যাসে দিব্য চলিয়া আসিতেছে—মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া হাতের লাঠিটা দিয়া সামনে হাত বাড়াইয়া দেখিয়া লইতেছে—লাঠিটা কিছুতে ঠেকিতেছে কি না—অর্থাৎ কোন বাধাবিঘ্ন সামনে আছে কি?

—ষষ্ঠী দাস। তুমি এমন হয়ে গিয়েছ বাবা।

ষষ্ঠী দাস কথা বলিতে পারিল না, দন্তহীন মুখের লোল ঠোঁট দুটি ফাল্গুনের অশ্বত্থ-বৃক্ষের শেষ পাকা পাতাটার মত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

আপুনি দেবতা—। আপুনি—। আমার কপাল বাবা,—এই দেখেন—। কথা খুঁজিয়া সে পাইতেছে না। হঠাৎ লাঠিগাছটা ফেলিয়া দিয়া সে বসিয়া পড়িল—তারপর মাটির উপর মাথাটা লুটাইয়া দিয়া বলিল—প্রণাম করি বাবা, প্রণাম করি।

ন্যায়রত্নের চোখে জল আসিল

—পূজো হয়ে গিয়েছে দেবতা?

মৃদু হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—পায়ের ধুলো নেবে?

—আজ্ঞে? খানিক জোরে বলেন—বাবা, শুধু চোখ নয় বাবা—কানের মাথাও খেয়েছি।

—ন্যায়রত্ন কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়াই বলিলেন—নাও, পায়ের ধুলো নাও তুমি।

—নোব? হাত বাড়াইয়াও ষষ্ঠী প্রশ্ন করিল।

—নাও।

হাতড়াইয়া পা দুটি খুঁজিয়া লইয়া বৃদ্ধ মুখে কপালে মাথায় বুকে ধুলা বুলাইয়া লইয়া বলিল—আজ তিন বছর মরণের দিন গুনছি। বিধেতাকে বলি—তোমার বিচার নাই। এ বেঁচে থেকে আমার লাভ কি? তা—। বৃদ্ধের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিল—তা সাথক হল বাবাঠাকুর। মরে গেলে এ ধুলো পেতাম না। আঃ! আঃ! বুক জুড়িয়ে গেল। আর কঙ্কণার বাবুরা—চিহরি ঘোষ মাশায় বলে কিনা বাবা পাঁচখানা গাঁয়ে খবর পাঠিয়ে বলছে বাবা যে, ঠাকুরমাশায় মাহাত্ম্যি হারিয়েছেন। নাতি মুসলমান হয়েছিল—তাঁকে আর তোমরা মেনো না। বাবা—কঙ্কণার বাবুরা বামুন—সে তো নামে। জানি তো সব। আর চিহরিকে দেখলাম চাষ করতে লাঙল ধরে, তা পরেতে হলো পত্তনীদার—তা পরেতে জমিদার—হাকিম—তা হলেও তো সদ-গোপ। সে বাবা—আপনার মতো দেবতার কুচ্ছো করে—। শুনে আমার মনে হল বাবা - যাক পিথিমী রসাতলে যাক গিয়েছেই তো, আরও যাক—আরও যাক। মিছে কথার কি সীমে নাই বাবা, আপনাদের বংশ দেবতার বংশ—সেই বংশের ছেলে—সে জাত দেবে—মোসলমান হবে? হে হরি—হে ভগবান—হে কালী—হে দুগ্গা—মুখে খসে যায় না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তুমি তাদের মিথ্যে অভিসম্পাত করছ ষষ্ঠী।—আমি যেদিন এখান থেকে কাশী চলে যাই তখন তো আমি গোপন করে যাইনি যে আমার নাতি ধর্মত্যাগ করেছে—নাস্তিক হয়ে গলার পৈতে ফেলে দিয়েছে। সে কথা কি তুমি শোননি?

—শুনেছি বাবা—শুনেছি। কিন্তুক—সে কথা আর এ-কথা কি এক কথা হল বাবা? আর আমার খোঁজে দরকার কি বল? মরে যে গেল—সে কোথায় জন্মাল—তার খোঁজ কে রাখে! এও তাই।

বুড়া দৃষ্টিহীন চোখে ন্যায়রত্নের দিকে অর্থহীনভাবে চাহিয়া রহিল—কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, অবশেষে বলিল—মরে যে ভূতও হয় বাবাঠাকুর। মরণ মাত্রেই তো জন্ম হয় না। কিন্তু আপনার নাতি কি সত্যই—

—হ্যাঁ ষষ্ঠী। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত সে হয়েছিল। তারপর অবিশ্যি—আবার নাকি হিন্দু হয়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে দুটোই মিছে কথা। মুসলমান হওয়াও মিথ্যে—আবার হিন্দু হওয়াও মিথ্যে।

দন্তহীন মুখে হাঁ করিয়া সে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, সম্ভবত তাহার মনের মীমাংসাহীন প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছিল চিরাচরিত ধারায়। ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি চললাম ষষ্ঠী।

ষষ্ঠী উত্তর দিল না। সেই উপরের দিকেই মুখ তুলিয়া দৃষ্টিহীন চোখে কুয়াশার মতো গাঢ় সাদা পরিমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বসিয়াই রহিল।

* * *

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন তবু দেহ তাঁহার সক্ষম আছে। পূজা সারিয়া ভোগ রান্না

করিয়া, ভোগ দিয়া—অপরাহ্নে একবার গ্রামখানা ঘুরিতে বাহির হইলেন। তিনি গ্রামে ফিরিয়াছেন—এ সংবাদ সকলে না পাইলেও অনেকে পাইয়াছে, কিন্তু তবু কেহ দেখা করিতে আসে নাই। এ-জন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ হয় নাই, কিন্তু বেদনা খানিকটা অনুভব করিয়াছিলেন। সেটা অবশ্য কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাহার পরই তিনি নিজে-নিজেই হাসিয়াছিলেন। মানুষকে অকৃতজ্ঞও বলেন নাই, ঘৃণাও করেন নাই। প্রণামই জানাইয়াছেন। অপরাধ তো তাহাদের নয়—অপরাধ তাঁহার। দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া যাহা তাঁহারাই বুঝাইয়াছেন—তাহাই তাহারা বুঝিয়া আসিয়াছে, অনেক মাশুল দিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে। আজ সেই বোঝা-বুঝির তত্ত্বকে এমন ভাবে 'না' করিয়া দিলে তাহারা যে দেউলিয়া হইয়া যাইবে, কি লইয়া বাঁচিবে? জীবনে অনেক মূল্য দিয়া অনেক আঘাত সহিয়া তিনি আজ যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—যে উপলব্ধির বলে আজ তিনি ওই অরুণা মেয়েটিকে আপনার পৌত্রবধূ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন—সে সত্য প্রকাশ করাও সহজ নয়। প্রকাশ করিলেও—যাহারা তাঁহার মতো আঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কালের অনিবার্যতাকে উপলব্ধি করে নাই—তাহাদের পক্ষে গ্রহণ করাও সহজ নয়। তিনি তো নিজের চোখেই দেখিয়াছেন—অগ্রহায়ণের শীতজর্জর রাত্রির শেষ প্রহরে এ অঞ্চলের মানুষের কত বড় জনতা সকল দৈহিক কষ্ট উপেক্ষা করিয়া গভীর আন্তরিকতা লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে জংশন স্টেশনে ছুটিয়া গিয়াছিল; তাঁহার পায়ের ধুলা লইবার জন্য তাহাদের সে কি ব্যাকুল বাসনা! তাহারা আজ যে ওই একটি ঘটনায় —এমনভাবে তাঁহার দিকে বিমুখ হইয়া বসিয়াছে—সে কি সহজ বেদনার। অনিবার্য অবশ্যম্ভাবীরূপে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকেই সহজভাবেই গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেই বাহির হইলেন।

এক একটি করিয়া পাড়া ঘুরিলেন।

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পল্লীতে পুরুষ প্রায় নাই। বৈদ্যেরা বাস পর্যন্ত তুলিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তিনি যখন কাশী যান—তখনও বৈদ্য ছিল তিন ঘর। তিন ঘরের একঘর এখন কলিকাতায়, একঘর সদর সহরে, একঘর জংশনে। জংশনে যে ঘরটি আছে—সেই ঘরের কর্তা নিরঞ্জন সেন কবিরাজী করেন—ছেলে মেয়েরা পড়ে। কলিকাতায় যে ঘরটি আছে—সে ঘরের ছেলে এখন বড় চাকুরে। সদর শহরে যিনি আছেন তিনি উকিল। ব্রাহ্মণ ছিল বিশ ঘর। তাঁহাদের অবশিষ্ট ঘর দশেক। পাঁচ ঘর শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঁচ ঘর চাকুরিসূত্রে বাসায় থাকে। বাকি সব ঘরের অবস্থা মর্মান্তিক। তিন ঘরের ছেলেরা বিড়ি বাঁধে জংশনে, জন ছয়েক কলে চাকুরি করে—পাচকের চাকুরি।

এক ঘরের দুটি ভাই কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে চাকরি করে, দেবসেবা করে। জানিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ন্যায়রত্ন। তিনি তাহাদের জানেন, বাল্যকালে ইংরাজি ইস্কুলে পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া নিচের দিকের তিনটি শ্রেণীতে কাটাইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া তাঁহার টোলে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। বৎসরখানেক টোলে পড়িয়া—কঠিন সংস্কৃত পড়ায় ইস্তফা দিয়া—বেকার হইয়া বসিয়াছিল। অবশেষে

ওইটুকু সংস্কৃত বিদ্যার জোরে কঙ্কণার বাবুদের পোষা কয়েকটা বিগ্রহের পূজার ভার লইয়াছে। বিগ্রহ পাথরের, বাবুরা সংস্কৃত জানেন না, বেশি খরচ করিতেও নারাজ, সুতরাং স্বল্প বেতনে উপবীত-ধারী ব্যক্তি দুটিকে নিযুক্ত করিয়াছেন ; তাহারা উচ্চকণ্ঠে অনুস্বরে বিসর্গ লাগাইয়া যাহাই বলিয়া থাকে—তাহাতেই তাঁহারা খুশি।

একঘরের একটি ছেলে জংশনে কংগ্রেসের আড্ডায় আসর পাতিয়াছে। অন্য দুটি ছেলে চাকরি করে মাড়োয়ারির গদিতে। ডবল চাকরি—ভাতও রাঁধিতে হয়—আবার গদীর অন্য কাজও করিতে হয়।

বাকি তিনটি ঘরের দুটি ঘরের পুরুষেরা বেকার ; একজনের একটি পেশা আছে—পিতৃদায় মাতৃদায়গ্রস্ত সাজিয়া দেশে-দেশান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। আর একজন শিবকালীপুরে গগন ডাক্তারের আড্ডার সভ্য। এক ঘরের পুরুষ অভিভাবক নাই। শুধু দুটি বিধবা আছে।

বাজার পাড়াটা—দশ-বারো বৎসর পূর্বেও শনি মঙ্গলবারে হাট বসিত। দুই-তিনখানা গ্রামের লোক আসিয়া জমিত। জংশন হইতে গরুর গাড়ি লইয়া বড় ব্যবসায়ীরা আসিয়া ধান চাল তরিতরকারী কিনিয়া লইয়া যাইত। মোদকের ছোটখাটো দোকান বসিত—তেলেভাজা—বাতাসা পাটালী-মণ্ডা রসগোল্লা বিক্রি করিত। তন্তুবায়েরা মোটা কাপড়, গামছার দোকান খুলিত। আজ সে হাটও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাজারে মাত্র খানতিনেক মুদীর দোকান আছে। নামে মিষ্টান্নের দোকান হইলেও বাতাসা কদমা পাটালীর দোকান দুখানা অবশিষ্ট। তৈলিকদের বাড়িতে ঘানি নাই—জংশনে তেলের কল বসিয়াছে ; তৈলিকরা চাষ করে, মহাজনি করে—একজন জংশনে খুলিয়াছে ফলের দোকান।

একমাত্র সদগোপ পল্লীর মানুষেরা আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ঘর অনেক কমিয়াছে। দু-চারজন শহরে বাজারে চাকরের কাজ গ্রহণ করিয়াছে—তবু মোটামুটি তাহারাই যেন এখনও বাঁচিয়া আছে। গ্রামের শেষপ্রান্তে বাউরিপাড়াটা প্রায় খাঁ খাঁ করিতেছে। ঘর দুয়ার বন্ধ—উঠানে পাঁদাড়ে আশেপাশে মুরগি ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছে, দুই-চারিটা কুকুর উঠানে শুইয়া ঝিমাইতেছে। এক একটি গাছতলায় বৃদ্ধ-অথর্বেরা বসিয়া তামাক খাইতেছে। দুইটা বুড়ি পরস্পরের মাথার উকুন বাছিতেছে। বাকি সব গিয়াছে জংশনে। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বৈরাগীপাড়ায় মাত্র ঘর দুই বৈষ্ণব অবশিষ্ট। তাহার পাশে পটুয়াপাড়াটা একেবারে নিশ্চিহ্ন বলিলেই হয়—একখানা ঘরও অবশিষ্ট নাই, পড়িয়া আছে কতকগুলি ধ্বংসস্তূপ।

—রাধাগোবিন্দ প্রভু। প্রণাম হই।

বৃদ্ধ বাউল হরিদাস আজও বাঁচিয়া আছে। গাছতলায় বসিয়া সে তামাক খাইতেছিল। বৃদ্ধ ন্যায়রত্নকে দেখিয়াই চিনিয়াছে। বৃদ্ধ ন্যায়রত্নও দেখিয়াই চিনিয়াছে। ন্যায়রত্নও তাহাকে চিনিলেন। বলিলেন—হরিদাস, বেঁচে আছ ?

—গোবিন্দের ইচ্ছে প্রভু! মরি নাই। ম্যালেরিয়া জরে ভুগছি—লোকজন মরে যাচ্ছে দেখছি, কি জনকে বলছি—গিয়ে সেখানে বলিস—হরিদাসের ঘণ্টাটা বাজিয়ে

দিতে। তা কোথায় কি ? ঘণ্টাও বাজে না—পালাও ফুরোয় না। আপনি—

—আমারও তাই হরিদাস !

—আপনার বোধ হয় কাজ আছে প্রভু। কাজ আপনাকে করতেই হবে।

—তাহলে ও-কথাটা নিজে কেন ভাব না হরিদাস ?

- ওই দেখেন বাবা, কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে। তুষে আগুন ধরালেই ছাই।

হাসিলেন ন্যায়রত্ন। হরিদাসের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই। ওই বিনয়ই উহার জীবনের ধর্ম-তত্ত্ব—তৃণাদপি সুনীচেন—। ও কিছুতেই নিজের মূল্য স্বীকার করিবে না। ও কথা ছাড়িয়া তিনি বলিলেন—পুটুয়ারা আর কেউ বেঁচে নেই হরিদাস ? গোটা পাড়াটা—

হরিদাস চকিতে একবার ওই দিকে তাকাইয়া লইয়া বলিল বেচে আছে বাবা, তবে পাড়াটা নাই। ব্রজ ছেড়ে সব মথুরা গেলেন বাবা। হরিদাস হাসিল—বলিল—ওরা নামমাত্র ধর্মে মুসলমান ছিল বাবা, এবার সব পাকাপোক্ত ভাবে মুসলমান হয়ে গেল। সব উঠে গিয়েছে কুসুমপুরে। নতুন পাড়া করে বসেছে সেখানে। হিন্দু নাম টাম ছেড়ে—ইসলামী নাম নিয়েছে। শুনছি এইবার শেখেরা ওদিকে নিয়ে করণ-কারনও করবে।

ন্যায়রত্ন এবার তাকাইলেন কুসুমপুরের দিকে।

সামনেই শিবকালীপুর, শিবকালীপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে কুসুমপুর। কোনা-কুনি উত্তর-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে বিস্তীর্ণ মাঠ। গ্রামগুলি বহুকালের বৃক্ষসমাচ্ছন্নতার শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার মধ্যে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখাইতেছে সাদা দুটো চিলেকোঠা। গাছের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

—ও পাকা চিলেকোঠা দুটো ? হরিদাস ? ও দুটো তো ছিল না। একটি মনে হচ্ছে শিবকালীপুরে, ওটা বোধ হয় শ্রীহরি ঘোষের ? না ?

- আজ্ঞে হ্যা প্রভু, ওটি ঘোষ প্রভুরই বটে। আর ওটি হল কুসুমপুরের হাজী সাহেব প্রভুর। হঠাৎ হরিদাস থামিয়া গেল। তারপর বলিল—হঁা প্রভু—এই মীমাংসাটা হল—এটা কেমন হল প্রভু ?

—কোন্‌টা ?

আজ্ঞে। জংশনের ওই চণ্ডীমায়ের থানে—মসজিদের মীমাংসা ?

- মীমাংসা তো আমি করিনি হরিদাস।

—তবে যে লোকে বলছে—

—কি বলছে ?

—বলছে—বাবাঠাকুরের নাতি মুসলমান হয়েছিল—তাই ভাগ খানিক ছেড়ে দিতে হল।

চমকিয়া উঠিলেন ন্যায়রত্ন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—না হরিদাস, ও তুমি ভুল শুনেছ।

*　　　　　　*　　　　　　*

ন্যায়রত্ন একে একে পঞ্চগ্রামের সব গ্রামগুলিই ঘুরিলেন।

সব গ্রামের এক দশা। শিবকালীপুরে জগন ডাক্তার বলিল—আপনি শেষটা এই করলেন ঠাকুরমশায়? আমার মশায় পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ নাই। আমি সোজাসুজি কথা বলি। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের জোর কমে যায়, তা জানি, কিন্তু তাই বলে—। এটা আপনার ঠিক হয়নি, লোকে আর আপনাকে মানবে না।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। কি উত্তর দিবেন।

জগন বলিল—আপনি অবশ্যি কি করবেন? এ কালই হয়েছে এমনি। নইলে বিশ্বনাথের মতো মানুষ—আমরা তো ভাবতাম বয়সকালে আপনার পাট বজায় রাখবে। সে এমন কাজ করলে। দেবু—তারটাও দেখুন—সে তিনকড়ির বিধবা মেয়েটাকে পড়াতে গিয়ে বিয়ে করে বসল। কিন্তু—কিন্তু ওই মেয়েটাকে নাতবউ বলে স্বীকার করলেন কেন?

ন্যায়রত্ন আবার হাসিলেন।

জগন বলিল—শ্রীহরি ঘোষ, কঙ্কণার বাবুরা আপনাকে পতিত করবার জন্যে গায়ে গায়ে বলে পাঠাচ্ছে। তা আমরা হতে দেব না। সে হবে না। কিন্তু—

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ও সব কথা থাক জগন। আমি এখানে আর ঠাকুর সেজে আসিনি। দৈবক্রমে এসে পড়েছি মাত্র। এখন এখানকার খবর বল। সেই দেখতেই বেরিয়েছি।

—কি দেখবেন? কি শুনবেন? সব শেষ, সব খেয়ে ফেললে তিন-চার বেটাতে। ওই শ্রীহরি ঘোষ, কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবু, দৌলত হাজী—আর এখন দু-তিন বেটা পেটোয়া মহাজন উঠেছে—তারাই।

ন্যায়রত্ন আর কথা বাড়াইলেন না। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। জগন তাঁহাকে ছাড়িল না, সঙ্গে সঙ্গে সেও অগ্রসর হইল।

মহাগ্রামের মত একই দশা। স্তিমিত গ্রাম-জীবন আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই, শ্রী নাই, বহুকালের জীর্ণ লোলুপ রোগীর মত পাণ্ডুর চোখে অন্ন-অন্নে দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

শিবকালীপুরের সঙ্গে মহাগ্রাম এক জায়গায় পৃথক। শ্রীহরির অভ্যুদয় হইয়াছে এখানে। পাকাবাড়ি—বাঁধানো পুকুর—দেবালয়—এইসব লইয়াই গ্রামের একটা দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার বাউড়ী ও বায়েনপাড়ায় কিছু লোকজনও রহিয়াছে। উহারা সকলেই খাটে শ্রীহরি ঘোষের বাড়িতে। নিত্যই কোন-না-কোন কাজ সেখানে আছেই। বাকি সকলে এ গ্রাম হইতেই চলিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন একটা ভিটের সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন—এইটা সেই দুর্গা বলে বায়েনদের মেয়েটির বাড়ি ছিল না?

—হ্যাঁ, দুর্গা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। মেয়েটা—

—মেয়েটির আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছিল।

—মেয়েটা দেবুকে ভালবাসত।

—ভালবাসাই তো মানুষকে উদ্ধার করে জগন, আমি জানি সে কথা। ভালবেসেই মেয়েটি অসৎ পথ থেকে ফিরেছিল। ভালবেসেই সে যখন মরেছে—সে যেমন করেই মরে থাক—সে উদ্ধার পেয়েছে।

জগন অবাক হইয়া ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল ন্যায়রত্নের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নহিলে এই কি সেই মানুষ। রুক্ষ পাহাড়ের মত স্তব্ধ স্থির গম্ভীর ন্যায়রত্ন!

—ওরা কারা? ন্যায়রত্ন দেখিলেন পঞ্চগ্রামের বাঁধের উপর একসারি কাহারা চলিয়া আসিতেছে। মজুর নয়। চাষীরাও নয়। আকারে ছোট—।

—ওরা? ও সব ছেলেরা। জংশন ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিল। জংশনে ইস্কুল হয়ে কঙ্কণার বাবুদের ইস্কুলে আর ছেলেরা বড় যায় না। ওখানে এখনও বাবুদিগে দেখলে নমস্কার করতে হয়। এখনও বাবুদের ছেলেদের চালচলন আলাদা।

—এত ছেলে পড়ছে?

—তা পড়ছে। সব যে বোল ধরেছে—লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। তা হচ্ছে - চাষাভূষো বাউড়ী বাগদী এরাও ইস্কুলে গিয়ে বছর কয়েক বি-এল-এ রে পড়ে ঘরে এসে বসছে। বাস, আর লাঙলও ধরবে না। গরুর জাবও কাটবে না। হুঁকোতে তামাকও খাবে না -বিড়ি চাই, জামা চাই। সোগাও·· হতভাগা বাবার দল। এই যে দেখছেন—জংশন শহর—ওটি একটি মহাস্থান—বুঝেছেন না; মন্দ করতেও যত, আবার ভাল করতেও তত। ওই ঠাঁইটি আছে তাই গরীবগুলো খেটে খেয়ে বাঁচছে। ওই ঠাঁইটি আছে তাই জমিদার মহাজন এদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জায়গা আছে। আবার তেমনি অনাচার—না ধর্ম না কিছু। যত ফ্যাশান—তত অপব্যয়। মহাস্থান ওটি—মহাস্থান। এক এক সময় মনে হয়—এই হতভাগা জায়গা থেকে ওখানেই যাই, ছিরে ঘোষ আর কঙ্কণার মুখুজ্জেদের রাজ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে রেহাই পাই। কিন্তু না—শেষ পর্যন্ত লড়াই আমি করব।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল।

ময়ূরাক্ষীর ওপারে—দারমণ্ডল জংশনে আলো জ্বলিতেছে, মিলের ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে বড় বড় উঁচু খুঁটিতে উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্স জ্বলিয়া উঠিতেছে। স্টেশনের ওভার-ব্রিজের উপরে শূন্য মণ্ডপটুকু আলোর আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি ফিরিলেন। বাড়ি বাড়ি ফিরিয়া তিনি জয়াকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন—বিগ্রহসেবার জন্য সে কি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতে রাজী আছে?

কয়েকদিন পর জয়ার উত্তর আসিল—না।

ওই সঙ্গেই সে লিখিল—অজয় ফিরিয়াছে। তাহার কাছেই সে সব শুনিয়াছে। অরুণা মেয়েটি তো কই তাহার সঙ্গে দেখা করে নাই।

ন্যায়রত্ন পত্রখানি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার গৃহদেবতাকে তিনি দারমণ্ডলের

ওই সিদ্ধপীঠ জয়তারার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। দ্বারমণ্ডলের জয়তারার আশ্রমে দেবীর বেদীর নিচে সারি সারি শালগ্রাম শিলা সাজানো আছে, বাহিরে ভৈরব আশ্রমে অর্থাৎ সিদ্ধপীঠ রক্ষক শিবলিঙ্গদেব আশে-পাশে ভগ্ন অভগ্ন শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে। শরণার্থী দেবতার দল। এ অঞ্চলে যাহারা যখন সেবা চালাইতে অক্ষম হইয়াছে—তাহারাই তাহাদের দেবতাটিকে ওইখানে রাখিয়া আসিয়াছে। কোন কোন দেবতা কিছু সম্পত্তি বা অর্থ লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ দেবতা আসিয়াছেন অনাথ আশ্রমের আশ্রয়প্রার্থীর মতো।

সেকালে দ্বারমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল—ওই জয়তারার আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই। সেকালে তাঁহার পূর্বপুরুষ এই দ্বারমণ্ডল হইতেই এই বিগ্রহ প্রতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

*   *   *

এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করিয়াছে দেবকী সেন। তাহার গোপন অভিপ্রায় অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও ন্যায়রত্নের কাছে গোপন রাখে নাই। তাহার ইচ্ছা এই উপলক্ষে আর একটি সমারোহ করিয়া সংগঠন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ হিন্দুদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করিবে। উৎসাহের মধ্যেই আছে উত্তেজনা। উত্তেজনাকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারিলেই কাজ হইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। এ-কাজে তাহাকে কয়েকজন সাহায্য করিতেছেন।

দেবু এ বিষয়ে উদাসীন। ন্যায়রত্নকে সে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে—ন্যায়রত্নের গৃহদেবতার উপরে তাহার সে শ্রদ্ধা নাই এবং এই লইয়া আবার হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে—এই কারণে সে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবকী সেন অগ্রসর হইয়া আসিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি একা এসেছেন?

—দোসর তো নেই কবিরাজ।

—না। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে আপনি এমনভাবে চলাফেরা করবেন না।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন।

—হাসির কথা নয়। একে আপনার বেশ বয়স হয়েছে—তার উপর ওদের ভাবভঙ্গি তো আপনি নিজেই দেখেছেন। হ্যাঁ, দেবুবাবুর কাছে একটা খবর পেলাম—অরুণা দেবী কাশীর পথ থেকে ফিরে কলকাতায় গিয়েছেন।

—কলকাতায় গিয়েছে?

—হ্যাঁ। লিখেছে, কোনো মতেই সেখানে যাওয়ার মতো মনকে শক্ত করতে পারেননি। তারা যদি সেখানে তাকে অপমান করেন—এই সঙ্কোচে পথে ট্রেন থেকে নেমে কলকাতায় ফিরেছেন। এখানেও আর আসবার অভিপ্রায় নাই। এখানকার ইস্কুলের কাজে জবাব দিয়েছেন।

ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মেয়েটি বড় দুঃখী, কবিরাজ।

সেন এ-কথার উত্তর দিল না, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সাইডিং-এর উপর দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না। চলুন ঘুরে যাই।

সম্মুখেই রেলওয়ে সাইডিং। এক মাইলের বেশি লম্বা বিরাট রেলওয়ে সাইডিং। সারি সারি লোহার লাইন পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া আবার পৃথক হইয়া আবার আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। কালো লোহার লাইন—তাহার উপরে ইঞ্জিনের চাকার ঘর্ষণের একটি শাণিত উজ্জ্বল রেখা অন্ধের ব্যগ্র দৃষ্টির মতো স্থির স্তিমিত অথচ উগ্র। মধ্যে মধ্যে পয়েন্টস। ওদিকে গুদাম, এক হইতে আট নম্বর পর্যন্ত মাল রাখিবার সারি সারি শেড। টিনে ছাওয়ানো গুদাম। আকণ্ঠ মালে বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। লাইনের উপর দিয়া মালগাড়ি চলিয়াছে। কোনো গাড়িতে ইঞ্জিন আছে কোনটায় নাই। ইঞ্জিনের ধাক্কায় সেগুলা অন্ধ উন্মত্ত ঘোড়ার মতো ছুটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া গিয়া গতিহীন স্তব্ধ মালগাড়ির গায়ে সশব্দে ধাক্কা মারিয়া আবার খানিকটা পিছাইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে ব্যবসায়ীদের লোকেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ির নম্বর টুকিতেছে, লেবেল মারিতেছে। এইখানেই সমগ্র দ্বারমণ্ডল জংশনের কর্মশক্তির কেন্দ্র। মশলা খাদ্যবস্তু তেল ঘি চামড়া ধান চাল—নানা বস্তুর গন্ধ মিশিয়া একটা বিচিত্র গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে।

আশে পাশে রেললাইনের পূর্বদিকে সারি সারি মিলের ইয়ার্ড—চিমনি।

ন্যায়রত্ন অকস্মাৎ বলিলেন—আমি ভেবেছিলাম কবিরাজ—

—কি?

—যাক। বলে লাভ নেই। বিরোধ বোধ হয় মেটবার নয়। ন্যায়রত্ন ভাবিতেছিলেন জয়া ও অরুণার কথা।

দেবকী সেন বুঝিল—ন্যায়রত্ন হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কথা বলিতেছেন। সে বলিল—কখনও মিটতে পারে না। যতই চাপা দিক—একদিন এর মীমাংসা হতেই হবে। চোখে তাহার তীব্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।—ঘটনার চক্রান্তে যা অনিবার্য, তাকে নিবারণ করবে কে।

ন্যায়রত্ন ঠিক বুঝিলেন না দেবকী সেনের উক্তির অর্থ। কিন্তু কথাটি তাঁহার ভাল লাগিল। বলিলেন—ঠিক বলেছ কবিরাজ—ওই হল মহাসত্য। যা ঘটে তা কখনও নিষ্ফলা নয়। তার ফল অনিবার্য। বহুকাল আগে কবিরাজ—এই বিগ্রহ আমার পূর্বপুরুষ এই দ্বারমণ্ডল থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচনা করা স্তোত্র আমার বাড়িতে আছে। তাতে লিখেছেন অভিপ্রায় অনুযায়ী দেবতা আমার গৃহে এলেন। আবার যদি কোনদিন তাঁর এ গৃহ পরিত্যাগের অভিপ্রায় হয়—তবে যেন আর কোনো গৃহস্থ ধরে তাঁকে না দেওয়া হয়। ওই দ্বারমণ্ডলে—জয়তারার আশ্রমেই যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪

সে দিনের দ্বারমণ্ডলে ও বর্তমান দ্বারমণ্ডলে অনেক প্রভেদ।

কালের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—তাহাতে ওই বিগ্রহকে একদা যে সমারোহের সঙ্গে দ্বারমণ্ডল হইতে এ অঞ্চলের সমাজপতি মহাগ্রামের ঠাকুরবাড়িতে

লইয়া যাওয়া হইয়াছিল— সুদীর্ঘ কালের অন্তে নূতন কালে সেই সমারোহ করিয়া আজ আর তাঁহাকে জয়তারার আশ্রমে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইল না। সমারোহ দূরের কথা, তাহার শতাংশের একাংশও সম্ভবপর হইল না। দেবকী সেনের পরিকল্পনা ফলবতী হইল না। সেন ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া বলিল—এ জাতের কল্যাণ কখনও হবে না। ধ্বংস হবে—আপনি দেখবেন—এ জাতি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

ন্যায়রত্ন কিন্তু দুঃখ করিলেন না, স্বভাবগত মৃদু হাস্যরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

সেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন এবার বলিলেন কবিরাজ তোমার বয়স অল্প, তুমি এখনও পাথর হওনি।

সেনের মুখে তিক্ত হাসি দেখা দিল, বলিল—পাথর হয়েছি বৈকি। পাথর হয়েছি। সহ্য তো কম করিনি। বুকের ওপরে বাঁশ দিয়ে ডলেছিল—কনফেশনের জন্য। গুঁড়ো হওয়া দূরের কথা, ভাঙেনি। তারপর আন্দামানের কষ্ট। বেরিয়ে এলাম—এসে দেখলাম—আমার বোন—বিধবা বোন হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে নয়, জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়েছে মুসলমান গুণ্ডারা। সন্ধান পেলাম—পাঁচ-সাত জনে পাশবিক অত্যাচার করেছিল তার উপর। সারা রাত্রি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। পরের দিন সকালে জ্ঞান হয়ে কোনমতে ফিরেছিল—তারপর হল থানা-পুলিশ, তখন একদিন দল বেঁধে এসে তাকে নিয়ে কোথায় যে নিখোঁজ করে লুকিয়ে ফেললে—তার আর কোনো সন্ধান হল না। কংগ্রেস বলে—এরা গুণ্ডা, হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়; কিন্তু আমি জানি লীগ ওই গুণ্ডাদের মামলায় সাহায্য করেছে—প্রশ্রয় দিয়েছে। যাকগে সে কথা। আমি তো তাও সহ্য করেছি। পাথর বৈকি। তবে যে পাথরের বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের উৎস থাকে, গঙ্গা যমুনার সৃষ্টি হয়—সে পাথর আমি নয়; যে পাথরের বুকে আগুন জমা হয়ে থাকে—টগবগ করে ফোটে—ধাতু-গন্ধক-লাভা—আমি সেই পাথর।

ন্যায়রত্ন সস্নেহে সেনের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। বলিলেন—আগুনই জল হয় সেন। আমার ভিতরেও আগুন ছিল, আমি দেখেছি। আমার ছেলে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ল। আমি দেখলাম—আমার পৌত্র আমার আগুনের শিখাকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে—নির্ভয়ে চলে গেল—বলে গেল, মিথ্যে তোমার আগুন—মিথ্যে তোমার জ্বালা। অবাক হয়ে গেলাম। ভাল করে সন্ধান করলাম—কি করে সহ্য করলে বিশ্বনাথ আমার এই আগুনের জ্বালা। মহাকাল হেসে বললেন—মূঢ়, ওর আগুন যে তোর আগুনের চেয়েও অনেক বেশি তীব্র। আমি নিভে গেলাম কবিরাজ। জল হয়ে গেলাম। তবে তোমার আগুন এখনও সত্য—কালের শক্তি এখনও তোমার মধ্যে আছে, তুমি জ্বলছ—যতক্ষণ না অন্যকে ওই আগুনে জ্বালাবে ততক্ষণ তুমি জ্বলবে।

সেন বলিল—আমি বেঁচে আছি—আপনি মৃত ন্যায়রত্ন মশায়। রূঢ় মনে হলে কিছু মনে করবেন না।

—না—না। কিছু মনে করব না সেন। তুমি সত্যই বলেছ। বহ্নিই প্রাণ। সে আমি জানি। তবে সে বহ্নিকে যে নিজেই নিভিয়ে শীতল হতে পারে—সেই শান্ত।

সেন স্তব্ধ হইয়া গেল এইবার।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি উঠি সেন। কলের বাঁশী বাজতে শুরু হয়েছে। উষা সমাগমের আর বিলম্ব নাই।

সেকালের দ্বারমণ্ডল ও বর্তমান দ্বারমণ্ডলে—অনেক প্রভেদ।

সে কালের দ্বারমণ্ডল—ষাট সত্তর বছর পূর্বের দ্বারমণ্ডল ন্যায়রত্ন নিজে দেখিয়াছেন। দুই-তিন শত বৎসর পূর্বের দ্বারমণ্ডলের কাহিনীও তিনি জানেন।

দুই তিনশত বৎসর পূর্বে উষা সমাগমের মুহূর্ত হইতেই জয়তারা আশ্রমে প্রকাণ্ড বড় একটা ঘণ্টার ধ্বনি বাজিতে শুরু করিত।

ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং।

প্রথমে আশ্রমের গদীয়ান এবং সমাগত সন্ন্যাসীরা ঝুলানো ঘণ্টাটার দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন, সূর্যোদয়ের পরও কয়েক দণ্ড পর্যন্ত সেই বাজনা চলিত। জয়তারার আশ্রমে—স্থানীয় যাত্রী যাহারা যে যখন আসিতেন— একবার করিয়া ঐ ঘণ্টাটার দড়ি টানিয়া বাজাইতেন।

এখনও জয়তারার আশ্রমে ঘণ্টা বাজে। কিন্তু সে বড় ঘণ্টাটি ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন একটা ছোট ঘণ্টা আছে। সেটার বাজনা তেমন গুরুগম্ভীর নয়, শব্দ বেশিদূর যায় না। লোকের সমাগমও কম।

এখন দ্বারমণ্ডল জংশানে ভোর বাজি হইতেই দশ-বারোটা মিলে সিটি বাজিতে শুরু হয়। বোধ হয় আধ ঘণ্টা অন্তর বেলা ছয়টা পর্যন্ত বারকয়েকই একসঙ্গে বাজিয়া চলে। প্রত্যেক কলের সিটিরই আওয়াজ স্বতন্ত্র। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি— সপ্ত সুরের কোন-না-কোন সুরের সঙ্গে এক একটা সিটির সুর বাঁধা আছে। এক পর্দায় দুইটা সিটি বাজিলে—কোনটা খাদে বাজে কোনটা চড়ায় বাজে। প্রায় একসঙ্গে এই দশ বারোটা সিটি বাজিয়া উঠিয়া বিচিত্র সমবেত ভোঁ—এখানকার বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। বৃত্তাকারে এই শব্দ ছড়াইয়া চলে। শব্দ ছড়াইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। শব্দের ধর্মও তাই। মানুষকে জাগায়।

দ্বারমণ্ডলের মিলগুলির শ্রমিকেরা মিলের বাসিন্দা নয়। চারিপাশে তিন চার মাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতে তাহারা আসিয়া থাকে। মিলের কাজ শুরু হয় ছয়টায়। কিন্তু সিটি বাজিতে শুরু হয় ভোর চারিটা হইতে। আধঘণ্টা অন্তর বাজিয়া থাকে। সিটির শব্দে তাহাদের ঘুম ভাঙে। তাহারা সাজিয়া গুছাইয়া দূরত্ব অনুযায়ী সময় রাখিয়া রওনা হয় মিলের দিকে।

সেকালে, সকাল হইতেই দ্বারমণ্ডল বাজারের পণ্যসম্ভার গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া এ অঞ্চলের গ্রাম-গ্রামান্তরের হাট অভিমুখে রওনা হইত। দেশ দেশান্তরে মাল বেচিয়া—গ্রামের জন্য মাল কিনিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিত সন্ধ্যার সময়। বর্ষার সময় ময়ূরাক্ষী ভরিয়া উঠিলে—বন্দরঘাটে দেশান্তরের নৌকা আসিত। তখন দ্বারমণ্ডল বাজার কয়েক মাসের জন্য উঠিয়া আসিয়া বসিত এই ঘাটের উপর পতিত প্রান্তরে-মেলার মতো চালা ঘর সাজাইয়া বিকিকিনি করিত।

একালে ভোর হইতেই দ্বারমণ্ডলের চারিদিকের পথগুলি দ্বারমণ্ডলমুখী পণ্যভার বোঝাই গরুর চাকার শব্দে এবং ধুলায় মুখরিত ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। পায়েচলা পথ ধরিয়া ভার কাঁধে, ঝুড়ি মাথায়, মোট মাথায় মানুষের দল পিঁপড়ার সারির মত দ্বার-মণ্ডলে আসিয়া হাজির হয়। তাহাদের বিচিত্র হাঁকে দ্বারমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে।

তখনকার দ্বারমণ্ডলের পরিধি ছিল—চারিপাশে দুই তিন ক্রোশ। এখনকার পরিধি বিশ-পঁচিশ মাইল।

তখনকার দ্বারমণ্ডলের কর্মব্যস্ত সময় ছিল মাস কয়েক—মাত্র বর্ষার কয়েক মাস। এখন বারো মাসই কর্মব্যস্ত কাল। উদয়কাল হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত অবসর নাই, অবসর নাই।

ময়ূরাক্ষী পাহাড়ী নদী, মাত্র কয়েকমাস জল থাকে। রেলপথ বারো মাস উন্মুক্ত, গাড়ি চলিয়াছে তো চলিয়াছেই, চলিয়াছেই।

ভোরবেলাতেই সাইকেল ছুটিয়াছে। চারিদিকে খান তিরিশেক সাইকেল বাহির হইয়া চলিয়াছে। ন্যায়রত্ন যেদিন ভোরবেলায় নামিয়া ময়ূরাক্ষীর ঘাটে অজয়কে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, সেদিন সাইকেলগুলিকে ছুটিতে দেখেন নাই।

একজন সাইকেল আরোহী ন্যায়রত্নকে দেখিয়া থামিয়া পড়িল। সাইকেলখানিকে কোমরে ঠেকাইয়া রাখিয়া যথাসম্ভব হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—চানে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পারলাম না।

—আমি আজ্ঞে—তারাপদ পরামানিকের ছেলে।

—শিবকালীপুরের তারাপদ পরামানিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারাপদ? সে তো গত হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা আজ চার বছর হল মারা গিয়েছে।

—এত সকালে কোথায় এসেছিলে?

একটু হাসিয়া তারাপদর ছেলে বলিল—আসিনি কোথাও—যাচ্ছি। আমি এখন জংশনে থাকি কিনা। কলে কাজ করি।

— কলে কাজ কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়তে পারলাম না। কলে কাজ নিয়েছি। রবিবারে বাড়ি যাই। তারপরই সে সহযাত্রী সাইকেল আরোহীদের দিকে তাকাইয়া দেখিল—তাহারা অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া সে হাত জোড় করিয়া কহিল—তাহলে আমি এখন যাই আজ্ঞে।

এস। কিন্তু—

তারাপদর ছেলে তখন সাইকেলটা ধরিয়া প্যাডেলে পা দিয়াছে।—কিছু বলছেন?

—কোথায় যাবে?

—আজ্ঞে ধান চালের দর নিয়ে যাচ্ছি। গাঁয়ে যাচ্ছি।

কাছের গ্রামগুলিতে বিকি-কিনি শুরু হইবার পূর্বেই—দ্বারমণ্ডলে আজিকার

নির্ধারিত দর তাহারা বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

কালই হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে জংশনে সেখানকার দর আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

নিত্যই এইভাবে দর আসে এবং নিত্যই এইভাবে জংশন হইতে দর লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে লোক ছোটে।

ময়ূরাক্ষীর ঘাটে আসিয়া ন্যায়রত্ন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঘাটে আজ নামিবার উপায় নাই। নদীর জলধারার দুই পাশের বালুচরের উপর প্রায় শ-দুয়েক গরু এবং শ-দুয়েক ছাগল ভেড়া শুইয়া দাঁড়াইয়া জমিয়া বসিয়াছে। তাহাদিগকে আগলাইয়া পঁচিশ-তিরিশ জন পাইকার বিশ্রাম করিতেছে। ন্যায়রত্নের মনে পড়িল—আজ এখানকার বড় হাট। বৃহস্পতিবার সাধারণ হাটের সঙ্গে গো-হাটা বসিয়া থাকে। ন্যায়রত্ন আরও খানিকটা পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া ছোট একটা ঘাটে নামিলেন। ঘাটে নামিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

…এই ঘাটের নাম ছিল উদয়ঘাট।

…দি—এই ঘাটে তাঁহাদের গৃহ-দেবতা গোপীবল্লভ একদা আবির্ভূত হন। একখানা নৌকায় দুজন মাঝি ও ঘাটের উপর একটি মুসলমান প্রৌঢ়ার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। …আর ছিলেন গোপীবল্লভ। লোকে বলে ওই প্রৌঢ়া মুসলমান গোপীবল্লভকে কোন স্থান হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথে ওই ঘাটে প্রৌঢ়া রান্না করিয়া গোপীবল্লভকে সেই অন্ন নিবেদন করিতে গেলে গোপীবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রৌঢ়াকে এবং মাঝি দুইজনকে বধ করিয়া ঘাটে নামিয়া পড়েন। ওদিকে জয়তারা আশ্রমের সন্ন্যাসী সকালে আসিয়া গোপীবল্লভকে জয়তারা আশ্রমে লইয়া যান। দীর্ঘকাল এই ঘাটটির এ অঞ্চলে একটি পুণ্যময় স্নানঘাট রূপে খ্যাতি ছিল। গোপীবল্লভের উদয় তিথি—শ্রাবণ পূর্ণিমায় এখানে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসিত। কিন্তু কিছুকাল পরে এই অঞ্চলের মুসলমান গুরুর নেতৃত্বে এক শ্রাবণ পূর্ণিমায় মুসলমানেরা হানা দিয়া ঘাটে গো হত্যা করিয়া, বাজার লুঠ করিয়া ঘাট অপবিত্র করিয়া দিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি উদয়ঘাট পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর এখানে কেহ স্নান করে না।

ন্যায়রত্ন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

…প্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু তিনি জানেন। তাঁহারা পূর্বপুরুষ-রচিত গোপীবল্লভের উদয়মাহাত্ম্যের মধ্যে তাহা পাইয়াছেন।

এ অঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মগুরু যাঁহারা তাঁহারা একদা ছিলেন হিন্দুদের ধর্মগুরু। মুসলমানেরা আজ যেমন মনে করে হজরতের পাদস্পর্শে মৃত্তিকা পবিত্র হয়, স্পর্শে দেহের পা… …র যায়, দর্শনে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়—একদিন হিন্দুরাও ঠিক তাই মনে করিত। …বিত দেবতাশ্রিত বংশ, ভাবিত দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে মোক্ষ, আশীর্বাদে অদৃষ্টের চক্রান্ত …র্থ হয়। দেবজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশ। তাঁহাদেরই কুলদেবতা ছিলেন গোপীবল্লভ। অকস্মাৎ কি হইল কে জানে—ফৌজদার ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতিকারের জন্য গেলেন নবাব দরবারে। সেখান হইতে একদিন ফিরিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া। তাঁহার সঙ্গে এক রূপসী মুসলমান কন্যা—তাঁহার বধূ। আসিয়া প্রচার

করিলেন—ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার প্রতি আস্থাবান—যাহারা উদ্ধার চায়—তাহাদের তিনি আহ্বান জানাইলেন—এই শুদ্ধ সত্যধর্ম গ্রহণ কর। ফলে—কিছু ভক্ত তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিল। এখানকার কুসুমপুরের মুসলমানেরা তাহাদের অন্যতম। কিন্তু ব্রাহ্মণের মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। সমাজ তবু মানিল না। পুত্রের গৃহীত ধর্ম তাঁহার উপর আরোপ করিয়া দিল। বিধবা একদিন গোপীবল্লভকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় খরস্রোতা ময়ূরাক্ষীতে আসিলেন। জয়তারা আশ্রমের নাম শুনিয়াছিলেন। বন্দর ঘাটে আসিয়া নৌকার বহরের মধ্যে নৌকা বাঁধিতে সাহস করিলেন না। একটু দূরে আসিয়া এই ঘাটে নৌকা বাঁধিলেন। লোক পাঠাইলেন জয়তারা আশ্রমের সন্ন্যাসীর কাছে। 'গোপীবল্লভকে গ্রহণ করুন, অভাগিনীকে একটু আশ্রয় দিন।' কিন্তু গভীর রাত্রে নৌকায় ডাকাতি হইয়া গেল। মাঝি দুইজনকে এবং প্রৌঢ়াকে হত্যা করিয়া বিগ্রহের অলঙ্কার—প্রৌঢ়ার সম্বল অপহরণ করিয়া বিগ্রহ ফেলিয়া দিয়া ডাকাতেরা চলিয়া গেল। তিনটি প্রাণীকে নিঃশব্দে হত্যা করা কঠিন কাজ ছিল না। প্রভাতে সন্ন্যাসী আসিয়া বিগ্রহ লইয়া গেলেন। গোপন রাখিলেন প্রৌঢ়ার পরিচয়। প্রবাদ কিন্তু প্রচার হইয়া গেল মুখে-মুখে। প্রতাপান্বিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী গুরুও প্রকাশ করিলেন না কোন কথা। কিন্তু মাতৃহত্যার এই ক্ষোভ তাঁহার অন্তরে অন্তরে গাঁথা হইয়া রহিল। তিনি শক্তি সঞ্চয়ে মন দিলেন। তারপর একদিন ওই উদয় তিথিতেই আসিয়া এই ঘাট অপবিত্র করিয়া বাজার লুঠ করিয়া বহু নরহত্যা করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য, জয়তারার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না। এই ঘটনার পর তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে এক বৃদ্ধ একদিন আসিয়া জয়তারা আশ্রমের প্রান্তভাগে কুটীর বাঁধিল। একদিন রাত্রে ফকির আসিল এই মাহাত্ম্য রচনাকারীর কাছে। নিজের পরিচয় দিয়া কহিল—আমার দেহ জীর্ণ হইয়াছে। এ দেহের প্রতি মমতাও নাই। মমতা আছে শুধু গোপীবল্লভের উপর। না হইলে ওই বিগ্রহকে ভাঙিয়া ময়ূরাক্ষীর জলে বিসর্জন দিতাম। আপনি গোপীবল্লভকে লইয়া আসিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করুন। জয়তারার আশ্রম কপালিনীর আশ্রম—ওখানে গোপীবল্লভের পরিচর্যা ঠিক হয় না। যশোদার স্নেহ—রাধিকার প্রেম, রাখাল সখার সোহাগ এ নহিলে গোপীবল্লভ পরিতৃপ্ত হন না। জয়তারা আশ্রমের সন্ন্যাসী আমার পরিচয় জানেন, তাঁহার সঙ্গে আমার কথা হইয়াছে। তিনি সম্মত আছেন, গোপীবল্লভকে লইয়া আসুন।

মহাগ্রামের ঠাকুরবংশের গৃহে আজ গোপীবল্লভ আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। যদি কোনদিন আমার বংশ অবিশ্বাসী হয়—অক্ষম হয়—তবে আমার গোপীবল্লভ আবার ফিরিয়া অধিষ্ঠিত হইবেন ওই জয়তারার আশ্রমে।

এই সেই উদয় ঘাট।

এ ঘাটে কেউ স্নান করে না।

ন্যায়রত্ন সেই ঘাটেই নামিলেন। ঘাটের পাশেই একটা দহ—জংশন স্টেশনের পাইপ আসিয়া এই দহে নামিয়াছে। পাড়ের উপর একটা শেড। শেডের মধ্যে একটা পাম্প

বসান আছে। স্টিমের শব্দ তুলিয়া পাম্পটা চলিতেছে।

ঘাটে নামিয়া স্নান করিতে করিতে ন্যায়রত্ন চোখের জল ফেলিলেন প্রৌঢ়ার উদ্দেশ্যে, ফকিরের উদ্দেশ্যে।

স্নান সারিয়া উঠিলেন।

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া সূর্য প্রণাম করিতে গিয়া প্রণাম করা হইল না—একটা বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়িয়া গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য অবাক হইয়া রহিলেন।

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসিতেছে গ্রামান্তর হইতে। কলরব করিয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে—জংশন দ্বারমণ্ডলের দিকে। জংশন দ্বারমণ্ডলের মিলের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মণ শস্যকণা ছড়ানো রহিয়াছে।

নিচে চোখ নামাইলেন। মাঠের পথে পিঁপড়ার সারির মতো মানুষের সারি।

কলের ভোঁ বাজিতেছে।

পিছনে ন্যায়রত্ন জংশনের দিকে চাহিলেন।

আকাশমুখী সারি সারি চিমনি। ধোঁয়া উঠিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো। কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বিপুল বলশালী বিরাটকায় জংশন দ্বারমণ্ডল— গতিশীল পৃথিবীতে রুগ্ন জীর্ণ প্রাচীন গ্রামমণ্ডলীকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। দিগন্ত হইতে মানুষের দল ছুটিয়া আসিতেছে। দিগন্তরে বার্তা বহন করিয়া জংশনের দূত ছুটিয়াছে। প্রচণ্ড মন্থর ওই যে ঘর্ঘর শব্দ কয়েকদণ্ড পরেই প্রবলবেগে চলিতে শুরু করিবে, ইহার মধ্যে তাঁহার মতো বৃদ্ধ এবং গোপীবল্লভের পুরানো কথা লইয়া আবেগ প্রকাশের এখানে অবসর কোথায়? এই তো কাল মহাকাল। দেবকী সেন—তুমি মিথ্যা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ। স্নান সারিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

কে আসিতেছে?

দেবু পণ্ডিত? হ্যাঁ দেবু পণ্ডিতই বটে। সঙ্গে অনেকগুলি লোক!

দেবুকে দেখিয়া ন্যায়রত্নের বড় ভাল লাগিল।

একটি দল লোকের মাঝখানে থাকিয়া আগে আগে আসিতেছে। সম্মুখে চলমান জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুতে যে থাকে সে এমনিভাবে মাঝখানে থাকিয়াও সবাগ্রে চলে। যে মুহূর্তে দলটি থামিবে— সেই মুহূর্তেই তাহাকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। অনেক আগের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আলোচনা প্রসঙ্গে পৌত্র বিশ্বনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল— 'এখানে কাজ করবে দেবু।'

বলিয়াছিল—আমার কর্মক্ষেত্র হবে গোটা দেশ, আপনাদের আমলের পল্লীজীবনের সে লক্ষ্মণের গণ্ডী ভেঙে গেছে দাদু—আপনাদের পল্লীলক্ষ্মী রাবণের সোনার হরিণের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছে। তাকিয়ে দেখুন জংশন শহরের বাজারের মনিহারির দোকানগুলোর দিকে। সীতা হরণের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে—দশমুণ্ড রাবণ এবার ওই ইঞ্জিনেটানা মালগাড়ির পুষ্পকরথে চলছেন। রাবণ বধও হবে, রাক্ষসী মায়া-শক্তি সবই ধ্বংস হবে। কিন্তু তবু পঞ্চবটীর শান্ত আশ্রমের মতো সে শান্ত পল্লীকে আর ফিরে পাবেন

না। পল্লীর রূপ পাল্টাবেই। পৃথিবী আজ ছোট হয়ে এসেছে, আপনার পঞ্চগ্রাম ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চাইলেও দেশদেশান্তর ছুটে এসে জঙ্গল কেটে এই পঞ্চগ্রামকে টেনে বের করে বিশ্বের গতির সঙ্গে বেঁধে দেবে। আর মেঠো পথে নয়—রেলপথে ছুটতে হবে—আকাশ পথে ছুটতে হবে। আমি আপনার মতো দীপ্তিমান মহামহোপাধ্যায়ের পৌত্র। আজ আমাকে আমার উপযুক্ত স্থান নিতে হলে সমগ্র দেশের কেন্দ্রে গিয়ে নিতে হবে। এখানকার কাজ করবে দেবু, দেবুর সঙ্গে আরও লোক ক্রমশ আসবে। আসবে ওই দেবুদের সমাজ থেকে, আসবে আরও নিচে যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে। আপনার চোখে পড়েছে কিনা জানি না—না পড়ে থাকলে একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবেন—ওরা উঠতে শুরু করেছে। প্রাণের বীজ তাদের ফেটেছে, তার চাড়ে আপনাদের সমাজের পাথরের আঙিনার বুকেও ফাট ধরেছে।

বিশ্বনাথের ভবিষ্যদর্শন ধীরে ধীরে সত্য হইয়া উঠিতেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন ভাবাবেগে উদাস হইয়া পড়িলেন। সীতা হরণ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারা পল্লীঅঞ্চল আজ লক্ষ্মীহীন। জংশন শহর দিনে দিনে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। দ্রুত তাহার কর্মপ্রবাহ—ট্রেনে—মোটরে—সাইকেলে—গতির সৃষ্টি করিয়া মানুষের চলিবার শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পঞ্চগ্রামের প্রান্তের ময়ূরাক্ষী, ময়ূরাক্ষীর কোলের বন্যা-রোধী বাঁধ জংশন শহরের গতিরোধ করিতে পারে নাই। দেশ-দেশান্তরের সঙ্গে দ্রুত ধাবমান জংশন শহর পঞ্চগ্রামের মুখে দড়ি পরাইয়া কঠিন মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দেবু ঘোষ আজ এখানকার অন্যতম নেতা। জংশনের জনতার একটা অংশের বিধানদাতা, কর্মদাতা—নূতন কালে তাহার অভিধা হইয়াছে নেতা। দেবুর যোগ্যতা বাড়িয়াছে। নিঃসন্দেহে সে এখন এ নেতৃত্বে অধিকারী। অভূতপূর্ব পরিবর্তন। বহু আঘাতের গভীরতম বেদনা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ন্যায়রত্ন যে অচঞ্চল দ্রষ্টার চিত্ত ও মানসিকতার অধিকারী হইয়াছেন—সে চিত্ত এবং মনও মধ্যে মধ্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ে। আনন্দ ও বেদনা দুই-ই সে বিস্ময়ের মধ্যে আছে। নামহীন পরিচয়হীন এক চারাগাছ বাড়ির আঙিনার এক কোণে অযত্নের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া অকস্মাৎ বর্ণে গন্ধে বিচিত্র ফুল ফুটাইলে যেমন আনন্দ হয়—তেমনি আনন্দ অনুভব করেন। আবার বেদনাও হয়। পঞ্চগ্রাম পরিত্যাগের সময় যে দেবুকে তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, সে দেবুকে আজ আর খুঁজিয়া পান না। সে দেবু আজ হারাইয়া গিয়াছে। তাই মধ্যে মধ্যে সংশয় হয়, যে নামহীন চারাগাছটিকে তিনি এক অঙ্গন-কোণে অঙ্কুরিত হইতে, বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন—এ গাছটি আসলে সে গাছই নয়। কখন কে গাছটির গোড়াটুকু রাখিয়া মাথা কাটিয়া নামে গোত্রে বিখ্যাত কোন ফুলের গাছের ডাল কাটিয়া জোড় কলম বাঁধিয়া এমন ফুল ফুটানো সম্ভবপর করিয়াছে. এ দেবু তাহার জ্ঞাতি স্বজন গ্রামবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু পৃথকই নয়—তাহাদের সহিত তাহার আত্মীয়তাও ঘুচিয়া গিয়াছে।

পরিবর্তনের মধ্যেই জগৎ চিরনবীন—জীবনপ্রবাহ গতির মধ্যেই বাঁচিয়া আছে।

সব মানুষই পাল্টায়, দেবুও পাল্টাইয়াছে। বিস্ময় সেখানে নয়। বিস্ময়—দেবু পঞ্চগ্রামের জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গেল, স্বাদ' বর্ণ গুণ সবই পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই জংশন শহরে তাহাকে আজ মানাইয়াছে ঠিক। পঞ্চগ্রামের জীবনপ্রবাহ ছিল—সমতলের হ্রদ হইতে নির্গত জলপ্রবাহের মতো। দেবুর জীবন—পাহাড় হইতে ঝরিয়া পড়া জলপ্রবাহের রূপ লইয়াছে—জংশনের পটভূমিতে সুন্দর এবং শোভন। এখানে আসিয়াছে সে স্বাভাবিক গতিতে। গ্রাম হইতে নগরে আসার একটা গতিধর্ম আছে, গুণধর্ম আছে। গ্রাম ঠেলিয়া দেয়—নগর আকর্ষণ করে। তিনকড়ির বিধবা কন্যা স্বর্ণকে বিবাহ করিয়া দেবুর আর পঞ্চগ্রামের সমাজে স্থান ছিল না। যুগ-যুগান্তর হইতে সমাজকে লঙ্ঘন করিয়া মানুষ এমনিভাবে নগরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। গুণধর্মে যে মানুষ যখনই বড় হইয়াছে—তখনই নগর তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। গুণী দেবুকে আজ জংশন আপন প্রয়োজনে আকর্ষণ করিয়া সমাদর করিয়া স্থান দিয়াছে। এ পর্যন্তও বিস্ময়ের কিছু নাই। বিস্ময় বোধহয় একস্থানে—এই দেবুর মধ্যে আগেকার কালের দেবুর কোন চিহ্ন, কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এটা রূপান্তর নয়—এ যেন জন্মান্তর। তাই পঞ্চগ্রামের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। নাইলে তিনিও তো আজ দেবুর মতোই পঞ্চগ্রামের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া জংশন শহরের প্রান্তে জয়তারার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছেন। অরুণার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করার অপরাধ পঞ্চগ্রাম ক্ষমা করে নাই, সহ্য করে নাই।

ওদিকে সূর্য ময়ূরাক্ষীর তীরের বনসন্নিবেশের মাথা ছাপাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ন্যায়রত্নের চোখে রোদের ছটা বাজিতেই তিনি সময় সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিলেন। প্রণাম সারিয়া অগ্রসর হইলেন জয়তারার আশ্রমের দিকে।

* * *

দেবু ন্যায়রত্নকে দেখে নাই এমন নয়, দেখিয়াছিল—কিন্তু আজ তাহার কাজ অনেক। শুধু তাই নয়—ঠাকুরমহাশয় সম্পর্কে আগেকার কালের সে মধুর মনোভাবটুকু আর তাহার নাই। সমস্যায় ঠাকুরমহাশয়ের উপদেশ আজ আর তাহাকে পথের সন্ধান দেয় না। সমস্যাগুলি আজ আর তাহার কাছে একমাত্র ধর্মতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, জীবন এবং জীবন-সমস্যা তাহার কাছে আজ আরও অনেক জটিল। ঠাকুর মহাশয় সেসব তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এই কারণেই দেবু ইচ্ছা করিয়াই ন্যায়রত্নকে এড়াইয়া গেল।

আজিকার প্রাতঃকালের এই জটলা হাটের সমস্যা লইয়া। হাটের সমস্যার পর আছে এখানকার মিলে ও আড়তে ধান বিক্রেতা চাষীদের সমস্যা। তাহার পর আছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা—কংগ্রেসের মধ্যে দলে দলে বিরোধের সমস্যা।

হাটে কিছুদিন হইতেই একটা গোলমাল চলিতেছে। হাট জমিদারের। কঙ্কণার বাবুরা জমিদার। হাটের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই দুই দফা করিয়া তোলার ব্যবস্থা আছে; এক দফা তোলা জমিদারের সরকার তুলিয়া থাকে, অন্য দফা লইয়া থাকেন জয়তারা

আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সেবায়েত। তরকারীর হাটে তরকারী লওয়া হয়—অন্যান্য জিনিসের কারবারীরা পয়সা দিয়া থাকে। যাহার যেমন কারবার সে তেমনি দিয়া থাকে। হঠাৎ জমিদার তরকারীর তোলা তুলিয়া দিয়া নগদ পয়সা খাজনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কারবারীদের পয়সার হার বাড়াইয়া দিয়াছেন। দুই পয়সা, চার পয়সার স্থলে চার পয়সা দুই আনা ধার্য করিয়াছেন। কাপড় গামছা, মনিহারী, খাবারের দোকানদারেরাই এই চার পয়সা দুই আনা খাজনার আওতায় পড়িয়াছে। তরিতরকারী বিক্রেতাদের খাজনা ধার্য হইয়াছে—এক পয়সা হইতে চার পয়সা, যে যেমন কারবারী। এই সব সাধারণ পণ্য ছাড়াও এখানকার হাটে আজকাল আরও অনেক রকম জিনিসপত্র আসিতে শুরু করিয়াছে। শিবকালীপুরের গিরিশ ছুতার লইয়া আসে কিছু কিছু কাঠের আসবাব, ছোট ছোট জলচৌকি, লক্ষ্মীর সিংহাসন, পিঁড়ি, দীপ-গাছা অর্থাৎ কাঠের আসবাব। পলকা দেবদারু কাঠেরটে, বাবকোষ,মুড়ির চাল ভাজিবার কাঠের হাতা, দুই একখানা সস্তা কাঠের চেয়ার টেবিলও থাকে। তামাকওয়ালা আসে, লোহার জিনিসপত্র লইয়া জনা দুই হিন্দুস্থানী কামারও বসিতে শুরু করিয়াছে; মুরগী হাঁসেরও আমদানী হয়। কখনও কখনও দুমকা অঞ্চল হইতে শালকাঠের গুঁড়ি এবং গরুর গাড়ির ধুরো বা লিখ লইয়া গাড়ি আসিয়া জমে। শালপাতা বোঝাই গাড়িও আসে প্রচুর। ইহাদের সঙ্গে ধান-চালের কারবারীরা টাকা পয়সার থলি লইয়া সারিবন্দী বসিয়া থাকে, আশপাশের পল্লীর লোকেরা গামছায় বাঁধিয়া চাল লইয়া আসে—বিক্রী করিয়া সেই পয়সায় হাট করিয়া ফিরিয়া যায়। এখানে জমিদার খাজনার হার করিয়াছেন—দুই আনা হইতে আট আনা পর্যন্ত। খাজনার হার ডবলেরও বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। এই লইয়া একটা জটলা আগে হইতেই চলিতেছিল। মধ্যে কয়দিন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ লইয়া চাপা ছিল। আজ হাটবার ভোর হইতেই জটলাটা নূতন করিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। নূতন করিয়া ভোরবেলাতেই দেবু নিজেই উঠিয়া গিরীশ ছুতারের গাড়ির কারখানায় আসিয়া কয়েক জনকে ডাকিয়া স্থগিত আলোচনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

—ব্যাপারটাকে তোমরা এই ভাবে ধামাচাপা দেবে গিরীশ?

গিরীশ প্রমুখ ব্যবসায়ীরা ব্যাপারটাকে মানিয়া লইতে চায় না। কিন্তু হাঙ্গামা করে কে? এই কারণেই কথাটা তুলিতেই চায় নাই। দেবু কয়েকদিন আগে থাকিতেই কথাটা পাড়িয়াছে। আজ গিরীশকে খোঁচা দিয়া বলিল—ছি-ছি-ছি। তোমরা এ সব ধুয়ো তোল কেন? আমাকে জড়াও কেন।

গিরীশ বলিল—বস ভাই মাস্টার, বস।

—না, বসব না। কাজের কথা বলতে এসেছিলাম। বলে চলে যাচ্ছি। আর তোমাদের কোন ব্যাপারে আমি থাকব না।

গিরীশ হাসিল। বলিল—রাগ করো না। বস, চা খাও।

—না। কি বলছ, বল?

—বলব আর কি? তোমার তো এতে কোন স্বার্থ নাই। আমাদেরই ভালোর

জন্য বলছ, তা ডাকছি সকলকে। কিন্তু আসল লোক তো চলে গেলেন—তার কি?

—একজন গেছেন, একজন আছেন। স্বর্ণ রয়েছে, সে সবতাতেই রাজী আছে।

—স্বর্ণ আছে, কিন্তু তিনি থাকলেই ভাল হত।

অর্থাৎ অরুণা।

কথাটা বলিবার হেতু আছে। হাটের খাজনার হার লইয়া গণ্ডগোল সৃষ্টির মূলে ছিল অরুণা। একটা ছোট ঘটনা। অরুণা এবং স্বর্ণ এখানে বয়স্কা মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার একটা আন্দোলন করিয়াছিল। আন্দোলনটির উদ্দেশ্য কতখানি রাজনৈতিক, কতখানি মানবসেবামূলক সে কথা বলা কঠিন। তবে দুই-ই আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অরুণা এবং স্বর্ণ প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাহাদের জীবনের কর্মে ভাবনায় রাজনৈতিক ভাববাদ নদীর জলধারায় নদীগর্ভের মৃত্তিকার উপাদানের মতো মিশিয়া অবিচ্ছেদ্য হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক দলের গোপন আর্থিক সাহায্যও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। এই আন্দোলনের উপর পুলিশের নজরও পড়িয়াছিল। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র ঘরের মেয়েরা সাড়া দেয় নাই। বলিয়াছিল—কি হবে? তার চেয়ে যদি একটু-আধটু নাচ গান শেখাও মেয়েদের তবে বরং কাজে লাগে। আজকাল আবার নাচ-গান না জানলে বিয়ে হচ্ছে না। সেই কারণেই লেখাপড়ার দিকটা গৌণ করিয়া সেলাই কাটাইয়ের এবং বোনার কাজকে মুখ্য করিয়া আন্দোলনের চেহারাটা পালটাইয়া দেয়। ইহাতে ফলও ফলিয়াছে। মেয়েরা অনেকে এ কাজে ঝুঁকিয়াছে। ক্রমে সেলাই-কাটাই-বোনার কাজের সঙ্গে চামড়ার মানিব্যাগ তৈয়ারির কাজও প্রবর্তিত করিয়াছে। ক্রমে এই সব হাতের কাজ বিক্রি লইয়া একটা সমস্যা দাঁড়াইল—হাটে একটা দোকান খুলিবার কল্পনা হয়। কিন্তু তাহাতেও সমস্যা দাঁড়ায় হাটে বসিয়া বিক্রি করিবে কে? ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলার মতো স্বর্ণের ভাই গৌর আছে, কিন্তু সে ছাপমারা কংগ্রেসী, শুধু তাই নয়—এ জেলার ষড়যন্ত্র মামলার দাগুত আসামী। তাহার সঙ্গে প্রকাশ্য সংশ্রব রাখা চলিবে না। দেবু সমস্যার সমাধান করিয়াছিল মাটির পুতুলের কারিগর নবীন ওরফে নেলোকে দিয়া। নেলো পুতুল গড়িয়া শিবকালীপুরেই বিক্রি করিত, মহাগ্রামের হাটেও যাইত। কিন্তু জংশনে আসিত না। দেবু নেলোকে অনেক বুঝাইয়া রাজী করিয়াছিল—মাটির পুতুল এবং মেয়েদের সংঘের হাতের কাজ লইয়া দোকান খোলার ব্যবস্থা হইল। মধ্যে মধ্যে অরুণা ও স্বর্ণও গিয়া দাঁড়াইত। দোকানটা জমিয়াও উঠিতেছিল। মনিব্যাগ, ছেলেদের জামা এবং নেলোর পুতুলের চাহিদাই বেশি। নেলো উৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন পুতুল তৈয়ারি করিতেছিল। হঠাৎ নেলোর পুতুল লইয়া গোল বাঁধিল। সেদিন নেলো একটা 'ঘাড়-দোলানো বুড়া' পুতুল তৈয়ারি করিয়া আনিয়াছিল। তেমুণ্ডে বুড়া উপুড় হইয়া বসিয়া হাতে হুঁকা ধরিয়া আছে, তুলার চুল-দাড়ি-গোঁফ সমেত মাথাটা ঘাড় হইতে দুলিতেছে—যেন তামাক টানিয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। পুতুলটাকে সামনে বসাইয়া দিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া দিতেই দোকানের সামনে ভিড় জমিয়া গেল। হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া জমিদারের সরকার পাইক একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া

উপস্থিত হইল। ছেলেটি কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির ছেলে। দূর হইতে পুতুলটি দেখিয়া ওটির জন্য ঝোঁক ধরিয়াছে। সরকার আসিয়া পুতুলটি তুলিয়া বলিল—কত দাম রে ?

পুতুলটি বেশ বড়। নেলো দাম স্থির করিয়া রাখিয়াছিল—চার আনা। কিন্তু পুতুলটির প্রতি অত লোকের লোলুপ দৃষ্টি দেখিয়া এবং ওই দামী পোশাক পরা বাবুদের ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া বলিয়া বসিল—আট আনা।

সরকার ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—আট আনা ? সোনার না মাটির ?

নেলো লজ্জিত হইয়া বলিল—মাটিরই বটে, তবে খাটুনি বুঝুন মশায় ! তা ছাড়া—।

তা ছাড়া।

—বাবুরা যদি দাম না দেবে তো কে দেবে বলুন।

—হুঁ, এ কার ছেলে জানিস ? ছোটবাবুর, ব্যারিস্টারবাবুর—বলিয়া একটি দু-আনি ফেলিয়া পুতুলটিকে উঠাইয়া লইয়া গেল।

দোকানের পিছন হইতে হঠাৎ একটা আর্তনাদ আসিয়া পড়িল—এবং নারী কণ্ঠে কে বলিল—এই নাও আট আনা। আমি নিলাম ওটা।

নাওটা করিল অরুণা। মুহূর্তে সরকারের প্রসারিত হাতখানা গুটাইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই হাতখানা আবার প্রসারিত হইল। সরকার এবার পুতুলটাকে তুলিয়া লইয়া বলিল—এটা জমিদারের তোলা হিসাবে নিলাম। এবার বাঁ হাতখানা বাড়াইয়া ছুঁড়িয়া দেওয়া দু-আনিটা তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

নেলোর মনে ভাবের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কঙ্কণার বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টারবাবুর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতেই তাহার মনে দামের প্রশ্নটা ছোট হইয়া গিয়াছিল। ব্যারিস্টারবাবুর ছেলে কলিকাতায় থাকে। কত বিচিত্র পুতুল সে দেখিয়াছে, তবু এই পুতুলটি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা অধিক গৌরব আর কি হইতে পারে। সে ভাবিতেছিল পুতুলটাকে খোকাবাবুর হাতে দিয়া বলে—এটা আপনি নিয়ে যান খোকাবাবুর। দাম চাই না আমার ! ঠিক এই মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না কি বলিবে।

তাহাকে কিছু বলিতে হইল না, বলিল অরুণা। অরুণা বলিল—তোলা হিসেবে নেবেন ?

—হ্যাঁ। বেগুনের দোকানে বেগুন, মুলোর দোকানে মুলো তোলা নেওয়া হয়—পুতুলের দোকানে—

কথা শেষ করিবার পূর্বেই অরুণা পাশের কাপড়ের দোকান হইতে একখানা দামী তাঁতের কাপড় তুলিয়া বলিল—এর দোকানের তোলাটা তা হলে ধরুন। নিন।

কথার তর্ক তুলিয়া ব্যাপারটা এত শীঘ্র অমন জমাইয়া তোলা যাইত না। কাপড়ের দোকানী—হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। শুধু কাপড়ের দোকানীই নয়—অন্য সব দোকানদারেরা মুহূর্তে দল বাঁধিয়া গেল। কে একজন বলিল—চালাকী না কি ?

সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলিয়া উঠিল—ও সব চলবে না !

সরকার ধীরে ধীরে পুতুলটি নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ছেলেটি হতভম্ব হইয়া

গিয়াছিল। কান্নাকাটি দূরে থাক একটা কথাও বেচারা বলিতে পারিল না। শুধু বিচিত্র দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

ঠিক পনের মিনিট পরে হাটের মধ্যে একটা ঢেঁড়া বাজিয়া উঠিল।—আগামী হাট থেকে নতুন করে খাজনা ধার্য হবে। সেই হারে খাজনা না দিলে হাটে কাউকে বসতে দেওয়া হবে না।

ঘোষণা হইয়া গেল।

*　　　　*　　　　*

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে কংগেসের তরফ হইতে দেবু গ্রহণ করিল। কিছুদিন হইতে জীবনটা যেন স্তিমিত হইয়া পড়িতেছিল। কোথাও কোন উত্তেজনা নাই, জীবনে কোথাও সংঘর্ষ নাই। শীতের ময়বাক্ষীর শীর্ণ স্রোতের মত জীবন চলিয়াছিল। সে দিক দিয়াও দেবুদের দল সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সামনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেকশন আসিতেছে—জেলা কংগ্রেস ইলেকশনে প্রতিযোগিতা করিবে, অথচ কোন দিক দিয়া সাধারণ মানুষকে উত্তেজনার প্রভাবে প্রভাবিত করিবার পথ নাই দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ সুযোগ আসিয়া গেল।

দেবু হাটের ব্যাপারীদের লইয়া মিটিং করিয়া ফেলিল। সেই সুযোগে আরও একটি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইল। এখানে ধান-কলের মালিকেরা, ধান-চালের ব্যবসায়ীরা ধান কিনিবার সময় 'চলতা' বলিয়া মণ করা এক সের হইতে আড়াই সের পর্যন্ত একটা বাড়তি অঙ্কে ধান লইয়া থাকে এবং দাম দিবার সময় 'ঈশ্বরবৃত্তি' বলিয়া টাকায় দুই পয়সা হিসাবে কাটিয়া লয়। দেবু হাটের ব্যাপার লইয়া বক্তৃতা দিতে দিতে ওই কথাটাও পাড়িয়া বসিল। ফলও হইল। একটা মিটিংয়েই হাটের ব্যাপারী এবং গ্রাম্য চাষীদের দুইটি দল বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিল।

দুইটা ব্যাপার লইয়াই বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেছিল। দেবু প্রভৃতির উৎসাহের সীমা ছিল না। জংশনে হাটের ব্যাপার এবং গ্রামে গামে চাষীদের লইয়া চলতা এবং ঈশ্বরবৃত্তির ব্যাপার লইয়া মিটিংয়ের পর মিটিং করিয়া চলিয়াছিল। ইহারই মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল জগদীবা আশ্রম ও মখদমশাহের দরগা লইয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। সঙ্গে সঙ্গে সব চাপা পড়িয়া গেল। একটা পাহাড়ী বন্যা আসিয়া যেন স্থানীয় বর্ষণে স্বল্পস্ফীত নদীর জলকে বাধা দিয়া ইচ্ছামত খাতে পরিচালিত করিয়া লইয়া চলিল।

যাই হোক সে বন্যা চলিয়া গিয়াছে। দেবু আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—ব্যাপারটাকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এখানে হাটের ব্যাপারী সমিতি নাম দিয়া একটা সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। তাহার সম্পাদক গিরীশ সূত্রধর, সেই কারণেই দেবু গিরীশের কাছে আসিয়াছে। গিরীশ অরুণার কথা তুলিল, অরুণাই এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিয়াছিল এবং মহিলা সমিতির স্টলের কর্ত্রী হিসাবে সেই হইয়াছিল ব্যাপারী সমিতির সভানেত্রী।

দেবু বলিল, তিনি তো এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কথা বাদ

দিতে হবে। তা ছাড়া স্টল তো তাঁর নিজের নয়। মহিলা সমিতির স্টল। মহিলা সমিতি তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে বসাবে। তোমরাও তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে সভাপতি কর। তোমরা যদি রাজী থাক—তবে আমি ফলওয়ালা আসান খাঁ পেশোয়ারীকে বলতে পারি। আসান খাঁ কাজের লোক, শক্ত লোক।

ইতিমধ্যে কয়েকজন জুটিয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আসান খাঁ!

—হ্যাঁ। আসান খাঁ। দোষ কি হল তাতে?

—দোষ কিছু নাই মাস্টার—তবে—।

—কি তবে?

তবে আসান খাঁই হয়তো রাজী হবে না। রাজী হলে আর এক ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

—আবার কি ফ্যাসাদ?

—মুসলমান ব্যাপারীরা ধুয়ো তুলেছে জয়তারার নামে যে তোলা ওঠে—সে তোলা তারা দেবে না। দিতে হলে ওই তোলাকে দু ভাগ করতে হবে। একভাগ যাবে জয়তারার স্থানে, একভাগ দিতে হবে পীর সাহেবের দরগায়। তার চেয়ে আমাদের ওসব হাঙ্গামা না করাই ভাল। বুঝেচ না! জমিদার বেশি খাজনা দাবী করছে—কিছু দিয়ে মিটমাট করে নোব। তবে ভাই—।

কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল গিরীশ।—রাগ করবে না তো?

দেবু গিরীশের মুখের দিকে চাহিল। কি বলিবে গিরীশ না জানিলেও সে যে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে তাহা সে বুঝিয়াছে। মুহূর্তের জন্য ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল তাহার। পর মুহূর্তেই সে কুঞ্চন মিলাইয়া গেল, প্রসন্ন মুখে হাসিয়া বলিল—না—না—রাগ করব কেন? বল, কি বলছ?

—কাজটি ভাই উচিত হযনি।

—কোন কাজ, বল?

—ছেলের হাত থেকে পুতুলটি কেড়ে নেওয়া।

—ছেলের হাত থেকে তো পুতুল কেড়ে নেয়নি কেউ?

—ঠিক হাত থেকে না নিলেও ছেলের দৃষ্টি যে পুতুলের উপর পড়েছে—সে পুতুলটিকে মায়ের জাত হয়ে এমন করে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কাজ তিনি ভাল করেন নি। বুঝেচ না? ছেলে-পুলে হযনি—তাই পেরেছিল তোমাদের মাস্টারনী—মা হলে পারত না।

দেবু একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—ছেলেটি যদি গরীবের ছেলে হত গিরীশ, তবে আমি তোমার কথাটা মানতাম। ও ছেলেটি বড় লোকের ছেলে। বাপ জমিদার—ব্যারিস্টার, মামারাও বড়লোক ব্যবসাদার। ও ছেলে দিন বোধ হয় পাঁচটা টাকার খেলনা হাতে পায়। তার অর্ধেক ভাঙে, কিছু হারায়, কিছু ফেলে দেয়। তুমি বোধ হয় জান না, ঘটনার দিন এখান থেকে আট আনা বেশি দাম বলে পুতুলটাকে ফেলে

দিয়ে গিয়ে হাজী সাহেবের মনিহারীর দোকানে নগদ দশ টাকার খেলনা কিনে নিয়ে গিয়েছে ওই বাচ্চা।

গিরীশ ঘাড় নাড়িল। বলিল—সে তুমি যাই বল ভাই। বুঝেচ না মাস্টার। ও মানতে পারলাম না। ছেলে সে ছেলেই। বড় লোকই হোক, আর গরীব লোকই হোক। শিশুর জাত নাই।

দেবু হাসিয়া বলিল—একটি মুসলমানের শিশুকে যদি পড়ে থাকতে দেখ ভাই, তুমি তাকে তুলে নিতে পার? মানুষ করতে পার?

গিরীশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পারা উচিত মাস্টার। পারি না-পারি সে কথা আলাদা। না পারলে তোমার সঙ্গে একরকম এক হয়ে গেলাম আর কি! তুমি বড়লোকের ছেলেকে আলাদা জাত করছ, আমি মুসলমানের ছেলেকে আলাদা জাত করছি।

দেবু এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। উত্তর তাহার আছে। কিন্তু সে থাক। ইহাদের সে কথা মাথায় ঢুকিবে না। অতীত কালের বিশ্বাসকে হৃদয়াবেগের শক্তি দিয়া যাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে—তাহারা এমনি ভাবেই ইতিহাসের পাপচক্রে ঘুরিয়া মরে, মুক্তি তাহাদের হয় না।

এই ব্যাপার লইয়া অরুণাকে এখানে অনেক কথা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কয়েকজন ভদ্রমহিলা ইস্কুলে আসিয়া অরুণাকে গালাগাল করিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—আপনাকে দেখতে এসেছি। বলি, দেখে আসি আপনি কিসে গড়া।

—মানে?

—পাথর—না লোহা—না আর কিছু?

—তুমি ছেলের হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিয়েছ?

অরুণা বলিয়াছিল—নিয়েছি। আপনার বাড়িতে কোন ছেলে ঢুকে যদি দামী খেলনা নিয়ে বুকে চেপে ধরে—তবে আপনি তাকে খেলনাটা দেন, না কেড়ে নেন?

—বলতে পারি না। হবে নিই যদি, তবু কি সে—এ নেওয়ার সমান?

—কেন নয়, বলুন তো?

—সে তুমি বুঝতে পারবে না। তোমার যে কাঁকে কখনও ফলে নাই।

একজন বলিয়াছিল—সাত জন্ম তোমার ছেলে হবে না।

বেনামী চিঠির তো সংখ্যা ছিল না। শেষ পর্যন্ত অরুণা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্ণকে বলিয়াছিল—স্বর্ণ, সত্যিই কি আমি মা নই বলে—বুঝতে পারছি না! সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণ বলে—এই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হইয়া সে একদিন মৃত বিশ্বনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল, এ কি অবস্থায় তুমি আমাকে ফেলে গেলে? আমি বাঁচব কি নিয়ে?

ন্যায়রত্ন যেদিন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নামিলেন—সেদিন অরুণা এই কথাটা বলিয়াই তাঁহার পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, বলিয়াছিল—বলুন, আমি বাঁচব কি নিয়ে?

দেবু অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তা হলে আমি চলি ভাই গিরীশ! আমি তা হলে দোষে খালাস। এর পর আমাকে দোষ দিও না।

দেবু চলিয়া আসিল। বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিল—স্বর্ণ!

স্নানের জায়গা হইতে স্বর্ণ উত্তর দিল—চা উনোনের পাশে রয়েছে প্যানের মধ্যে। ঢেলে নাও। আসছি আমি।

দেবু চা ঢালিয়া চুমুক দিতে দিতে ভাবিতেছিল—এই সব মানুষের কথা। মেরুদণ্ড-হীন হিমশীতল প্রাণহীন সব। ওর স্বপ্নে অতীতকালের আবহাওয়া ফিরাইয়া আন—তবে জাগিয়া উঠিবে, বাঁচিয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাও—ইহারা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। ইতিহাসের পাপচক্রের চড়কে পিঠে বাণ বিঁধিয়া ঘুরপাক খাইতেছে।

ইহাদের বল—জাগিয়া উঠ, চল আজ সব ভাঙিয়া চুরিয়া বিপ্লব বাধাইয়া ইংরাজকে তাড়াইয়া গড়িয়া তুলি নূতন সমাজ, নূতন জীবন,—ইহারা নড়িবে না, ইহারা সাড়া দিবে না। ইহারা মৃত, ইহারা একটা বরফ প্লাবনের তলদেশে চাপা-পড়া শবশ্রেণী!

চোখ তাহার জ্বলিয়া উঠিল।

চায়ের কাপ হাতে লইয়া বার দুই চুমুক দিয়াই দেবু অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সে গিরীশদের কথা ভাবিতেছিল।—ইতিহাসের চক্রান্তের চড়কে পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া পুরুষানুক্রমে মহানন্দে ঘুরপাক খাইতেছে—আর ভাবিতেছে পাকে পাকে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়াছে। হিন্দুর শিবঠাকুরের সিংহাসন গিয়াছে সেই কবে। মুসলমানের পীরের মসনদও গিয়াছে। সিংহাসন বল, মসনদ বল—দখল করিয়া বসিয়াছে ইংরাজ। তবুও হিন্দু-মুসলমানের আক্রোশ আর মিটিল না। দুই বিড়ালের ঝগড়ার রুটির গোছা লইয়া বাঁদর গাছে উঠিয়া পরমানন্দে রসাস্বাদন করিতেছে—বিড়াল দুইটার সেদিকে দৃষ্টি নাই—তাহারা লেজ এবং রোঁয়া ফুলাইয়া নখ বাহির করিয়া পরস্পরের বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিবার জন্য যুদ্ধে মাতিয়া রহিয়াছে।

সে বুঝিতে পারে না—কেন এই সহজ সত্যটা ইহাদের বোধগম্য হয় না। অবশ্য সে নিজেও একদিন বুঝিতে পারিত না। একদিন বিশু-ভাইয়ের সঙ্গে এই লইয়া তাহার বিরোধও হইয়াছিল। সে কথা মনে পড়িলে আজও তাহার দুঃখ হয়। লজ্জাও হয়। মনে মনে তাহার জেলবাসটাকে সে ভাগ্য বলিয়া মানে। ভাগ্যে তাহার জেলে যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল।

স্বর্ণ স্নান সারিয়া বাহির হইয়া আসিল। তোয়ালে দিয়া মাথার চুল মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল?

দেবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—সনাতন ভৌতিক কাণ্ড। ভূতে সব উল্টে দিলে।

—মানে?

—মানে আবার কি? এ দেশে সর্বের মধ্যে ভূত বাসা বেঁধে থাকে। হাটের ব্যাপারেও হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাসা বেঁধে রয়েছে।

স্বর্ণ যত বিস্মিত হইল তাহার চেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া—দেবুকেই কঠোর স্বরে বলিল—হেঁয়ালী রাখ বাপু। কি

হয়েছে সেটা বল।

—মুসলমানেরা দাবী করেছে—হাটে জয়তারার আশ্রমের জন্যে যে তোলা ওঠে তার ভাগ পীরের দরগায় দিতে হবে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? হিন্দুরা বলেছে—তারচেয়ে আমাদের জমিদারের সঙ্গে মিটমাট করাই ভাল।

—মিটমাট করাই ভাল। এই কথা বললে ' কে?

—গিরীশ।

স্বর্ণ ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া গেল। দেবু একটু হাসিল—বলিল—কথা বল না যে।

স্বর্ণ বলিল—ওদের—

—ওদের কি?

কথা বোধ হয় খুঁজিয়া না পাইয়াই স্বর্ণ বলিল—ওদের মরে যাওয়াই উচিত। মরে যাক, সব মরে যাক।

তাহার মুখচোখ ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর চেয়ে উত্তেজনা তাহার অনেকগুণে বেশি। স্বাভাবিকভাবেই বেশি। ধর্মই হোক, রাজনীতিই হোক, সংসারই হোক—মেয়েরা যত আবেগের সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, নিজেদের কঠিন পাকে জড়াইয়া দিতে পারে, পুরুষেরা ততখানি গাঢ় আবেগের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিতে পারে না। তাহার উপর স্বর্ণ স্বামী পাইয়াছে— সংসার পাইয়াছে; কিন্তু আজও সন্তান কোলে পায় নাই। রাজনীতির পথে পা দিয়া সে দেবুর অপেক্ষাও প্রবল বেগে ছুটিতে চায়। সে দিক দিয়া সে পঞ্চগ্রামের মানুষের সঙ্গে অনেকগুণে বেশি পৃথক— বেশি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রকৃতির স্বভাবধর্মই বোধকরি এমনি, জীবনে যাহা আঁকড়াইয়া ধরে—তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে জীবন পরিত্যাগ করা অপেক্ষাও কঠিন। কিন্তু কোনক্রমে পরিত্যাগ করিলে আর সে সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না। নূতন যে খাতে সে প্রবেশ করে—সেই পথেই ছুটিয়া চলে প্রবলতর গতিতে। নূতন যে আশ্রয়কে পায়—তাহাকেই জড়াইয়া ধরে সবলতর আবেগে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি মণ্ডল জাতিতে সদ্‌গোপ, নিজে হাতে সে চাষ করিত, তাহার কন্যা সে। দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। ভোরবেলা হইতে উঠিয়া হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ পালন করিয়া চলিত। হিন্দু সমাজের অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বাপের সংসারে থান-কাপড় পরিয়া, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাটিয়া, নানা ব্রতবারে উপবাস করিয়া, ভাইয়ের আমলে ভাজের সঙ্গে কলহ করিয়া হিন্দু বালবিধবার জীবনের বাঁধা ছকে ছকে ঘুরিয়া একদা গোলকধামের ঘুঁটির মতো বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনকড়ি মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে শুরু করিল। স্বর্ণ তাহার দাদা গৌরের বই লইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল। তারপর ঘটিল বিপর্যয়। ডাকাতির মামলায় তিনকড়ির জেল হইয়া গেল। ছেলেটি ও মেয়েটি দেবুর উপর নির্ভর করিয়া বসিল। দেবু স্বর্ণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাকে লেখাপড়া শেখানোই সর্বোত্তম পন্থা বলিয়া মনে

করিল। গৌরের লেখাপড়া হইল না। সে দেবুর আশ্রয়ে আসিয়া কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ারি শুরু করিল। তারপর একদা হইল নিরুদ্দেশ। স্বর্ণ প্রাণপণে লেখা-পড়াকেই আঁকড়াইয়া ধরিল। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল। দেবুর ইচ্ছা ছিল—স্বর্ণকে মাইনের পাস করাইয়া গ্রামেই ছোট ছেলে-মেয়েদের পাঠশালা খুলিয়া বসাইয়া দিবে। হয়তো তাহাই হইত। কিন্তু তিরিশ সালে দেবু গেল জেলে। জেল হইতে ডিটেনশানে। স্বর্ণ তখন নূতন পথে ছুটিতে শুরু করিয়াছে। জংশনের বালিকা বিদ্যালয়ে ছোট দিদিমণির চাকরি লইয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। জংশন তার জীবনে আনিল নূতন ধারা। সে ম্যাট্রিক পাস করিল। দেবু জেল হইতে ফিরিল। তারপর একদিন কি জানি কেমন অকরিয়া কি হইয়া গেল। দেবু অনুভব করিল—স্বর্ণকে তাহার জীবনে চাই। আশ্চর্য স্বর্ণ শিউরিয়া উঠিল না, জ্বলিয়া উঠিল না, পুলকিত লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল—এত বড় ভাগ্য যে আমি ভাবতেও পারি না দেবুদা। আমাকে তুমি—' দেবু বলিল—আমরা রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করব স্বর্ণ—যদি চাও তা হলে পুরুতও ডাকব।

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু শিবকালীপুর দেখুড়িয়া, তাই বা কেন—পঞ্চগ্রামের সমাজ অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বর্ণের কৃতিত্বে একদা সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। দেবুর আত্ম-ত্যাগে সেবার গোটা পঞ্চগ্রাম তাহাকে নেতৃত্বের আসন দিয়াছিল। কিন্তু এই বিবাহের পর গোটা পঞ্চগ্রামের সমাজ তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। পূর্বের কাল হইলে হয়তো অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সেটা সম্ভব-পর ছিল না। শুধু সকলে যেন সরিয়া গেল।

স্বর্ণ এবং দেবু একদা আসিয়া জংশনে বাসা করিল। দেবুর রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইল। স্বর্ণ দেবুর কাছে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিল। তারপর আসিল অরুণা। দেবুই যোগাযোগ করিয়া তাহাকে আনিল। সদ্‌গোপ গৃহস্থের শান্তশিষ্ট বালবিধবা মেয়েটি কোথায় হারাইয়া গেল এই নূতন স্বর্ণের মধ্যে। সে কথা বোধকরি স্বর্ণ নিজেও জানে না। জানা দূরের কথা, কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্য সে-দিনের কথা তাহার মনেও পড়ে না। পড়িলে বোধহয় নারী হইয়া এমনভাবে গিরীশকাকাদের বলিতে পারিত না—ওদের মরে যাওয়া উচিত। মরে যাক সব মরে যাক।

দেবু চা শেষ করিয়া কাপে আরও খানিকটা চা ঢালিয়া লইয়া বলিল—তুমি বেশি উত্তেজিত হয়ে কাউকে কিছু বলো না যেন।

—বলব না? কেন? তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?

—তুমি ইস্কুলে চাকরি কর স্বর্ণ। ওরা সব আগে থেকেই চেষ্টা করছে তোমাকে সরাবার।

—চাকরি আমি ছেড়ে দেব।

—না। সেটা ঠিক হবে না।

—আমার কিন্তু এইভাবে লুকোচুরি খেলে চাকরি করতে ভাল লাগছে না। চাকরি ছেড়ে আমি পার্টির কাজই করব।

—না। যখন প্রয়োজন হবে তখন দিতেই হবে। সে প্রয়োজন এখনও আসেনি। তারচেয়ে স্কুলের চাকরিতে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে।

—কিন্তু এবার অবস্থাটা কি হল ভেবে দেখেছ? অরুণাদি চলে গেলেন। এবার যে কে আসবেন—কেমন লোক—তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারব কি না—সে সব ভেবে আমার একদম ভাল লাগছে না।

হঠাৎ উনানে ফট-ফট্ শব্দে কয়লা ফাটিয়া তাহাদের চকিত করিয়া তুলিল। স্বর্ণ বলিল—দাঁড়াও।

লোহার শিক দিয়া নিচে খুঁচাইয়া আঁচ খানিকটা নামাইয়া দিল, তারপর ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া বলিল—এক-একবার মনে হয় কি জান? মানে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছের কথা বলছি। ইচ্ছে হয়—চাকরি ছেড়ে শিবকালীপুরে গিয়ে থাকি। আগের আমলের মতো ওখানে কাজ করি।

ঘাড় নাড়িয়া দেবু বলিল—সে আর হয় না।

—হবে না কেন? হবে না—মনে ভাবলেই হবে না। হবে, বিশ্বাস রাখলে হতেই হবে। কথাতেই রয়েছে—'নেই বললে সাপের বিষও থাকে না।'

—কথাটা মিথ্যে স্বর্ণ। বিষধর সাপ যদি হয়—তবে পৃথিবীসুদ্ধ লোক 'নেই' বলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেও বিস না-থাকা হবে না, বিষ থাকবেই। আর যদি ঢেলে বা জল-ঢোঁড়া হয় তবে 'নেই' বলে না চেঁচালেও বিষ থাকবে না। শিবকালীপুরে ফিরে যাওয়া—বাস করতে যাওয়া—আর হবে না।

সে বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া কথাটার উপর জোর দিতে চেষ্টা করিল।

—পণ্ডিত। পণ্ডিতমশায়।

দরজার কড়াটা নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিত-মশায়! কণ্ঠস্বর যত শান্ত তত কুণ্ঠিত। দেবু মুহূর্তে চিনিল—নলিন ডাকিতেছে। ও কণ্ঠস্বর আর কাহারও হইতে পারে না। বি-এ পাস করার পর জংশনে সে দেবুমাস্টার মাস্টারমশাই নামে পরিচিত। তাহার জীবনের সকল পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া—পঞ্চগ্রাম সমাজও ওই নামেই তাহাকে ডাকে। শিবকালীপুরের জগন ডাক্তারও তাহাকে মাস্টার বলে. শুধু নেলো বা নলিন তাহাকে বলে, পণ্ডিতমশায়।

স্বর্ণ দরজা খুলিয়া দিল। নেলো আসিয়া নীরবে দাওয়ায় বসিল। দেবু প্রশ্ন করিল—কি সংবাদ নলিনচন্দ্র, বল।

নেলো খুঁট খুলিয়া টাকায় পয়সায় রেজকিতে প্রায় মুঠাখানেক নামাইয়া দিয়া বলিল—গুণে নেন। মহিলা সমিতির টাকা।

স্বর্ণ বলিল—টাকা তো মাসের শেষে নেওয়া হয়। এখন কেন? স্টক মিলিয়ে হিসেব করে নিতে সময় লাগবে তো?

দেবু বুঝিয়াছে। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—হয়েছে কি? হঠাৎ টাকা পয়সা মিটিয়ে দিতে এসেছিস?

নলিন বায়ুরোগ গ্রস্তের মতো বারকয়েক কাঁধ ঝাঁকি দিয়া নড়িয়া-চড়িয়া সংকোচ

কাটাইয়া বলিল—আপনারা আলাদা লোক দেখুন। ও আমি

সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে আরম্ভ করিল।

দেবু বলিল—তুই পারবি না?

শান্ত নিরাসক্তভাবে নলিন বলিল—না।

—কেন? কি হল?

—হয় নাই কিছু। হবে আর কি? মানে—ঘাড় হেঁট করিয়া সে নখ দিয়া মাটির উপর ছবি আঁকিতে শুরু করিল।

—মানেটা কি রে? সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি।

—মানে—ঘাড় তুলিল নেলো, কিন্তু দেবুর দিকে তাকাইল না। মানে—। আবার ঘাড় হেঁট করিয়া নখে আঁকা ছবির দিকে চাহিয়া বলিল—মানে, মনটা আমার খচ-খচ করছে।

—মন খচ-খচ করছে? কেন? সেই ছেলেটার হাত থেকে পুতুল কেড়ে নেওয়ার জন্যে?

—হ্যাঁ। তাছাড়া—। নলিনের হেঁট-করা মাথাটা নানা অসচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নড়িতে লাগিল।

—তাছাড়া আবার কি?

—কিছু না। টাকা পয়সা নিয়ে ওকে যেতে দাও। স্বর্ণ তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল। —ও যখন পারবে না, তখন জোর করে লাভ কি? জেনেই বা হবে কি?

হাসিয়া দেবু বলিল—না—না—না। জানতে হবে বৈকি। নলিনের সঙ্গে আমার তো সাধারণ সম্পর্ক নয়।

স্বর্ণ বলিল—না, সব মিথ্যে। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে সম্পর্কের কোন দাম নেই। যখন নলিনের রঙ-তুলি কেনবার পয়সা ছিল না, যখন গাঁয়ের লোক ওকে ঘেন্না করত, যা-তা বলত, তখন তুমি ভালবেসেছিলে। আপনার জনের মতো স্নেহ করেছিলে, সাহায্য করেছিলে—তখন সম্পর্কের দাম ছিল। আজ নলিনের হাতের পুতুল দেখে কলকাতার ব্যারিস্টারের ছেলে—কঙ্কণার জমিদারবাড়ির বংশধর কাঁদে, হাটে নলিনের ডালা-ডালা পুতুল বিক্রি হয়—আজ আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কের দাম কি বলতে পার? সাধারণ সম্পর্ক নয়—মানে অসাধারণ সম্পর্ক। হাসিও পায়—দুঃখও ধরে। ছি! তোমার লজ্জা হয় না। কিন্তু আমি লজ্জা পাই।

টাকা পয়সাগুলি মুঠায় তুলিয়া স্বর্ণ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বলিল—মহিলা সমিতির সঙ্গে তোমার সম্পর্কও কিছু নাই। আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, আমি নিলাম টাকা। স্টক মিলিয়ে হিসেব করে দেখে নেব নলিন। তোমাকে আমি খালাস দিলাম। আমাদের ব্যবস্থা আমরা যা হয় করব।

নলিন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াই রহিল। কোন উত্তর সে দিল না।

দেবু বলিল—চা খাবি?

নলিন ঘাড় নাড়িল—না। ঘাড় তুলিয়া বলিল—চা খেয়েছি একবার। তারপর একটা

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তা হলে আমি যাই।

—আচ্ছা।

যাইতে গিয়া নলিন কিন্তু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ছেলের হাত থেকে পুতুলটা নেওয়া কিন্তু আমার মনে ভারী লেগেছে পণ্ডিত। আমি একদিন বাবুদের বাড়িতে গিয়ে একটি বুড়ো পুতুল ওদের দাওয়ার ওপর রেখে পালিয়ে এসেছি। শুনলাম, বাবু সেটাকে লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে। তা দিক। তার ধর্ম তার ঠাঁই—আমার ধর্ম আমার কাছে।

আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—স্বর্ণদিদি বললে আমাকে কথাগুলান—তা কথাগুলান সত্যি। একটুকুও বাড়িয়ে বলে নাই। সেই নজরবন্দীবাবু আর তুমি না থাকলে পণ্ডিত আমার ভাগ্যে—। বোধ হয় খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—মুটে মজুরের কাজ করেই জীবন কাটত আর কি। আমার জাতজন্ম নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে—বাড়িতে বোধ হয় কেউ রাখত না। তা ছাড়া তুমিই আমাকে টেনে নিয়ে এলে জংশনে। আমার খুব ভয় ছিল। জংশনে টেনে এনেছ, তাই পুতুল বিক্রি হচ্ছে। লোকে জানতে পেরেছে—তারিফ করছে। তা—, তা যতদিন বাঁচব আমি বলব সবাইকে। আজও বলব পণ্ডিত ছিল তাই আমার সব। তা আমি বলব।

দেবু এতক্ষণে রাগ করিল। যাহার কাছে কৃতজ্ঞতা পাওনা থাকে—সে অকৃতজ্ঞ হইলে দুঃখ অবশ্যই হয়। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার ভান করিয়া ন্যাকামি করিলে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। দেবুর মনে হইল, নেলো এইবার ন্যাকামি শুরু করিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—সে না বললেও চলবে রে। সে আশা করে তোকে আমি সাহায্য করিনি। বুঝলি।

—সে আমি জানি পণ্ডিত। আমার গুণ আছে দেখে তুমি সাহায্য করেছিলে। আমিও এতদিন তুমি যা বলেছ—না করি নাই। তুমিই বল পণ্ডিত। তখন আমি ছেলেমানুষ। তুমি, সেই নজরবন্দীবাবু কত চিঠি আমাকে দিয়েছে আমি জংশনে—সদরে দিয়ে এসেছি ভেবে দেখ। তার পরে—কত ছবি তুমি বরাত করেছ—আমি এঁকেছি। তুমি ভেবে দেখ, সেই একটা শেকল-বাঁধা মানুষ—টেনে শেকল ছিঁড়ছে ছবি তুমি আঁকালে। আমি আঁকলাম। তুমি বললে না কিছু, তবু আমি তো বুঝতে পেরেছিলাম ওর মানে কি। না তো ভাবি নাই। দারোগা ডেকে নিয়ে বললে—তুই এঁকেছিস। আমার বিপদ হবে জেনে আমি বলেছিলাম—না। মার দিয়েছিল—তবু তো বলি নাই। মনে কর তুমি। তারপরে কত ছবি আঁকালে। কিন্তু—ওসব আমার ভাল লাগে না পণ্ডিত। তাতেই পণ্ডিত—। ভাবছিলাম অনেক দিন থেকেই। এবারে এই ব্যাপারে মনে আমার ভারী ঘা লেগেছে। তাই সব বলে কয়েই আমি সরে যাচ্ছি।

এই ধরনের কথা দেবু নলিনের কাছে প্রত্যাশা করে নাই। সে তাহাকে দিয়া দলের মত-অনুযায়ী কতকগুলা পোস্টারের ছবি আঁকাইয়াছিল। উদ্দেশ্যটা কেবল যে দলের কার্যোদ্ধার একথা ঠিক নয়। চিত্রশিল্পের কল্পনায় অঙ্কন-পদ্ধতিতে তাহার চোখের সামনে একটা নূতন পথের ইঙ্গিত দিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টাকে এমন বিকৃত-

ভাবে নেলো গ্রহণ করিবে—তাহা সে ভাবে নাই। দেবুর মাথার মধ্যে রক্ত যেন চনমন করিয়া উঠিল। নেলো পয়সা-কড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত হিসাবী এবং কৃপণ সে তাহা জানে। সেই কারণে পোস্টারের ছবি আঁকাইয়া সে তাহাকে মজুরী দিতেও চাহিয়াছিল। নলিনই লয় নাই। হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল—পণ্ডিত। তোমার কাছে আমি ছবির দাম নিতে পারব না। এখন আমার পয়সা আছে। কিছু টাকা আমি জমিয়েছি। যদি অভাব কখনও হয়—এমনি চেয়ে নোব। তুমি যা করেছ—আমার বাপ দাদাতে তা করত না পণ্ডিত। তারা আমাকে ছবি আঁকতে রঙ তুলি কিনে দিত না। বোষ্টমের ছেলে—কাঁধে ঝোলা দিয়ে বলত—ছবি আঁকতে হবে না পোটোর মতো—ভিক্ষে করে আন গিয়ে। নয়তো ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকর-খানসামার কাজে ভর্তি করে দিত।

কথাগুলি শুনিয়া দেবুর বড় ভাল লাগিয়াছিল, শুধু তাই নয়—নেলোর উপর তাহার স্নেহ—সেই স্নেহের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধাবোধ যুক্ত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—ছেলেটা শুধু জন্মগত শিল্পবোধ লইয়াই সংসারে আসে নাই- শিল্পবোধের সঙ্গে শুদ্ধ মনুষ্যত্ব—তৃষ্ণাও লইয়া আসিয়াছে।

আজ দেবুর সমস্ত ধারণা একমুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। রাগ তাহার হইয়াছিল—সে রাগ সংযত করিয়াও দেবুর কণ্ঠস্বর মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—তার জন্যে আমি মজুরী দিতে চেয়েছিলাম নলিন। তুমি নাও নি। ভাল করে স্মরণ করে দেখ তুমি।

নলিন একটু চমকিয়া উঠিল। বলিল—তা কি আমি বলেছি পণ্ডিত ?

—তবে ? তবে তুমি বলছ কি ?

—বলছি—। নলিন মাথা চুলকাইতে লাগিল। মনের কথা সে যেন ঠিক প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

—কি বলছ—বল ?

—মানে—। ও সব আঁকতে আমার ভাল লাগে না। ও সব—এবার সে এক-বার বাঁ কাঁধ—একবার ডান কাঁধ ঝাঁকি দিয়া নিজের মনের অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অক্ষমতা অসহায়ভাবে প্রকাশ করিল। তারপর বলিল—আমি যাই পণ্ডিতমশায়। নতুন দোকান করছি, তার উয্যুগ আছে, আমি যাই।

—যাও।

নলিন যাইতে যাইতে আবার ঘুরিল—আমি নিজেও আর হাটে দোকান করব না পণ্ডিতমশায়। তাতেই আরও মিটিয়ে দিলাম আপনাদের সমিতির টাকা। বাবুদের ছেলের হাত থেকে পুতুলটা ছোঁ মেরে তুলে নিলে বড় দিদিমণি। সেটাও আমার যেমন মনে লেগেছে, বাবুদের ছেলের জন্য পুতুল দিয়ে এলাম—সেই পুতুল বাবু লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে—তাও তেমনি আমার মনে লেগেছে। ওদের হাটে আর আমি দোকান করব না। সে যদি না-খেতে পেয়ে মরেও যাই তবুও না। আমি ইস্টিশানের ফটকের ধারে বড় অশথ গাছটার নিচে দোকান পাতব। ওই যে—কবরেজ সেনমশায় আছেন—উনি নিয়ে গিয়েছিলেন সুরপতিবাবুর কাছে। উনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-

চেয়ারম্যান তো, ওকে বলে কয়ে করে দিলেন। রাস্তা বোর্ডের। জায়গাও বোর্ডের। গাছতলায় একটি তক্তাপোষ পাতব। তার ওপরে কাঠের খুপরি ঘর করে নোব—পানের দোকানের মতো। তা ছাড়া খানিকটা—

একসঙ্গে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া নলিন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। যে কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছে- সে কথাটা সংকোচে আটকাইয়া গিয়াছে। এই গাছতলায় দোকান বন্দোবস্ত লওয়া ছাড়াও সে খানিকটা ভিটা বন্দোবস্ত লইয়াছে। জংশনের দক্ষিণ দিকে একটা দেহ ব্যবসায়িনীদের পল্লী আছে, সেই পল্লীর মুখেই একটি ভিটা সে কিনিয়াছে। গিরীশ ছুতার মধ্যে থাকিয়া সস্তায় ভিটাটা করিয়া দিয়াছে। ওইখানেই সে ঘর তুলিবে। একখানা ঘর—একটা বড় চালা, আরও একটা ছোট চালা। ঘরখানায় সে বাস করিবে, ছোট চালাটায় রান্না হইবে, বড় চালাটা হইবে তাহার পুতুল গড়িবার ঠাঁই।

দেহ ব্যবসায়িনীদের সম্পর্কে তাহার নিজের কোন সংকোচ নাই। কিন্তু দেবু পণ্ডিত স্বর্ণ—ইহাদের আছে, সে কথা জানে বলিয়াই কথাটা বলিতে গিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

দেবু বেশ একটু বিস্ময় বোধ করিল। সমস্ত শুনিয়া স্বর্ণের মনও অনেকটা প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া জমিদারের ছোট হাট পরিত্যাগ করিয়াছে এই সংবাদে তাহাদের দুইজনেই খুশি হইয়াছে।

স্বর্ণ বলিল -এতক্ষণ এ-কথাটা বলিসনি কেন ?

দেবু হাসিল- বলিল শ্রীমান নলিনচন্দ্রের কথাবার্তার ধরনই এই। ফ্লাশব্যাকটা খুব পছন্দ ওর।

নলিন বাবু দুই কাঁধ ঝাঁকি দিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ যেন পলাইয়া গেল। দেবু একটু ব্যস্ত হইয়া ডাকিল নলিন।

দরজার ওপার হইতে উত্তর আসিল- কাল আসব। আজ

আজ সকালেই সতীশ বাউরীর আসিবার কথা আছে। ঘর ঠিকা লইবে। সতীশ বাউরী পঞ্চগ্রামের মধ্যে পাকা দেওয়াল বাঁধে, তাহার হাতের কাঁচা মাটির ঘরের আজও একশ বৎসর পরমায়ু।

সতীশ বলে চার-পাঁচশো বছর পরমায়ু ঘর সে আমরা পারি না। তবে হ্যাঁ, শতায়ু ঘর—মানে যদি ঠিক মতোন ছাদন টাদন দিয়ে রক্ষে করেন তবে একশো বছর যাবে। তিন-চার বছর অন্তর পোতা বেঁধে দেবেন—মেঝেতে ইঁদুর লাগলে খুঁড়ে জল ঢেলে নতুন মেঝে করবেন ব্যস।

সতীশও আজকাল পঞ্চগ্রামের জীবনগণ্ডী অতিক্রম করিয়া জংশনে আসিয়াছে। অবশ্য পুরাপুরি নয়, আংশিকভাবে। চাষের সময় পঞ্চগ্রামের মাঠে চাষ করে, ফসল উঠিয়া গেলে মাস চারেক সে জংশনে আসিয়া কাঁচা মাটির বাড়ি ঠিকা লইয়া কাজ করে। গিরীশ ছুতার চাল কাঠামো তৈরি করে, সে সতীশকে কাজ জুটাইয়া দেয়, সতীশ দেওয়াল তৈয়ারি করিয়া গিরীশকে কাঠামোর কাজ আনিয়া দেয়।

গিরীশ বলে—এটা আমাদের গিরীশ সতীশ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, কনট্রাক্টার বিল্ডার অ্যাণ্ড কারপেন্টারর্স।

সতীশ হাসে।

গিরীশ বলে—তুই যদি হোলটাইম হতে পারতিস সতীশ, হাফটাইম হলেও হত একরকম, এ যে কোয়ার্টার টাইম। মোটে তিন চার মাস।

গিরীশ নলিনের তক্তাপোষ দোকানটা ঠিক লইয়াছে। বলিয়াছে—এইসা বানিয়ে দোব, দেখবি। পিছনের কাঠের দেওয়ালে— থাক লাগিয়ে দোব। দুই পাশে কব্জা দিয়ে দুপাল্লা—তাতেও থাকবে আলমারী। বন্ধ করে তালা দিয়ে দাও, একটি বন্ধ আলমারী। খুলে দাও, থাকে থাকে পুতুল সাজানো সারি-সারি। সবুজ রঙ লাগিয়ে দোব। সাদা হরফে লিখে দোব—"গিরিন কেবিন--পুতুলের দোকান।" অর্থাৎ গ্রীন কেবিন।

*　　　*　　　*

স্বর্ণ বলিল—মিথ্যে ওর ওপর রাগ করেছিলাম আমরা। সেকালের মন ওদের, ওরা সব বুঝতে পারে না। তুমি যে সব আইডিয়া দাও, সে সব ঠিক ওর মাথায় ঢোকে না।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

নদীর ধারে মুখার্জিবাবুর মিলে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। সে উঠিল। প্রাইভেট টিউশনির সময় হইয়াছে। ঠিক প্রাইভেট টিউশনি নয়, কোচিং ক্লাস। স্টেশন মাস্টার-দের ছেলেমেয়েদের লইয়া সকাল-সন্ধ্যা কোচিং ক্লাস করে সে। দশ-বারোটি ছেলে। ছেলে পিছু তিন টাকা মাইনা। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা ওখানেই হয়। এ ছাড়া খবরের কাগজ আছে। গৌর কাগজ বেচে, কমিশনের অনেক পায়, অর্ধেক দেবুর, তাহাতেও দশ পনের টাকা পায়। স্বর্ণ মাইনে পায় ত্রিশ টাকা। আশি টাকায় বেশ চলিয়া যায় দুজনের। চাষের ধান-চালটা ইহার পরে।

—হ্যালো কমরেড ডেবেনোভস্কি!

দেবু দেখিল—উকিল সুরপতিবাবু বাইসাইকেলে চড়িয়া পিছন হইতে আসিতেছেন। আগে সুরপতিবাবু দেবুকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন, বলিতেন চাষা।

আজকাল দৃষ্টি খানিকটা পাল্টাইয়াছে। এখন ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—কমরেড। কখনও কমরেড গোস্মা, কখনও কমরেড ডেবেনোভস্কি, কখনো বলেন—এই যে ব্রাদার —এসোমেসো করে দে মা লুটে পুটে খাই।

কাজ সুরপতির নাই—সে দেবু জানে। শুধু ওই কমরেড ডেবেনোভস্কি বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার জন্য ডাকিয়াছে। দেবু ফিরিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া হাসিল।

সুরপতি সাইকেল হইতে নামিয়া বলিল—কি ব্যাপার ভাই দেবনাথ। তোমার সেই কারিগরী ছোকরা দেবকী সেনের হাতে গিয়ে পড়ল কেমন করে বল তো? আমার কাছে গিয়েছিল সেনকে নিয়ে—স্টেশনের ধারে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের গাছতলায় দোকান করবে। আমি অবিশ্যি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি কিছু, তবে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তোমায় বাদ দিয়ে দেবকী সেনকে নিয়ে এসেছে--ব্যাপার কি? হাটে স্টল করছিল তোমাদের মহিলা সমিতির স্টলের সঙ্গে---হঠাৎ ঘুড়ির মতো গোত্তা খেয়ে লাইনের

ওপার থেকে এপারে এসে পড়ল ছোকরা।

দেবু হাসিয়া বলিল—কি জানি কি হল। শুধু বললে—ছেলের হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিলে পণ্ডিত—। সেন্টিমেন্টে লেগেছে আর কি।

সুরপতি বলিলেন—ঠিক করেছিলেন অরুণা ভটচাজ। ওতে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কঙ্কণার জমিদারনন্দন প্রজার বুকের রক্ত-চোষা টাকায় বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে একেবারে লীডার সেজে বসবার মতলব—ওদের আমিও একেবারে দেখতে পারি নে। আরে বাবা, পাড়াগাঁয়ের মহলে প্রজাদের সঙ্গে যা করিস, জংশন দ্বারমণ্ডলের মতো একটা এতবড় জায়গা—এখানে পর্যন্ত জমিদারী চাল চালতে আস। জমিস্টার—বলে কি জান?—জমিস্টার বোঝ তো? জমিদার কাম ব্যারিস্টার—জমিস্টার। জমিস্টার সাহেব সেদিন বলে—অরুণা ভটচাজের চাকরি খেতে হবে—স্বর্ণের চাকরিও। শেষে বলে—ন্যায়রত্ন অরুণা দেবীকে নাত বউ স্বীকার করে ওর বাড়িতে যখন নিমন্ত্রণ নিলেন—তখন ওকে পতিত করা হোক। আমি তো হাসব না কাঁদব ভেবে পাই নে।

দেবু বলিল—জানি। শুনেছি সব।

—শুনবে বইকি। তোমাদের স্পাই সিস্টেম পুলিশের চেয়ে খারাপ নয়। সুরপতি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হঠাৎ হাসি থামাইয়া বলিলেন অরুণা দেবীর রেজিগনেশন আমি অ্যাকসেপ্ট করতে চাই নে। ওকে আমি লিখেছি—আপনি একবার অন্তত আসুন। চার্জ বুঝিয়ে দিতেও তো আসতে হবে। তখন আসুন—এলে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্তা হবে। তারপর যা হয় করবেন। আজ চিঠি পেলাম - আসছেন তিনি। শীগগির আসবেন।

আসছেন? লিখেছেন? দেবু চকিত হইয়া উঠিল।

আজই সকালে চিঠি পেয়েছি। আচ্ছা, চলি। হ্যাঁ, কথায় কথায় আসল কথাটা ভুলে গিয়েছি। হাটের তোলা নিয়ে আন্দোলনটা বন্ধ করছ কেন? ধান চালের তোলা, ঈশ্বরবৃত্তি—ও দুটো নিয়েও যা আরম্ভ করেছ, ওতে আমার সিমপ্যাথি আছে। ফুল সিমপ্যাথি।

সুরপতি চলিয়া গেল। বড় ভাল সাহেবের চালান ভদ্রলোক। ধীর গতিতে চলেন—বুনিয়াদি চাল সাহেবিয়ানার মধ্যেও ফুটিয়া উঠে।

স্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনেই রেলওয়ে কম্পাউণ্ড, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাটা আসিয়া রেলের ফটকের মুখে শেষ হইয়াছে। চারিপাশে অনেকটা খোলা জায়গা, টার চারিপাশে বড় বড় গাছের শ্রেণী একটি ছায়ামণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। আগে গরুর গাড়ি স্টেশনে যাত্রী আনিয়া এই ছায়ায় বিশ্রাম করিত। মোটর বাসের চলন হওয়ার পর গরুর গাড়ির সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এখন এই সব গাছের তলায় ছোটখাটো দোকান বসিতেছে। চা সিগারেট, চানাচুর, তেলেভাজা, গোটা কয়েক ছোট চায়ের দোকান—ভাঁড়ে চা বিক্রেতা। একটা গাছতলায় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের জলসত্র—এই সব লইয়া বেশ একটা ছোট বাজার বসিয়াছে। এইখানেই

সম্ভবত এই অশথ গাছটার তলায় নেলোর দোকান বসিবে।

বাসের ভিড়ের মধ্য হইতে একটা ছোকরা ছুটিয়া আসিল।—মাস্টারজি!

ছেলেটা উচ্চিংড়ে।

শিবকালীপুরের সদ্‌গোপদের একটি অনাথ ছেলে। আজ আর সে অনাথ নয়। নিজের ভার সে নিজেই লইয়াছে। ছেলেবেলায় অনাথ ছিল। বছর আষ্টেক বয়সে—মা-বাপ দুই-ই মারা গিয়াছিল, ছেলেটা পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত—প্রতিবেশীর দাওয়ায় বা চণ্ডীমণ্ডপে ঘুমাইত, লোকের বাড়িতে মাগিয়া খাইত। অনিরুদ্ধ কর্মকারের সন্তানহীনা স্ত্রী পদ্ম ছেলেটাকে কুড়াইয়া লইয়া মানুষ করিয়াছিল। কামার-বউ একদিন চলিয়া গেল—

দেবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

উচ্চিংড়ে আসিয়া জংশনে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। প্রথমে করিত ভিক্ষা। তারপর সে নিজের কাজ বাছিয়া লইয়াছে। বাসে আসিয়া কাজ লইয়াছে।

উচ্চিংড়ে একখানা চিঠি দেবুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দেবুর একটি চেলার দল আছে। উচ্চিংড়ে দেবুর চেলা।

দল নহিলে পৃথিবীতে বাঁচিবার উপায় নাই। বিশেষ জংশনে।

চিঠিখানা আসিয়াছে জেলার সদর হইতে। এ জেলায় দেবুদের যে দলটি আছে সেই দলের সেক্রেটারি লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন—"কোন রকমে সরকারী গোপন খবর পেলাম যে আগামী হাটবারে আই-বি ডিপার্টমেন্টের একটা দল ওখানে যাবে। এস-পি যাবে আগের দিন। দরবারী শেখ আজ রওনা হবে। বিশেষ কিছু একটা ঘটবে সন্দেহ নেই। পত্র পাওয়া মাত্র যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করবেন। সম্ভবত পুলিস কারও কাছ থেকে খবর পাচ্ছে।"

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। ঠিক করিয়া লইল কি করিতে হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দেবুদের যে উপদলটি এখানে আছে তাহারা নিজেদের মত ও পথ অনুযায়ী হাটের দিন অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠে। হাটের দিন এখানে চারিদিকে হইতে যে বিপুল জনসমাগম হয় তাহার সুবিধা তাহারা গ্রহণ করে। পল্লীতে পল্লীতে যে সব গ্রাম্য কর্মীরা আছে তাহারা নিজেদের কাজেই হাটে আসে। তাহাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহাদের হাত দিয়া প্যাম্ফলেট পাঠায় গ্রামে গ্রামে। এই সব লোকেদের মধ্যে যাহারা বিশেষভাবে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের লইয়া বৈঠক বসে। তাহাদের নিকট হইতে গ্রাম্যসংবাদ সংগ্রহ করে। বিশেষ করিয়া গ্রাম্য-বিরোধের সংবাদ। জমিদার-প্রজা, মহাজন-খাতক, জোতদার-কৃষাণ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ বাধিলে সেই সব বিরোধের ক্ষেত্রে তাহারা প্রজা-খাতক-কৃষাণ-দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি জানায়—গ্রাম্য কর্মীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে নির্দেশ দেয়। আরও নানা আলোচনা ও গল্প হয়। দেবুদের দলের মতবাদগত দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সংগ্রাম আসিতেছে সে সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে বিপ্লবাত্মক না হইলে কোন ক্রমেই সার্থক হইবে

না। একসঙ্গে তাহারা রাষ্ট্র এবং সমাজ দুই ব্যবস্থাকেই প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ভাঙিয়া দুই ব্যবস্থাকেই নূতন করিয়া গড়িবে। বিশ্বনাথের কাছে একদিন এই সব কথা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে দলগত মতবাদ সংক্রান্ত বই পড়িয়া, অর্থনীতি শাস্ত্রে বি-এ পাস করিয়া এবং দলের বিভিন্ন নেতার কাছে শিক্ষালাভ করিয়া আজ এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, এই ছাড়া আর কোন পথ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে নাই। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত এই দুর্গম পথের শেষপ্রান্তে তাহার কল্পজগৎ সে স্পষ্ট দেখিতে পায়। সেখানে সে দেখিতে পায় অপরূপ এক রাজ্য—অপূর্ব এক মানুষের সমাজ। মানুষে মানুষে ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ নাই শূদ্র নাই—চণ্ডাল নাই, হিন্দু নাই—মুসলমান নাই—খৃস্টান নাই, ধনী নাই দরিদ্র নাই। রাজা নাই—প্রজা নাই। শোষক নাই—শোষিত নাই। আছে শুধু মানুষ। ভেদ নাই তাই বিরোধ নাই। বিরোধ নাই, তাই মিথ্যা নাই। আছে শুধু মানুষ আর পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র ও কর্ম। মানুষ আপন আপন সাধ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া যায়। প্রত্যেকে কাজ করে সকলের জন্য, সকলে কাজ করে প্রত্যেকের জন্য। শুধু তাহারা ভারতবর্ষকেই দেখে না, তাহারা দেখে সমগ্র পৃথিবীকে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির একটি শাখা, দেবু সেই শাখার সেক্রেটারি। ইহারা চরমতম উগ্রপন্থী বলিয়া ইংরাজ সরকার ইহাদের প্রতি কঠিন দৃষ্টি রাখিয়াছে। আরও কয়েকটি বামপন্থী দল কংগ্রেসের মধ্যেই আছে—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কোন শাখা এখানে নাই। দেবুদের দলের একটা সুবিধা আছে বিগত যুগের বিশিষ্ট বৈপ্লবিক কর্মীদের অনেকে এই মত—সেই সঙ্গে এই দলকে গ্রহণ করিয়াছেন। আরও সুবিধা আছে সেইটাই খুব বড় সুবিধা—এই দলের ভাণ্ডারে অর্থ আছে।

দেবু মনে মনে স্থির করিয়া লইল কি কি করিতে হইবে। হাটবার আগামী শুক্রবার, আজ সোমবার। দরবারী শেখ নাম। পুলিশ কর্মচারীটি কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। লোকটি আকৃতিতে প্রকৃতিতে একেবারে শয়তান। উপরের ঠোঁটটা জন্মকাল হইতেই কাটা এদেশে বলে খনা কাটা ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'হেয়ার-লিপস্'। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়া উপরের মাড়ির দুইটা দাঁত বাহির হইয়া থাকে। এ-জেলার পুলিশ সাহেব সমশের সাহেবের ডান হাত উপযুক্ত অনুচর। সমশের খান [illegible] আই-পি। কিন্তু ইহারই মধ্যে ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীদের নেকনজরে পড়িয়াছে। উনিশশো তিরিশ সালে মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহীদের উপর চরমতম অত্যাচার করিয়াছিল এই খানসাহেব। এ জেলায় আসিয়া বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এক ষড়যন্ত্র মামলা সৃষ্টি করিয়া উপরে নাম কিনিয়াছে। ষড়যন্ত্র মামলার কথা স্মরণ করিলে দেবুর হাসি পায়। দেবু তখন অন্তরীণ অবস্থায় জেলের মধ্যে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। আসামীদের মধ্যে একজনের স্বীকৃতি অনুযায়ী একটা বড় দীঘি হইতে একটা ট্রাঙ্ক উদ্ধার করা হয়। সে নাকি বলিয়াছিল যে, ডাকাতি করিয়া ছয় মাস আগে এই দীঘিতে ট্রাঙ্কটা ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে, ট্রাঙ্কের ভিতর নগদ টাকা—একটা রিভলভার, কিছু গহনা লুকানো ছিল। গহনার মধ্যে ছিল একছড়া সোনার চেন ও সোনার ঘড়ি। মহা সমারোহ করিয়া মাসখানেক ধরিয়া

দিবারাত্র চৌকিদার-পাহারার মধ্যে প্রচুর খরচ করিয়া দীঘির জল মারিয়া সেই ট্রাঙ্ক বাহির করা হইয়াছিল। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তরুণ বাঙালী আই-সি-এস আগাগোড়াই এই মামলাটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া খানসাহেব ওই ট্রাঙ্ক উদ্ধারের সময় তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কৌতূহল বশতঃ গিয়াছিলেনও। সত্যই ট্রাঙ্ক উঠিয়াছিল, ট্রাঙ্কের মধ্যে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিসও মিলিয়াছিল। কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়াছিল—ছয় মাস পূর্বে জলে ডুবানো ট্রাঙ্কটার মধ্যে বাঁধা ঘড়টার সেকেণ্ডের কাঁটাটাকে টিক টিক শব্দে চলিতে দেখা গিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘড়িটা হাতে লইয়া খানসাহেবকে বলিয়াছিলেন—কি মেকারের ঘড়ি খান সাহেব? এক দমে ছমাস চলছে! অদ্ভুত।

সমশের সাহেব দেখি-দেখি বলিয়া ঘড়িটা হাতে লইয়াছিলেন—সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—কই? চলছে কই? না তো! বলিতে বলিতেই ঘড়িটা তাঁহার হাত হইতে বাঁধানো ঘাটের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল।

তাহার পরই সমশের সাহেব গেলেন কলিকাতায়। দিনদুয়েক পরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে তার আসিয়াছে—অবিলম্বে জেলার সদরে গিয়া জেলার ভার গ্রহণ কর। তোমাকে বদলী করা হইল।

কিছুদিন আগে—বৎসর দুয়েক আগে আরও একটা বিচিত্র রাজনৈতিক মামলা হইয়া গিয়াছে। জেলার সদরে শহর হইতে স্টেশনে যাইবার পথে একটা নির্জন বসতিহীন স্থানে ডাক লুট হইয়াছিল। ইনসিওর এবং পোস্টাপিসের টাকা লইয়া প্রায় হাজার কয়েক টাকা ছিল। ওই অপরাধে জেলার কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের এক ছেলে এবং আরও দুইটি ছেলেকে দীর্ঘকাল জেলে রাখিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাক লুটের কোন কিনারা হয় নাই। কিন্তু এই দরবারী শেখ যে থানার এস-আই ছিলেন সে থানার এক কনেস্টবল স্থানীয় পোস্টাপিসে মনিঅর্ডার করিতে গিয়া পোস্ট মাস্টারের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। তাহার নোটের নম্বরে এবং আরও কতকগুলি চিহ্নের সঙ্গে পোস্টাপিসের সেই লুট-হওয়া নোটের নম্বর ও চিহ্ন মিলিয়া গিয়াছিল। কনেস্টবল বলিয়াছিল—সে নোট পাইয়াছে দারোগাবাবুর কাছে? অর্থাৎ দরবারী শেখ সাহেবের কাছে। বিচিত্র ব্যবস্থা। দরবারী শেখের উন্নতি হইয়া গিয়াছে এই ঘটনার পর। তিনি সদর শহরে একেবারে খোদ সমশের খান সাহেবের বাঁডার হইয়া গিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, দরবারী শেখ সাহেব অতঃপর আই-বি বিভাগে বিশেষ পদে উন্নীত হইবেন।

দরবারী শেখ আসিতেছে আগামীকাল। আজই সাবধান হইতে হইবে। সর্বাগ্রে সাবধান করিতে হইবে গৌরকে। সে দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অজুহাত অবশ্য আছে। সে খবরের কাগজ বিক্রি করে অপরাহ্ণে। প্রতিদিন সকালেই সাইকেল ঠেঙাইয়া বাহির হইয়া যায় গ্রামের দিকে।

ভয় স্বর্ণ সম্পর্কেও আছে। সে যে রকম উগ্র মতবাদী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভয় অহেতুক নয়। পড়াশুনার মধ্যে ইস্কুলের মেয়েদের যে কি বলিয়াছে তাহা সেই জানে। তবে বলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে অপ্রকাশ

থাকিবে না। কিছুদিন হইতেই এই লইয়া অরুণা বার বার তাহাকে বলিয়াছে—ঠিক এ রকম করে কথাবার্তা মেয়েদের বলো না স্বর্ণ।

স্বর্ণ শ্লেষ মিশাইয়া হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—কেন? ভয় করে আপনার? তারপর বলিয়াছিল—কি করবে? চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবে? দিক না! কিম্বা পুলিশে ধরবে? ধরুক! জুজুর ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতে পারব না।

উচ্চিংড়ে ছেলেটা আবার আসিয়া কাছে দাঁড়াইল—মাস্টারজী।

দেবু বলিল—বল।

—চিঠ্ঠি-উঠ্ঠি কুছ দিজিয়ে গা?

দেবু ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—ফের তুই যদি হিন্দী বলবি, তোর মাথায় ডাণ্ডা লাগাব আমি।

উচ্চিংড়ে বলিল—যো সাদী কো যো মস্তর মাস্টারজী!

তারপর বলিল—মোটর চালায়েঙ্গে জী। চলেঙ্গে—ইধর—উধর—কেতনা দেশ—দিল্লি লাহোর—বিনা হিন্দীমে ক্যাযসে চলেগা, বলিয়ে তো?

—ওদিকে মটরের হর্ন বাজিতেছে ঘন-ঘন। ড্রাইভারটা হাঁকিতেছে—আবে—এ! এ উচ্চিংয়োয়া!

—আভি আযা জী! বলুন। চিঠি দেবেন?

—না। তুই শুধু বলিস যে ঠিক আছে সব। আর—আর প্রত্যেক বাসের দিকে নজর রাখবি। দরবারী শেখ দারোগার এখানে আসবার কথা আছে। সে যদি—

—কে? সেই গন্না-কাটা?

—হ্যাঁ। সে যদি বাসে আসে তবে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই।

—ঠিক হ্যায়। ঠিক মিলেগা! গোবরা আপনাকে ঠিক জানিয়ে আসবে। আমি সদরে গেলেই ও ছুটি পাবে। পরের বাসেই ও ফিরবে। ওকে আমি বলে দোব। ও এখানে থাকবে। নামলেই খবর পাবেন আপনি। ও রেলে এলেও খবর পাবেন। স্টেশনেই থাকবে আজ গোবরা। চায়ের দামটা দেবেন।

বলিয়াই ছুটিয়া গিয়া লাফ দিয়া বাসে উঠিয়া পড়িল উচ্চিংড়ে। হাঁকিতে লাগিল—আর চলে গা—তুফান মেল! চল্‌লো—চল্‌লো। এই ছেড়ে চল্‌লো!

বাসের গায়ে দুই-তিনটা চাপড় মারিয়া শব্দ তুলিয়া বলিল—অ-ব ঠিক হ্যায়।

দেবু একটু হাসিল। সেই উচ্চিংড়ে ও গোবরা। শিবকালীপুরে লোকের ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া খাইয়া ফিরিত। নিঃসন্তান কর্মকারবধূ পদ্ম অন্তরের ক্ষুধায় উচ্চিংড়েকে কাছে টানিয়া আপন করিতে চাহিয়াছিল। কর্মকার-বধূ একদা নিরুদ্দেশ হইল—ছেলে দুইটা আসিয়া আশ্রয় লইল জংশনে। দেবু ভাবিয়াছিল—দুইটা ভিক্ষুক বাড়িল, দুইটা জুয়াচোর কি চোর বাড়িল। কিন্তু বিচিত্র এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা-প্রধান নগর সৃষ্টি। কর্ম-প্রবাহ যেমন বিপুল গতি, তেমনি বিশাল পরিধি। শুধু তাই নয়—তেমনি তাহার বহু বিচিত্র স্রোত-ধারা। এখানকার মোটর যন্ত্র ছেলে দুইটাকে আকর্ষণ

করিল। প্রথম প্রথম মোটর বাসের পাশে বসিয়া থাকিত। বিস্মিত দৃষ্টিতে এই যন্ত্রযান-গুলিকে দেখিত। যাত্রীদেব কাছে ভিক্ষা চাহিত। ক্রমে বাস-ড্রাইভারদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া মোটর বাসেব কাছে আসিল। তারপর বিনা বেতনে বেগার খাটিতে শুরু করিল। তারপর জংশন শহরের বিপুল বিশাল কর্মপ্রবাহের এই বিচিত্র স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। সংসারে যে কোন কাজ হইলেই তো মানুষেব চলে না, কাজ করিয়া তৃপ্তি হয় না, প্রযোজন হয় কাজেব সঙ্গে অন্তরেব রুচিব যোগাযোগেব।

দেবু জানে—এই ভাঙা ভগ্ন সমাজেব নিঃস্ব রিক্ত দেশটাব মানুষেব পঙ্গু জীবন এই জংশনের মতো নূতন ক্ষেত্রে সার্থক সচল হইয়া উঠিবে। কংগ্রেসের চরকা-খদ্দরে তাহা-দের বিশ্বাস নাই, যন্ত্রশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণেব কথায় একটু বাঁকা হাসি তাহাদেব ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে।

তাহার প্রমাণ চাই?

দেবু তাহাকে বলিবে—একবাব সকালে কি সন্ধ্যায় স্টেশনেব ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া দেখিয়ো। সার্থকতা কোথায এ-কথা মানুষকে বলিয়া দিতে হয় না। জীব-জীবনের ঘ্রাণ ও স্পর্শ-শক্তির মতো একটা শক্তি আছে তাহার। সেই শক্তিবলে তৃষ্ণার্ত জীবেব বাতাসেব সজল স্পর্শ হইতে জল কোন্ দিকে আছে বুঝিতে পারার মতো সে বুঝিতে পারে—কোথায আছে জীবনের সার্থকতা। গ্রামে গ্রামে গ্রামোপযোগী করিয়া এই জীবনধারা ও সভ্যতাকে লইয়া যাও—দেখিবে সেখানেও মানুষের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। ঠিক এই কারণেই এই জংশনকে সে তাহাব কর্মক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লইযাছে। পৌছাইয়া দিবে সে জীবনের কর্মধারা।

—মাস্টারমশাই!

দেবু ফিরিয়া দেখিল—স্টেশান কম্পাউণ্ডে কোয়ার্টার্স এলাকায় ছোটবাবুর বাসার বারান্দায তাহার ছাত্রদের একজন দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। মাস্টারদের ছেলে-পিলেরা একটু বিচিত্র ধরনের। একটা যেন স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। জীবনস্বপ্ন—রেলের চাকরি। পড়াশুনা—পাস করিবার জন্য। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে উহাদেব স্বভাব বদলাইবার জন্য—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেন উহাদের রক্তগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুটবল খেলা—থিয়েটার এই দুইটি হইল সংস্কৃতির সর্বোত্তম শিখর। যাক—সে তাহার কর্তব্য করিয়া যাইবে। পাস করাইয়া দিতে হইবে। সে অগ্রসর হইল। তাহার আগে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। খবরটা না আসিলে বিপদ হইত। কয়েকদিন আগেই প্রচুর প্যাম্ফলেট আসিয়াছে। সেগুলাকে নষ্ট করিলে চলিবে না। লুকাইয়া রাখিবাব খুব ভাল জায়গা তাহার আছে। রামবিলাস তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রয়োজন হইলে রেলেব কোন গুদামের মালের মধ্যে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। ওদিকেও একটা সুবিধা হইয়াছে। এ জেলার পুলিশের মধ্যেও দেখা দিয়াছে একটা বিরোধ। সমশের খাঁ আসিয়া অবধি এটার সৃষ্টি। লীগ-শাসনের জন্য সমশের খাঁর মধ্যে ইংরেজভক্তির সঙ্গে মুসলিমপ্রীতিও অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া দরবারী শেখকে অত্যধিক অনুগ্রহ করার জন্য হিন্দু কর্মচারীরা অত্যন্ত চটিয়া

গিযাছে। তার উপর জংশনের এই হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে সে বিরোধ ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু পুলিশ-কর্মচারীরা অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু। অথাদ্য কুখাদ্য বিচার না করিলেও—তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—চোর-ডাকাত-খুনে-সন্ত্রাসবাদীর হাত হইতে তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন দেবদেবীরা। বিশেষ করিয়া মা কালী। দেবু আবার হাসিল।

*　　　　*　　　　*

দেবু গোপনে সংবাদটা কয়েকজনকে জানাইয়া দিল। কংগ্রেস আপিসে জানাইল, গ্রামের কর্মীদের মধ্যে যাহারা দলের সভ্য তাহাদেরও জানাইল। যাহারা সভ্য নয় তাহাদের জানাইল যে এখন দুই তিন হাটবার দেবু বা অন্য প্রধানেরা জংশনে থাকিবে না, সুতরাং তাহারা যেন দেবুর বাসায় বা কংগ্রেস আপিসে, কি রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে মহাবীরতলায় না যায়। রাজনৈতিক দলের মধ্যে জানাইল না হিন্দুমহাসভাকে। ওই দলটিকে দেবু দলের মধ্যেই গণ্য করে না। বলে—এ যুগে ওটা হল নিতান্তই শখের যাত্রা থিয়েটারের দল—এবং নাটকে কেবল একটি পার্টই আছে—ভীমের পার্ট। পালার নাম হিড়িম্বার স্বয়ম্বর। হিড়িম্বার মালা পাবার জন্য যত বর—সবাই ভীম সেজে তুলোর গদা হাতে নিয়ে—সিংহাসন জুড়ে বসে—স্পিরিটগাম দিয়ে আঁটা হেপি চুলের গোঁফে তা দিচ্ছে। কথাটা অল্পবিস্তর সত্য। কারণ কঙ্কণার জমিদারবাড়ির ছেলে, যাকে সুবর্পাত বলে 'জমিস্টার' সে, কি শ্রীহরি ঘোষ, কি শেঠ সুরযমল—রাজরোষে ইহাদের কোন ভয় থাকিতেই পারে না। কিন্তু দেবকী সেনকেও সে সংবাদ দিল না। দলের প্রধানদেরও সরাইয়া দিল।

স্বর্ণ বলিল—তুমিও কয়েকদিন সরে যাও।

—না। এখান থেকে সরব না। তবে বাড়ি থেকে সরে থাকব।

—কেন? এখানে থাকবারই বা এখন দরকার কি?

আছে। তোমার জন্যে।

আমার জন্যে? মানে?

—তুমি জল একটু বেশি ঘোলা করেছ স্বর্ণ। যদি বাড়ি সার্চ করে, কি তোমাকে ডাকে—। দেবু শিহরিয়া উঠিল। দরবারী না পারে এমন কাজ নাই। দরবারী একটা পশু।

স্বর্ণ তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল ধরেই যদি নিয়ে যায় করবে কি?

—করব আর কি? তবু উৎকণ্ঠা থেকে বাঁচব।

—কোথায় থাকবে?

থাকব রামবিলাসের আড্ডায়।

রামবিলাস এখানকার রেলকর্মীদের একজন মাতব্বর। জংশনের ইয়ার্ডের একজন পয়েন্টস্‌ম্যান। ট্রেড ইউনিয়নের একজন সভ্যও বটে। লিলুয়া অঞ্চল হইতে বৎসর খানেক আগে এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছে।

বেলা আড়াইটার সময় কলিকাতা হইতে ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারে খবরের কাগজ আসে। গৌর জংশনে গিয়া কাগজ ডেলিভারি লইয়া থাকে।

হালদার দারোগা স্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। গৌর স্টেশনে আসিতেই তাহাকে বলিল—কি খবর ? ওখানে কি ?

গৌর হাসিয়া বলিল—কাগজ ডেলিভারি নেব।

—খবরের কাগজ ?

—হ্যাঁ।

—বোনাই কোথায় ? দেবু ঘোষ ?

—কাল রাত্রে কলকাতা গিয়েছে।

—কলকাতা ?

—হ্যাঁ। কলকাতা গিয়েছে।

—তারপর—আর সব খবর কি ? কি রকম চালাচ্ছ আজকাল ?

—কি ?

—দলের কাজকর্ম ?

দলবল আর নেই। খেতে পাই না—দল করব।

—হুঁ। তাই বলছিল বটে সব। তা গাঁয়ে গিয়ে চাষ-বাস কর না কেন ? খবরের কাগজ বিক্রি করে আর কি হবে ? না—লাঙল ধরতে লজ্জা করে ?

গৌর হাসিয়া বলিল—তা করে একটু-আধটু। ওই ট্রেন আসছে, আমি যাই।

সে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

ব্রেক-ভ্যানের দরজায় গিয়া কাগজের বাণ্ডিল বগলে করিয়া সে আর স্টেশন প্ল্যাটফর্মের গেট দিয়া ফিরিল না। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেটের কাছে ফিরিতে হইল তাহাকে। তাহার সাইকেলখানা গেটের কাছে পানওয়ালার দোকানে রাখিয়া আসিয়াছে।

গেটের কাছে আসিয়া সে আশঙ্কায় হতবাক হইয়া গেল।

—ও কে ? সাদা থান কাপড় পরিয়া বিধবার বেশে ও কে—অরুণাদিদি ? অরুণাদিদিই তো। একেবারে চেনা যায় না। চিনিবার উপায় নাই। এ অরুণাদিদি যেন সে অরুণাদিদিই না।

যে অরুণাদিদিকে দেখিয়া মনে হইত কুমারী মেয়ে। অরুণাদিদি বিধবা, সেকথা সে জানিত। কিন্তু অরুণাদিদি পেড়ে কাপড়-ব্লাউজ পরিত। হাতে দুইগাছি চুড়ি ছিল। তাহার সঙ্গে বাঁ-হাতে থাকিত রিস্ট-ওয়াচ। মাথার চুল বাঁধিবার ধরনেও কুমারী বা বিধবা চিনিবার উপায় ছিল না।

এ অরুণাদিদির পরনে সাদা থান কাপড়, সাদা ব্লাউজ, খালি হাত, কেশ প্রসাধনের ধরনের মধ্যেও বৈধব্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

সে ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—অরুণাদি।

মুখ ফিরাইয়া অরুণা গৌরকে দেখিয়া বলিল—গৌর।

—হ্যাঁ। কিন্তু—।

মধ্যপথেই তাহার কথার উপরে কথা বলিল অরুণা। বলিল—তোদের কাউকেই খুঁজছিলাম।—ভালই হয়েছে। তারপর মুখ ফিরাইয়া অন্য কাহাকেও বলিল—আমার ব্যাগ বিছানা থানায় নিয়ে যাবার কি দরকার আছে? স্টেশনে তো দেখেছেন সব? এ দুটো বাসায় পাঠিয়ে দিতে আপত্তি আছে আপনার?

দরবারী শেখ পানের দোকানটার ওপাশে ছিল, গৌর দেখিতে পায় নাই। দরবারী শেখ বলিল—না। ও দুটো আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন।

অরুণা বলিল—এ দুটো তুই বাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর গৌর! আমায় একটু থানায় যেতে হবে।

—থানায় কেন?

রুক্ষ ভাষায় শেখ বলিল—দরকার আছে।

গৌর ছুটিল বাসার দিকে। স্বর্ণকে খবরটা দিয়া সে ছুটিল ইয়ার্ডের কোয়ার্টার্সের দিকে—দেবুদাকে সংবাদ দিতে হইবে। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন রওনা হইল। নলিন। আপনার নূতন গিরিন-কেবিন পুতুলের দোকান বন্ধ করিয়া সেও ছুটিল। সম্পূর্ণ শেষ না হইলেও গিরীশ তাহার দোকানটা গাছের গায়ে বসাইয়া দিয়াছে। নেলো ছুটিল ন্যায় মহাশয়—অর্থাৎ দেবকী সেনের কবিরাজখানার দিকে। সেন ছিল না। সে গিয়াছে জয়তারা আশ্রমে ন্যায়রত্নের কাছে। নেলো আবার ছুটিল। ঘণ্টাখানেক পরে বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন দেবকী সেনকে সঙ্গে করিয়া থানায় আসিয়া উঠিলেন। তখন স্বর্ণ সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুরপতিবাবুও আসিয়াছেন, তিনি বসিয়া আছেন থানার ভিতরে।

৫

অরুণাকে খুব বেশি দুর্ভোগ পোহাইতে হইল না। আই-বি ইনস্‌পেক্টর রণদাপ্রসাদ তাহাকে অল্পেই ছাড়িয়া দিল। রণদাপ্রসাদ এই জেলাতেই সাধারণ সাব-ইনস্‌পেক্টর হিসাবে কাজ শুরু করিয়া আপন কৃতিত্বে এখানকার আই-বি ইনস্‌পেক্টর হইয়াছে। সেদিক দিয়া কর্মজীবনের গোড়ার দিকে তাঁহার খ্যাতি এবং কৃতিত্ব এস্‌-পি সমশের খান এবং দারোগা দরবারী শেখের খ্যাতি ও কৃতিত্ব এক খাতের জল-স্রোতের মতো স্বাদে বর্ণে পলির পরিমাণে একরকমই ছিল। কিন্তু সমশের খানের মুসলিমপ্রীতি এবং হিন্দুবিদ্বেষ রণদাপ্রসাদকে সৎপথে বা সত্যের পথের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

প্রথমেই দরবারী রণদাকে চটাইয়া দিল—সে থানার ইনস্‌পেকশন রুমে অরুণাকে হাজির করিয়া বলিল—দেখুন স্যার, কি রকম ভোল পাল্‌টেছে দেখুন!

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে রণদা দরবারীর মুখের দিকে চাহিল। দরবারীর কথাটা ঠিক তাহার মাথায় ঢোকে নাই। দরবারী অরুণাকে বলিল—এখনও তো বুড়ি হওনি তুমি—এরই মধ্যে তপস্বিনী সাজলে যে?

অরুণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বাক্যটা কৌশলে ব্যবহার করিলেও—মূল প্রবাদ-

বাক্যে ব্যবহৃত 'বেশ্যা' শব্দটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবু সে কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। রণদাবাবুও চকিত হইয়া দরবারীর দিকে চাহিল। রণদা নিজেও কথাটা ব্যবহার করিতে পারিত। ইহার পূর্বে ইহা অপেক্ষাও কুৎসিত কথা সে স্বচ্ছন্দে অনর্গল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—আঃ, দরবারী! তবে জোরে ধমক দিতে সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরেই সমশের খাঁ আসিতেছে। মনে পড়িয়া গেল–বৎসর দুয়েক আগে যখন জেলার ষড়যন্ত্র মামলা আবিষ্কারে খাঁ মাতিয়া উঠিয়াছিল—সেই সময় একটা ছিঁচকে চুরিকেও সমশের সুকৌশলে ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছিল। সেই সময় রণদা বলিয়াছিল—এটা বাদ দিন, লোকে বলবে কি?—না-না! সমশের তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সোজা সহজ সুরে বলিয়াছিল—'আমি দেখছি রণদাবাবু, তোমাকে আবার সেই সাব-ইনস্পেক্টরশিপেই রিভার্ট করতে হবে।' এখন রণদাবাবু পাকা ইনস্পেক্টর—তবুও সমশের খানের মুখ মনে পড়িলে খানিকটা দমিয়া যাইতে হয়।

ওদিকে—দরবারী ওইটুকু ধমকে দমিল না। সে বলিল—না স্যার, ঢঙ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। দেখুন না—থান কাপড় পরে—হাত শুধু করে রুখু চুলে এলোকেশী হয়ে একেবারে গোঁসাই ঠাকরুন সেজেছেন। মুসলমান হয়ে কলমা পড়ে বিয়ে করে—ফের হিঁদু হয়ে—

এবার রণদা দৃঢ় হইয়া ধমক দিল—দরবারী সাহেব, ওগুলো আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয় নয়। আপনি বাইরে যান, ওঁকে যা জিজ্ঞাসা করবার আমি করছি। যান—।

এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে দরবারীর সাহস হইল না। দরবারী এখনও ঠিক আই-বি বিভাগের লোক নয়। রণদার ব্যক্তিত্বও আছে।

দরবারী বাহিরে যাইতেই রণদা বলিল—কিছু মনে করবেন না। ওদের আসল রাগটা হল আপনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে বিয়ে করে ফের হিন্দু হলেন কেন? এরা—। পুলিশ বিভাগের লোক না হইলে রণদা হয়তো আরও অনেক কথা বলিয়া ফেলিত। সমশের খাঁ এখানকার এস-পি না হইলেও বলিত। নিজেদের দলের লোক এস-পি হইলেও বলিত। প্রাণ ভরিয়া—পেট খোলসা করিয়া বলিত। আত্মদমন করিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল—তারপর বলিল—কি করব বলুন? এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন আপনারা। কংগ্রেস, রেভলিউশনারী পার্টি। স্বাধীনতা-স্বাধীনতা রব তুলে হুজুগ করে—আন্দোলন করে আর বোমা পিস্তল ফুটিযে দেশটাকে এদের হাতে তুলে দিতেন না। আপনারাই এর জন্যে দায়ী।

অরুণা বসিয়াছিল পাথরের মতো। প্রথম বয়সে—অর্থাৎ সে যখন কুমারী অবস্থায় তাহার দাদার সঙ্গে এই দলে যোগ দিয়াছিল—তখন দুইবার তাহাকে কলিকাতার আই-বি আপিসে যাইতে হইয়াছিল। তখন সে মুখে তুবড়ি ফুটাইয়াছিল। দু-মাস পূর্বে হইলেও সে কাটা কাটা জবাবই দিত। কিন্তু এই দু-মাসে সে একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যে—একটা কঠিন জীবন-সঙ্কট রোগে ভুগিয়া—তাহার ধাতটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। রণদার কথার জবাবে সে এতক্ষণে কথা বলিল—

আমি কংগ্রেসের মেম্বার পর্যন্ত নই, বোমা-পিস্তল ছুঁড়ে যারা দেশের স্বাধীনতা আনবেন—তাদের সঙ্গেও আমার কোন সংশ্রব নেই !

আজ না হইয়া অন্যদিন হইলে রণদা টেবিলে কিল মারিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিত—ন্যাকামি। প্যাঁচ কষিয়া উত্তর সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। আজ কিন্তু তাহার মেজাজ আলাদা। সে এই হিন্দু কন্যাটিকে কোন রকমে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচে। অরুণার উত্তরে মুখ একটু বিকৃত করিয়া সে বলিল—তা জানি, আপনারা আবার কম্যুনিস্ট। বলিতে বলিতে সে ক্ষেপিয়া উঠিল—বলিল—আপনারা আবার জাত মানেন না—ঈশ্বর মানেন না। হুঁ—তাইতেই এমনভাবে মুসলমান হতে বাধেনি। কি—। সত্যিই তো দরবারী মিথ্যে বলেনি—আবার মরতে হিন্দু হলেন কেন ?

অরুণা বলিল—এ কথার উত্তর আমি দেব না।

—দে-ব-না ? ছয় ফুট জোয়ান রণদা চেয়ারে দেহখানাকে শিথিল করিয়া বসিয়াছিল। সে সহসা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতিখানাকে ফুলাইয়া সোজা হইয়া বসিল।

হাঁকটা বাহির পর্যন্ত গিয়াছিল। দরবারী দরজার গোড়ায় আগাইয়া আসিল। পদশব্দে রণদা ঘুরিয়া তাকাইতেই বলিল—দেখছেন স্যার, তাঁদড়ামি।

রণদা ঘুরিয়া অরুণাকে বলিল—আপনি তাহলে অরুণা সেন ? বিশ্বনাথ ভটচাজকে মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছিলেন। ফের হিন্দু হয়ে এখন অরুণা ভট্‌চাজ হয়েছেন ?

—হ্যাঁ। এ তো গোপন করিনি আমি।

—করেছেন। এখানে এসে যখন গার্লস ইস্কুলে কাজ নেন—তখন এ পরিচয় দেননি। স্বামীর নাম লিখেছিলেন—বিশু ভটচাজ।

—আমার স্বামী ওই নামই ব্যবহার করতেন। বিশ্বনাথ বলতেন না নিজেকে। আর এখানকার কেউ এ ব্যাপারে আমাকে কোন প্রশ্নও করেননি।

—হুঁ।—আপনি কম্যুনিস্ট ?

—এ যুগে সাধারণ শিক্ষিত লোকে সবাই চায় কম্যুনিজমসম্মত ব্যবস্থা।

—তা না, আপনি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বর ?

—না,—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল অরুণা। মিথ্যা তাহাকে বলিতে হইল।

—আপনার স্বামী ? বিশ্বনাথ তো মেম্বর ছিলেন ?

—আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন দেখছি—

—তার মানে ?

—তার মানে—আপনারা যা বলছেন, যা জেনেছেন, সেসব কথা আমি জানি না। তাছাড়া, আমি তো নিজে কোন রাজনৈতিক দলে কখনও যোগ দিইনি। আমার দাদা অবশ্য জেল খেটেছেন। ডেটিন্যু ছিলেন; তাঁর বন্ধু ছিলেন আমার স্বামী, সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমে—

থামল অরুণা, মুখে বোধহয় বাধল। একটু থেমেই বলল—শেষে বিয়ে করি দুজনে।

—হুঁ। মুসলমান হয়েছিলেন কেন ? হিন্দু থেকেও তো বিয়ে করতে পারতেন। দশ-বিশটাতে তো বাধা নেই।

—ও-কথার জবাব দেব না। একবার তো বলেছি।

—না দেন দরকার নেই জেনে। এখন যেতে পারেন আপনি। —না—আর একটা কথা। এখানকার দেবু ঘোষই আপনাকে এখানে এনেছিল এ কথা কি ঠিক? এবং তার সঙ্গে আপনার এত হৃদ্যতাই বা কিসের?

—উনি আমার স্বামীর বন্ধু। আমার স্কুলের সেকেণ্ড মিস্ট্রেস স্বর্ণের স্বামী। পাশা-পাশি বাসায় থাকি। সজ্জন ব্যক্তি। এই পর্যন্ত। উনি আমাকে চাকরির খবরটা দিয়ে-ছিলেন। আমি ওঁকে লিখেছিলাম—আমার স্বামীর দেশে থাকতে চাই।

—আচ্ছা যান আপনি। বলিয়াই গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি কি বলিতে গেল। তাও মুখে না বলিয়া একটা কাগজে খসখস করিয়া কি লিখিয়া—কাগজটার দিকে অরুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অরুণা দেখিল—রণদা লিখিয়াছে—"এখান থেকে পত্রপাঠ চলে যান। সমশের খানের হাত থেকে বাঁচা বোধ হয় অসম্ভব।" কাগজখানা সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠায় তালগোল পাকাইয়া ছোট্ট একটি গোল পিণ্ডে পরিণত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না রণদা, শেষে সেটাকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে শুরু করিল।

অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দাঁড়ান। আর একটা কথা।

অরুণা জবাব দিল না, প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইল।

রণদা বলিলেন—থাকবেন কোথায়? নিজের বাসাতেই থাকবেন তো?

অরুণা বলিল—হাঁ।

—থাকবেন ক'দিন?

অরুণা সবিস্ময়ে রণদার দিকে অসঙ্কোচে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিল—আমি তো এখানে চাকরি করি—

—আপনি তো রেজিগনেশান দিয়েছেন। চার্জ বুঝিয়ে দিতে এসেছেন। রণদার দৃষ্টিতে ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল—'এখান থেকে পত্রপাঠ চলে যান।'

অরুণা শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল—যেন নিজের মনের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়া লইল। তারপর সেই শূন্য দৃষ্টি রণদাবাবুর মুখের উপর তুলিয়া ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কয়েকটি শব্দ বলিয়া গেল। অসংলগ্ন হইল—কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থ এবং দৃঢ়তায় তাহার সে উত্তর রণদাকে বিস্মিত এবং নিরুত্তর করিয়া দিল। অরুণা বলিল—আমি রেজিগনেশান উইথড্র করব।

নিরুত্তর রণদার বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল—আমি যে কথা তোমাকে লিখে জানালাম—তার পরও থাকতে চাও এখানে?

নারী না হইয়া পুরুষ হইলে রণদা মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গালে অন্তত প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত কষাইয়া দিত। নারী আবার অরুণা না হইয়া অন্য কেহ হইলে সমশের-দরবারীর সঙ্গে বিরোধটা সুস্পষ্টরূপে হিন্দু মুসলমান বিরোধের ভিত্তির উপর গজাইয়া না উঠিলে রণদা ছাড়িত না। দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া গালাগালি করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া কাণ্ড বাধাইয়া তুলিত। উনিশশো সাতাশ-আঠাশ হইতে বিপ্লবীদের দলে মেয়েরা

ঢুকিতে শুরু করিয়াছে, আই-বি বিভাগের কর্মচারী রণদাকে মেয়েদেরও শায়েস্তা করার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। সে-অভ্যাস তাহার আছে। কিন্তু অরুণা মেয়েটি আজ অভিনব মূর্তি লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। নিরুচ্ছ্বাসত অথচ অনমনীয় একটি মেয়ে। সে অবাক হইয়া অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দরবারী একখানা হুকুমনামা আনিয়া রণদার সম্মুখে ধরিল। পুলিশ সাহেবের সই-করা হুকুমনামা—নিয়মিতভাবে সপ্তাহে দুইদিন থানায় হাজিরা দিতে হইবে ; কোথাও যাইতে হইলে জানাইতে হইবে—ইত্যাদি। হুকুমনামাটায় নাম ধাম বসাইয়া লইয়া আসিয়াছে দরবারী।

রণদা সেখানা নিজের হাতেই রাখিয়া দিল, বলিল আচ্ছা যান আপনি। বলিয়াই আবার বলিল—চলুন, আমি বাইরে পৌছে দিচ্ছি।

অরুণা অগ্রসর হইল। দরজার কাছে গিয়া কিন্তু থমকিয়া দাঁড়াইল। দরজার একটা বাজু ধরিয়া যেন আত্মসম্বরণ করিতেছিল। রণদা প্রশ্ন করিল—কি হল ?

—কিছু না। কেমন একটু—

অসুস্থ বোধ করছেন ?

—না। ঠিক আছে। সে আবার পা বাড়াইল।

—জল খাবেন ?

– না। সে অগ্রসর হইল।

* * *

বাহিরে সুরপতি চেয়ারে বসিয়াছিল। ওদিকে বসিয়াছিল ন্যায়রত্ন—তাঁহার পাশে দেবকী সেন। তাঁহাদের কাছেই বসিয়াছিল স্বর্ণ। গৌর দাঁড়াইয়া আছে রাস্তার উপরে। নেলো বসিয়া কাঠি দিয়া মাটির উপব একটা ছবি আঁকিতেছে।

ওদিকে বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। শেষ অপরাহ্ণের সূর্যের আলোয় লালচে রেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই আলো পরিপূর্ণভাবে পড়িল অরুণার সর্বাঙ্গে। পশ্চিমমুখী থানাটার বারান্দাটি যেমন দাওয়া উঁচু—তেমনি প্রশস্ত।

সুরপতি চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কি ? মিসেস ভট্‌চাজ্যি—?

দেবকী সেনও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল –সেও বলিল—কি হয়েছে ? অরুণা দেবী ?

স্বর্ণের দৃষ্টি যেন জ্বলিতেছিল। এ কি মুখ হইয়াছে অরুণাদিদির ? সে যেন এখনি এই মুহূর্তে ভাঙিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া যাইবে।

ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শান্ত বার্ধক্যদুর্বল কণ্ঠে ডাকিলেন—দিদি !

অস্ফুটস্বরে অরুণা সবিস্ময়ে যেন প্রশ্ন করিয়া উঠিল—আপনি ? অর্থাৎ আপনিও আসিয়াছেন ? আমার জন্য ?

স্বর্ণ আসিয়া তাহার হাত ধরিল—বলিল—অরুণাদিদি ? এইটুকুর মধ্যে অনেক প্রশ্ন নিহিত ছিল—এবং সেগুলি সুস্পষ্ট।

অরুণা পূর্বের মতোই ক্লান্তকণ্ঠে বলিল—ছাড়।

—কি হয়েছে বলুন ? স্বর্ণের কণ্ঠস্বর প্রদীপ্ত, রি-এনফোর্সড কংক্রিটের ছাদের

গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া রণরণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

রণদাবাবু বলিলেন—উনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গোড়া থেকেই কেমন যেন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ—এই বেরিয়ে আসবার মুখেই- এবকম হয়ে গেলেন।

স্বর্ণ বলিল—বসুন—আপনি বসুন।

—না, ছাড়. দাদুকে প্রণাম করব।

অরুণা গিয়া নতজানু হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিল।

ন্যায়রত্ন তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন ওঁ। নিজেই তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, বোধহয় অরুণাকে হাত ধরিয়া তুলিবার জন্য। অরুণা বলিল—আমি নিজেই উঠতে পারব।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। এ বয়সে কাউকে ধরে তুলবার সামর্থ্য আমার নাই ভাই। আমি -। বলিয়াই অরুণার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন—তুমি অসুস্থ।

অরুণা ক্লান্তভাবেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না দাদু।

সুরপতি একটু অগ্রসর হইয়া আসিল—বলিল—আপনার মুখ দেখেই বোঝা যায় মিসেস ভট্টচার্য।

দেবকী বলিল—গৌর, দেখ তো স্টেশনে গরুর গাড়ি আছে কিনা?

ন্যায়রত্ন অরুণার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। বার্ধক্যস্তিমিত দৃষ্টিতে অরুণাকে দেখিয়া বুঝিতে চাহিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—সত্যই তো। তোমার মুখে যে দুরন্ত ক্লেশের ছাপ ফুটে উঠেছে।

—না দাদু—না। অরুণা যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে শুরু করিল। এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

—দাঁড়ান অরুণাদি। অমন করে ছুটবেন না। পড়ে যাবেন।

—না। পড়ব না।

—দিদি।

অরুণা সিঁড়ির শেষ ধাপে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দেবকীর হাত ধরিয়া ন্যায়রত্ন ধীরপদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন—একটু ধীরে চল ভাই। যতক্ষণ একসঙ্গে চলা যায়—এক সঙ্গেই যাই চল।

স্বর্ণ বলিল—বলুন অরুণাদি, কি হয়েছে বলুন। সকলের সামনে এখুনি বলুন। বলতে হবে আপনাকে। ওঁদের অসাধ্য তো কিছু নাই। বলুন।

অরুণা এবার বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বর্ণের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ একাদশী স্বর্ণ।

অন্ধকার রাত্রে অত্যুজ্জ্বল আলোয় ভরিয়া দিয়া একটি উল্কাপাত হইয়া গেল যেন। চমকিয়া উঠিল সকলেই—সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল সকলের দৃষ্টিতে। শুধু স্বর্ণ বলিল- প্রশ্ন করিল—একাদশী?

—হ্যাঁ!

—নির্জলা?

—না। তা পারব না। প্রয়োজনও নেই।

—থান কাপড় পরেছেন দেখছি।

এ কথার উত্তর দিল না অরুণা। নতমুখে ক্লান্ত পদক্ষেপে ন্যায়রত্ন ও দেবকী সেনের সঙ্গে অগ্রসর হইল।

সুরপতি রণদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—মাই গড।

রণদা ললাটের কুঞ্চনরেখায় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে অরুণাকে দেখিতেছিল। উত্তর আবিষ্কার করিতে চাহিতেছিল। সুরপতির প্রশ্নে তাহার দিকে ফিরিয়া সেও মুচকি হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই বাধ স্রাগ করিয়া হাত দুইটা উল্টাইয়া দিয়া বলিতে চাহিল—কে জানে বাবা।

থানার দাওয়ার উপর হইতেই দাওয়ায় ঠেসানো সাইকেলখানায় চাপিয়া বসিয়া প্যাডেলে চাপ দিয়া চালাইয়া দিয়া সুরপতি রণদাকে বলিল—আচ্ছা, চলি এখন। পরে দেখা হবে।

সেও চলিল, অরুণা ন্যায়রত্ন দেবকী সেন যে পথে গিয়াছে—সেই পথে। প্রশ্ন তার মনেও জাগিয়াছে। একাদশী করিয়াছে অরুণা? আবার সে আপন মনে মুচকি হাসিল।

থান কাপড় পরিয়াছে—একাদশী করিয়াছে। অরুণা ভটচাজ? ন্যায়রত্ন কোন কথা বলিলেন না অরুণাকে। দেবকী সেনের সঙ্গে নীরবে জয়তারার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। অরুণাই কয়েকটি কথা বলিল। বলিল—কাশী আমি যেতে পারিনি দাদু। মোগলসরাই থেকে নেমে আমি—।

অরুণা দেবকী সেন, স্বর্ণ ও গোরের দিকে চাহিয়াই বোধহয় চুপ করিয়া গেল। নীরবে খানিকটা পথ হাটিয়া আবার বলিল—এর বেলা মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে শেষে ফিরে গেলাম কলকাতা।

ন্যায়রত্নের শীর্ণ মুখে ক্ষীণ এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রসন্নও নয়, বিষণ্ণও নয়, সে হাসি বিচিত্র। কি যে সে হাসির অর্থ, সে শুধু তিনিই জানেন।

গোর বলিল—সে কথা আমি লিখেছিলাম দেবুদাকে।

কথাবার্তা হইতেছিল একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। সন্ধ্যার মুখে পথ চলিতে চলিতে টুকরা টুকরা কথা শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়ার মতো জমিয়া জমিয়া শিশির বিন্দুতে পরিণত হইয়া আপনার ভাবে আপনি ঝরিয়া পড়িতেছিল। একটা সংকোচ যেন সমস্ত মানুষগুলির মন-প্রাণকে নিস্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্ণ একটি কথাও বলে নাই। অন্ধকারে দেখিবার উপায় ছিল না—তাহার উপর সে মাটির দিকে মুখ নামাইয়া পথ চলিতেছিল। তাহার ভুরু দুটি কুঁচকাইয়া উঠিয়াছে, যৌবন-মসৃণ ললাটেও গোটা দুয়েক রেখা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহারা চলিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর তীরভূমির উপর দিয়া একটা নির্জন পথ ধরিয়া। বালির উপর এতগুলি লোকের পা ফেলার শব্দ উঠিতেছে শুধু।

আবার অরুণাই বলিল—ভেবেছি আপনাকে চিঠি লিখি। কিন্তু—।

কিন্তু বলিয়াই থামিয়া গেল, বাকি কথাটুকু আপনি বাহির হইয়া আসার মতো

ভাব যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। একটি শিশিরবিন্দুর খানিকটা খসিয়া পড়িল—বাকিটা যেন পাতার প্রান্তে লাগিয়া রহিয়াছে—দুলিতেছে।

হঠাৎ স্বর্ণ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। ডাকিল—অরুণাদি!

—অ্যাঁ।

—আপনি কি—আপনি কি ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে জয়তারা আশ্রমে যাবেন?

এতক্ষণে অরুণা, শুধু অরুণাই নয়, দেবকী সেন, ন্যায়রত্ন—এমন কি গৌরেরও খেয়াল হইল তাহারা শিক্ষয়িত্রীদের বাসার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। জয়তারা আশ্রমের পথিক এবং বাসার লোকের পথ এইখান হইতেই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পথ ভাঙিতে হইবে। অরুণা বলিল—ন্যায়রত্নকেই বলিল—আমি যাই।

এতক্ষণে ন্যায়রত্ন বলিলেন—এস। তারপর ডাকিলেন—সেন!

দেবকী আগাইয়া আসিয়া বলিল—চলুন।

সন্ধ্যার প্রারম্ভ, কিন্তু অন্ধকার ঘন গাঢ় হয় নাই। পশ্চিমের আকাশে খানিকটা মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ছোট-বড় টুকরা হইয়া ছড়াইয়া ছিল—সেগুলিতে অস্তগত সূর্যের ছটার রেশ তখনও জাগিয়া রহিয়াছে। ধ্বনির শেষে প্রতিধ্বনির মতো—আলো খানিকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। দুটি মানুষ পূর্বমুখে চলিয়াছে—অরুণা দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ মেঘের আলো মুছিয়া গেল। অন্ধকারটা সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় হইয়া উঠিল—মানুষ দুটিকে আর দেখা গেল না।

গৌর বলিল—চলুন এইবার।

স্বর্ণ খানিকটা আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে একটা অধীরতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অরুণা গৌরের ডাকে সচেতন হইয়া বলিল—চল। স্বর্ণ কই?

—এই যে।

—ও।

—আপনি ওঁর সঙ্গে গেলেই বোধহয় ভাল করতেন।

—ওঁর সঙ্গে আশ্রমে?

—হ্যাঁ। এখানে আপনার অনেক অসুবিধে হবে।

—অসুবিধে হবে? বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না অরুণার। এ কি বলিতেছে স্বর্ণ? দীর্ঘ তিন বৎসরের উপর সে এখানে চাকরি করিতেছে। এই বাসাই তাহার ঘর হইয়া উঠিয়াছে—এখানে হঠাৎ আজ অসুবিধা হইবে কেন? তাই 'অসুবিধা হবে' কথাটা সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার প্রশ্ন করিল—অসুবিধে হবে কেন? আমার বাসায় কি কেউ রয়েছে?

অর্থাৎ দলের কোন কর্মী কি রহিয়াছে সেখানে?

স্বর্ণ বলিল—না। এখানকার যারা, তারা রামসেবকের ওখানে। ঘর আপনার কেউ নাড়েনি। তবে—।

—তবে কি?

—দেখবেন ? ঘরের তালায় হাত দিয়া স্বর্ণ বলিল—হেঁয়ালির মতোই বলিল—দেখবেন ?

*　　　　*　　　　*

চাপা কথাটা চাপিয়া রাখার জন্য বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেই তাহার ঝাঁঝের তীব্রতায় অরুণা যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল—অন্তরে অন্তরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—সেটা ঘটিল এইভাবে। বাড়িতে আসিয়া সহজ স্বরেই অরুণা বলিল—দাঁড়াও ভাই, আগে গা-হাত-মুখ ধুয়ে ফেলি। বাবা—ট্রেনে যা কয়লার গুঁড়ো খেয়েছি!

সুটকেশ খুলিয়া কাপড়-গামছা-সাবান লইয়া কুঁয়াতলার পাশে স্নানঘরের দিকে যাইতে যাইতেও অরুণা বলিল—স্টোভটা ধরিয়ে একটু চা কর ভাই স্বর্ণ।

—আপনি চা খাবেন ? স্টোভ ধরাব ?

—এলাম বলে আমি। দেরি হবে না আমার। তুমি তৈরি কর।

—কিন্তু এই সব বাসনে—আমার হাতে আপনি খাবেন তো ?

—কি বলছ তুমি স্বর্ণ ? অরুণা প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উচ্চকণ্ঠেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

—আপনি যে কেঁচে গণ্ডূষ করে বসেছেন অরুণাদি। ঠাকুরমশায়ের বিধবা নাতবউ সেজেছেন নতুন করে। থান কাপড় পরেছেন, হাত খালি করেছেন, একাদশী করেছেন—এর পরও আপনি—

অরুণার কাছে এমনি অকল্পিত, এমনি অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নগুলি—এবং এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি এমনই তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র ও জ্বালাকর কোন রসায়ন-মাখানো যে অরুণা মুহূর্তে যেন হতচেতন হইয়া গেল। অন্তরে অন্তরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল সে, কিন্তু মুখে একটি শব্দও বাহির হইল না।

স্বর্ণ বলিল—মাথার চুলগুলি কেটে ফেললেই আর অঙ্গহীন থাকত না—ষোল আনা পুরো হয়ে যেত। তাহার মুখে তীব্র হাসি খেলিয়া গেল। সে বলিল—আসলে আপনারা ব্রাহ্মণ—বৈদ্য ব্রাহ্মণ। এরা হলেন ধর্মজগতের অভিজাত—মাথার মণি, আপনাদের পক্ষে এগুলো ছাড়া শক্ত, কিন্তু ছি-ছি অরুণাদি—আপনি শেষে এমনি উল্টোবাজি খাবেন এ কেউ ভাবেনি। আমি তো ভাবতেও পারিনি।

অরুণা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আমি আসছি স্বর্ণ। স্নান করে আসছি। গৌর ততক্ষণে তুই স্টোভটা ধরিয়ে জল চড়িয়ে রাখ না ভাই।

ইহার আগে দরবারী শেখ কথাটা কদর্য অশ্লীলতার সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিল। অরুণা দরবারীকে জানে এবং ইংরাজের পুলিশ বিভাগের এদিক দিয়া শিক্ষার কথাও তাহার কাছে অবিদিত নয়—তাই ও-কথাটা সে ধরে নাই। ইহার জন্য মনের সকল ক্ষোভটুকু ইংরাজের উপর ও ইংরাজের পুলিশের উপর পড়িয়াছে। বাহির হইয়া আসিয়া সে ন্যায়রত্নকে দেখিয়া তাঁহার কাছেই আগাইয়া গিয়াছিল—সুরপতির মুচকি হাসি,

রণদাবাবুর মুচকি হাসি, দেবকী সেনের বিস্ময়, স্বর্ণের বিচিত্র বহু প্রশ্ন-রেখাঙ্কিত মুখ ও দৃষ্টি কোনদিকেই লক্ষ্য করে নাই। এমন কি আসিবার পথে সকলেই যে নীরব হইয়া পথ চলিতেছিল, তাও সে খেয়াল করে নাই।

এতক্ষণে স্বর্ণ কথাটা অতি তীব্রভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। স্নান সারিয়া অরুণা আসিয়া বসিয়াই বলিল—চা করিসনি গৌর? স্বর্ণ বারণ করেছে বুঝি?

—করেছি।

অরুণা চায়ের জল নামাইয়া তাহাতে চা ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল—চায়ের চেয়ে জলই বোধ হয় বেশি ভাল লাগবে। একগ্লাস জল ঢালিয়া লইয়া সে জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া বলিল—আঃ।

স্বর্ণ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে বলিল—এসব কি আমাকে দেখিয়ে করছেন অরুণাদি?

—তুমি এমন রুক্ষ তপ্ত আগুন হয়ে উঠলে কেন বলতো স্বর্ণ? বলিয়াই বলিল—ও তোমার রাগের কারণ হল, আমি থান কাপড় পরেছি, হাতের চুড়ি খুলেছি, একাদশী করেছি—

স্বর্ণ মাঝপথেই বাধা দিয়া বলিল—সে আপনি দুনিয়াকে দেখিয়ে করেছেন। লোকে তার জন্যে মুচকে মুচকে হেসেছে। দরবারী শেখের কথাও আমার কানে এসেছে। এ নিয়ে এর মধ্যে লোকে কথা বলছে। সে নিয়ে জিজ্ঞাসা তো আপনাকে আগেই করেছি আমি। যা নিয়ে জীবন শুরু করলেন, যার জন্যে শপথ নিলেন, যার জন্যে বিশ্বনাথ-বাবুর সঙ্গে আপনি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেন, সে সব আপনি হঠাৎ ভাসিয়ে দিয়ে—এ কি করলেন? তারপর আবার একাদশী করেও আমাকে দেখিয়ে জল খেলেন—চা খাবেন; এ কি?

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল অরুণা। তারপর ধীর শান্তকণ্ঠে বলিল—আমি একটা খুব বড় আঘাত পেয়েছি স্বর্ণ।

—জানি—

—না জান না।

—জানি না? স্বর্ণ হাসিল।—আঘাত যে খেলেন ন্যায়রত্নমশাইকে আঘাত করতে গিয়ে—শেষে বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে নিজে আছাড় খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

—না স্বর্ণ। সে নয়। সমর ঘোষ আজ বছরখানেক ধরে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তার দাবীর কাছে আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু—

—এর মধ্যে কিন্তু কি আছে অরুণাদি? বক্র হাসিয়া স্বর্ণ বলিল—কিন্তু তো—সেই আপনি বৈদ্য-ব্রাহ্মণের মেয়ে—ন্যায়রত্ন মশায়ের মতো পুণ্যবান ব্রাহ্মণের পৌত্রবধূ আপনি, বিধবা হয়ে আপনি কি করে সমর ঘোষকে বিয়ে করবেন?

অরুণা স্থিরদৃষ্টিতে স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আমাকে বার বার আঘাত করতে চাচ্ছ স্বর্ণ!

স্বর্ণ বলিল—সত্য কঠোরই হয় অরুণাদি, আর কঠোর যা—তার সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই

আঘাত পেতে হয় অনিবার্যভাবে। আঘাত তো আমি আপনাকে দিইনি অরুণাদি, সমর ঘোষের ভালবাসাকে এইভাবে অন্ধ সংস্কারের বশে অপমান করেছেন—তাতে আপনি নিজেই নিজেকে আঘাত করছেন--অপমান করছেন। আমি না।

—সমর আমাকে ভালবাসে। কিন্তু আমি যে তাকে ভালবাসিনা স্বর্ণ। তার দাবী আমি মানব কি করে ?

—কি বলছেন আপনি ? স্বর্ণ সোজা হইযা বসিল।—শেষে আপনি মিথ্যে বলতে আরম্ভ করলেন অরুণাদি ?

—স্বর্ণ। অরুণার কণ্ঠস্বরে এবার তিরস্কার বাজিয়া উঠিল।

—ধমক দিয়ে তো আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না অরুণাদি। হাসিযা বলিল —কারই বা পারবেন। এ-কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন ?

—বিশ্বাস আমি কাউকে করতে বলব না স্বর্ণ। আমার বিশ্বাস—আমার অন্তরের সত্যকে আমি এতদিনে আবিষ্কার করেছি। আমি তাকে ভালবাসি না।

—আবিষ্কারটা অভিনব অরুণাদি। আজ দু-বছর মাসে চারখানা করে অন্তত ছিয়ানব্বইখানা পত্র আপনি তাকে লিখেছেন—সেও আপনাকে লিখেছে, কতক আমি দেখেছি—আপনিই দেখিয়েছেন। এরপর এ আবিষ্কার অভিনব।

—অভিনব বল—আপত্তি করব না, কিন্তু এ আবিষ্কার সত্য। একটু শান্ত হয়ে যদি আমার কথা শোন স্বর্ণ, তবে হযতো বুঝতে পারবে। যে খাদ্য খেতে সারা দেহটা পাক দিয়ে ওঠে স্বর্ণ, উপবাসে থেকে মানুষ সেই খাদ্যের জন্য লালায়িত হয়ে তারই দিকে হাত বাড়ায়—তবে সেটা হল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ক্ষুধার তাড়নার পরিচয়। সেটা তার রুচির পরিচয় নয়।

—তার মানে ?

—আরও ভেঙে বলতে হবে স্বর্ণ ? আমার বয়স তো তোমার চেয়ে বেশি নয় ভাই। আমার দেহের ক্ষুধা আছে, এ কথা বলতে লজ্জা আমার নাই। দেহের ক্ষুধায় মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল—আমি সমরের চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তাঁকেও ভুলতে পারছিলাম না। নইলে অনেক দিন আগেই সমরের হাতে নিজেকে তুলে দিতাম। তুমি জান না স্বর্ণ- তুমি জান না। মনের মধ্যে সে কি যুদ্ধ ! সমরকে চিঠির উত্তর লিখেছি সম্মতি দিয়ে—চিঠি লিখে উঠে মনে হয়েছে—সমস্ত বুকের ভেতরটা আমার চরম সর্বনাশ হযে গেছে—আমি কেঁদেছি। অকারণে কেঁদেছি। কেঁদে তৃপ্তি পাইনি। রাতে তাঁকে স্বপ্ন দেখেছি। সকালে উঠে সমরকে চিঠি লিখেছি—না, চিঠি লিখে উঠে মনে হযেছে এ দুনিযার সব তেতো—সব বিস্বাদ, ইচ্ছে হয়েছে সমস্তকিছুতে আগুন ধরিয়ে দি। ইস্কুলে মেয়েদের অকারণে বকেছি। মেরেছি। তোমার সঙ্গে—দেবুবাবুর সঙ্গেও কথান্তর হয়ে গেছে। এ সবের ভেতরের কথা জানতে না—কিন্তু আমার এই অবস্থার কথা তো তোমার জানা। কতদিন বলেছ – আপনার ঘাড়ে একটা ভূত চাপে অরুণাদি –সেটা কখনও কাঁদায়, কখনও রাগায়। স্বর্ণ, ভূত ওটা বটে—কিন্তু সে ভূত কি কোনদিন হাসিয়েছে আমাকে ?

স্বর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে বিস্ময় ক্ষোভ হয়তো বা ক্রোধও ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু অরুণার কথার প্রতিবাদ করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। অরুণা যাহা বলিয়াছে—তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ দুই বৎসর অরুণা এখানে আসিয়াছে, দুই বৎসরের মধ্যে অরুণা কোন উল্লাসে হাসিয়া উঠে নাই। কখনও ছড়াইয়াছে আগুন—যে কোন উপলক্ষ লইয়া হোক না কেন—সে যখন প্রতিবাদ করিয়াছে তখন তাহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় অগ্নিশিখার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভাষায় জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। তাহার মুখের কপালের রঙে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে উত্তাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর সমস্তকিছুর উপর ঘৃণা ও বিরক্তি—পৃথিবীর কাছেই সে অসহনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহাকে ভয় করিয়াছে। কখনও বা অরুণা এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, না কাঁদিলেও তাহাকে দেখিয়া স্বর্ণের কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এমন ঘটনা একটিও স্বর্ণ স্মরণ করিতে পারিল না—যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া অরুণা উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি যে সমরের কথা স্বর্ণ বলিল—সেই সমরের উপস্থিতি উপলক্ষেও নয়। সমর এখানে কয়েকবারই আসিয়াছে। দলের কাজ লইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাই তাহার আসিবার মুখ্য কারণ, না অরুণার সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যটাই মুখ্য—সেটা কেউই হলফ করিয়া বলিতে পারে না। অরুণা সমরের সঙ্গে নদীর ধারে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাটাইয়া আসিয়াছে। ঘরে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতির চর্চা করিতে গিয়া তর্ক করিয়াছে। কতদিন রাত্রে স্বর্ণের পাশের বিছানায় শুইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে। সমর আসিলে সমর এবং দেবু একটা বাসায় শুইত। স্বর্ণ ও অরুণা থাকিত একটা বাসায়। গভীর রাত্রে স্বর্ণের ঘুম ভাঙিয়া কোনদিন দেখিয়াছে অরুণা আলো জ্বালিয়া বই লইয়া বসিয়া আছে, অথবা কিছু লিখিতেছে, কোনদিন অন্ধকারে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিয়াছে। নিদ্রাহীনতার অধীরতায় অশান্তভাবে পাশ ফিরিয়া শুইতে দেখিয়াছে। একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বর্ণ সেদিন প্রশ্ন করিয়াছিল ঘুম আসছে না অরুণাদি ?

—নাঃ। পাশ ফিরিয়া শুইয়া হঠাৎ আবার পাশ ফিরিয়া অরুণা বলিয়াছিল—আমি আর পারছি না স্বর্ণ!

এই কিছুদিন আগেও—মাস চারেক আগে সমরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার সময় স্বর্ণ অরুণাকে বলিতে শুনিয়াছিল—মন আমি স্থির করেছি। তুমি শুধু চাকরি দেখ—তোমার আমার দুজনের চাকরি কলকাতাতে।

তখন গভীর রাত্রি। কর্মীরা সাধারণত যাওয়া আসা করে রাত্রের ট্রেনে। এখান হইতে যে ব্রাঞ্চলাইনটা মাইল পঞ্চাশেক আগে চলিয়া গিয়া আবার মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে সেই ব্রাঞ্চ লাইন হইয়া খানিকটা ঘুরিয়া যাতায়াত করে। তাহাতে নজর খানিকটা কম পড়ে। সেদিন দেবু ও গৌর দুজনে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া সমরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল—সমর ও অরুণা অরুণার বাসার দরজার মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। স্বর্ণ এবং অরুণার বাসার মাঝখানের পাঁচিলের এপাশে দাঁড়াইয়াছিল

স্বর্ণ, কথাগুলি সে স্পষ্ট শুনিয়াছিল। সমর বাড়ি হইতে বাহির হইবার মুখে অরুণা আবার ডাকিয়াছিল—শোন।

সমর ফিরিতেই আবার বলিয়াছিল—কিন্তু জানুয়ারীর আগে না।

—কেন ? আবার জানুয়ারীর খোঁচা কেন ?

—কারণ আছে বইকি ! ডিসেম্বরে স্কুলের পরীক্ষা। জানুয়ারিতে নতুন সেসন। এ সময়ে চাকরি ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—বেশ তো, ছাড়বে না। ততদিন থাকবে।

—হ্যাঁ। এখানে থাকতে আমি—

—কি ?

—ততদিন অপেক্ষা কর সমর—করতেই হবে।

স্বর্ণ এ পাশে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল, এই কথার পরই সে দরজা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিয়াছিল। পরদিন সকালে স্বর্ণ হাসিমুখে রসিকতা করিবার ইচ্ছা লইয়া মনে অনেক কথা তৈয়ারি করিয়া অরুণার বাসায় গিয়া অরুণাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মেঝের উপর অরুণা শুইয়াছিল। শুইয়াছিল নয়—পড়িয়াছিল। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিয়াছিল—কি হল অরুণাদি ?

—মাথা ধরেছে।

—অ্যাসপ্রো খাননি কেন ? পরশু তো আনিয়েছেন। ওই তো টেবিলের উপর রয়েছে।

—না।

—না নয়, উঠে খেয়ে ফেলুন। মেঝেয় শুয়েই বা কেন ?

—ঠাণ্ডা ভাল লাগছে।

—জ্বর হয়নি তো ?

—না, আমায় একটু ঘুমুতে দাও স্বর্ণ। ঘুম হলেই সব সেরে যাবে। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। যাহার সুস্পষ্ট অর্থ—তুমি যাও স্বর্ণ, তুমি যাও।

সেদিন দশটায় সে ইস্কুলেও যায় নাই। বুড়া পণ্ডিতকে লইয়া স্বর্ণ ইস্কুল চালাইতেছিল। হঠাৎ বেলা সাড়ে-বারোটা একটার সময় অরুণা আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বাকি দিনটা সামান্য ছুতায়-নাতায় বকিয়া-ঝকিয়া আগুন ছড়াইয়া গোটা ইস্কুলটাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একটা ছোট মেয়ে বুড়া পণ্ডিতের চটের থলি হইতে ওল চুরি করিয়া—তাহাতে কামড় মারিয়া এক কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সে এক কাণ্ড। সকলে হাসিয়া সারা। প্রবালের মতো রঙের এমন একটি নরম সরম সামগ্রী যে আস্বাদনে এমন মারাত্মক হইতে পারে সে কথা বেচারা ভাবিতেও পারে নাই। তাহার ফলে—কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটির ঠোঁট জিভ ফুলিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যাপারটা অর্থাৎ ওল চুরির সত্য ও তত্ত্বটা প্রকাশিত হইতে পড়িয়াছিল হাসির পালা। মেয়েটাকে তেঁতুল চুষিতে দিয়া স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে অফিসে অরুণাকে সংবাদটা দিতে গিয়াছিল। অরুণা কিন্তু হাসে নাই। কঠিন দৃষ্টিতে অন্যদিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে

বলিয়াছিল—পণ্ডিতমশাইকে মুখে বলে সাবধান করা গেল না। ওঁকে আমি written warning দিতে চাই স্বর্ণ। কোনদিন থলির ভিতর তামাক নিয়ে আসবেন। কোনদিন মেয়েদের বলবেন বাড়ি থেকে শাক আনতে—কোনদিন অন্য কিছু,—এ আমি সহ্য করব না।

স্বর্ণ বলিয়াছিল—না-না-না। বুড়োর ওপর রাগ করবেন না। ভারি ভাল লোক।

—হয়তো ভাল লোক। কিন্তু কি ব্যাপারটা হল বল তো?

—কি হল? হাসির ব্যাপার। 'ওল খেয়ো না ধরবে গলা'—মেয়েরা পড়েছিল—চোখে দেখলে।

অরুণা চুপ করিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছিল।

স্বর্ণ বলিয়াছিল—আপনি একটু হাসুন অরুণাদি।

অরুণা স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিল স্থির দৃষ্টিতে। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি, মনে হয় যেন অর্থহীন, অথবা এত গভীরে সে অর্থ নিহিত যে সে অর্থ অন্যের বোধের অগম্য।

কথাগুলা আজ মনে পড়িয়া গেল স্বর্ণের। অরুণা মিথ্যা কথা বলিতেছে না। সে কখনও হাসে নাই। কান্নার কথাটাও সত্য। অন্যে না জানুক স্বর্ণ জানে। গভীর রাত্রে সে দেওয়ালের এপাশে থাকিয়া কান্নার শব্দ শুনিয়াছে, সকালে উঠিয়া অরুণার চোখের কোণে কালি দেখিয়াছে। স্ফীতি দেখিয়াছে। মুখ ধুইলেও ও দুইটা চিহ্ন ধুইয়া যাইত না।

অরুণা বলিল—যেদিন দাদু এলেন—সেদিন কঠিন আক্রোশে তাঁর অপমান করতে গেলাম। সংকল্প করে রেখেছিলাম আগে থেকেই। তোমায় বা দেবুবাবুকেও বলিনি। যখন তাঁর সঙ্গে এখানে এসেছিলাম বন্যাপীড়িতদের সেবা করতে—এখানকার অবস্থা দেখতে—তখন দাদু যে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন—তাঁর নাতির গলায় পৈতে না দেখে, আমার হাত ধরে সস্নেহে সপ্রেমে টানতে দেখে—তারই ফলে তিনি তাকে পরিত্যাগ করে, সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে কাশী চলে গেলেন। আমার মনে হয়েছিল—এত বড় অপমান আমাকে আর কেউ করেনি। উনিও কম বেদনা, কম দুঃখ পাননি—সেও আমি ষোল আনা মেনে নিয়েছিলাম। একবারও বিবেচনা করিনি ওঁরাও দুজনে—একজন পিতামহ অন্যজন পৌত্র। থাকগে। মানুষের অহংকারটা তো আর কিছু নয়—নিজেরই অহংকে সর্বস্ব করে দেখা। তাই দেখেছিলাম আর কি।

একটু চুপ করিয়া বলিল—গৌর তুই ভাই দুটো মিষ্টি কিনে আনবি। আর কিছু ফল। ফল মানে কলা—আর ঠাণ্ডা যদি কিছু পাস, শাকালু বা যাকে তোরা সরবতি বলিস—পারিবেনে?

গৌর চলিয়া গেলে অরুণা আবার বলিল—প্ল্যাটফর্মে আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা আর কেমন করে সে সম্পর্ক হয়েছিল—মানে মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছিলাম আমরা—কথাটা যখন বলতে গেলাম স্বর্ণ, তখন হঠাৎ আমার মনে হল কি জান? মনে হল—তিনি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর দাদুর পাশে, চোখে তাঁর আগুনের মতো দৃষ্টি। আমাকে

ভ্রম হয়েছিল ভাই—দাদুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তিনি নয়। দাঁড়িয়েছিল অজয়। স্বর্ণ, প্রথম যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন তিনি, ক্লাসে পাশা-পাশি বসতেন আমার দাদার সঙ্গে। দুজনের বন্ধুত্ব হল—দাদা নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে আমাদের বাড়ি। তখন আমি ছোট, খুব ছোট, সাত-আট বছর। তবু তাঁর সে চেহারা আমার মনে আছে। অজয়কে দেখলাম—অবিকল সেই তিনি। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। মনের সত্য দেহের ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে—নিজেকে জানিয়ে দিলে। বলে দিলে—মা যদি হতে পার ওই অজয়ের, তবে তোমার মনের সত্য সার্থক হবে। ওতেই মিটে যাবে দেহের ক্ষুধা, শোণিত হবে অমৃত—

স্বর্ণ বাধা দিল এইবার—থাক অরুণাদি। আমায় এতসব কথা বলে লাভ কি বলুন।

—লাভ আর কি? এতদিন মনের কথা মনে চেপে রেখে তৃপ্তি পাইনি—শান্তি পাইনি, বলবার মতো প্রবৃত্তিও ছিল না—হয়তো সাহসও ছিল না স্বর্ণ। আজ—

—আজ আপনার সাহস হয়েছে, প্রবৃত্তি হয়েছে, বলে আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন—শান্তিও পাবেন। আরও অনেক কিছু পাবেন অরুণাদি। কিন্তু তবুও বলব—ছি-ছি-ছি। আপনি হেরে গেছেন। শুধু হেরে গেছেন নয় অরুণাদি—আপনি কি বলছেন তা পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি বললেন—অজয়ের মা হলে আপনার মনের সত্য সার্থক হবে- তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহের ক্ষুধা মিটবে, শোণিত হবে অমৃত। আরও হয়তো অনেক কিছু হবে—সে বলবার আগেই আমি বাধা দিয়েছি। সন্তান নিজে প্রসব না করলে শোণিত অমৃত হয় না। হলেও কিছুদিন পরেই আবার সে অমৃত সেই শোণিতেই পরিণত হয়। আবার ক্ষুধা জাগে। আপনার মনের সত্য আপনার মন-গড়া। মনগড়া সত্যকে সার্থক করতে আপনি জীবন-সত্যকে মিথ্যে করে দিয়েছেন। বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

অরুণা ডাকিল—স্বর্ণ। স্বর্ণ! তাহার অধরে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বাহির হইতে স্বর্ণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?—কে? নেলো?

নেলোর মৃদুস্বর শোনা গেল- হ্যাঁ।

—কি? কি দরকার?—অ—পুতুল! পুতুল দিতে এসেছিস?

-না। ও একজনার বরাতি জিনিস। বড়-দিদিমণিকে একটা কথা বলতে এসেছি। স্যানমশাই বলে দিলেন।

—কে?

--স্যানমশাই। দেবকী স্যান। কাল সকালে নদীর ঘাটে ঠাকুরমশাই চানে আসবেন দিদিমণিকে বলে দিলেন—পারেন তো ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে যেন দেখা করেন।

স্বর্ণ হাসিল। হাসির শব্দ অরুণা স্পষ্ট শুনিল। ইহার পর দরজা বন্ধ করার শব্দ হইল। স্বর্ণ নিজের বাড়িতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। নেলো ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইল। অরুণা বলিল—আমি সব শুনেছি নলিন।

নলিন নীরবে পুতুলটি নামাইয়া দিয়া সর্বাঙ্গে একটা অস্বস্তিকর ভঙ্গি ফুটাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে দাঁড়াইল। সে বোধহয় আরও কিছু বলিবে।

অরুণা বলিল—আর কিছু বলছ?

নলিন বলিল—আপনার—

—কি বল।

—আপনি স্বর্ণদিদির কথা শুনবেন না। ও এত রেগেছে কেন জানেন? ও নিজে—

বাধা দিয়া অরুণা বলিল—নলিন! ছি!

নলিন যাহা বলিতে চায় তাহা সে বুঝিয়াছে। স্বর্ণ নিজে বিধবা হইয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া অমনধারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

তুমি যাও নলিন!

নলিন চলিয়া গেল।

অরুণা আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হয়তো খানিক সত্য নলিনের কথার মধ্যে আছে। কিন্তু অরুণা তো জানে—যে সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বর্ণ এমন জোর করিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল—সে সত্যের, সে বিশ্বাসের ভিত্তি কত দৃঢ়। দেবু বলিলেও স্বর্ণ শুনিবে না।

মানুষের জীবনে এক এক সময় অকস্মাৎ একটা আবেগ আসে—ভূমিকম্পের মতো পাহাড়ীয়া নদীতে ধবসিয়া-পড়া তুষার-বিগলিত জলোচ্ছ্বাসের মতো—সব ভাঙিয়া চুরিয়া জীবনকে একটা নূতন রূপ দিয়া যায়। তেমন আবেগ যখন আসে তখন সে মত্ত উন্মত্ত হইয়া কোন কিছুর বাধা মানে না—কিছুতেই লজ্জা থাকে না, ঘৃণা থাকে না—তেমনি আবার বিপরীত শান্ত স্থির প্রসন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে রূপান্তরিত নবজীবনে। সে তাহার জন্য কাহাকেও দোষী করে না—নিজেকেও দোষ দেয় না। অরুণার অবস্থা সেই রূপান্তরিত অবস্থা। জীবনে তাহার প্রচণ্ড কম্পন বহিয়া গেছে। সে কম্পন কেমন করিয়া আসিল সে কথা সে জানে। কিন্তু কোথায় ছিল এত আবেগ তাহা সে কল্পনা করিতে পারে না।

স্বর্ণ বলিয়াছে, অরুণাও অস্বীকার করে না—বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার জন্য বেদনা বহন করিয়াও বাহিরে সে কোনদিন এ বেদনার বহিঃপ্রকাশকে বড় হইতে দেয় নাই। বৈধব্যকে জীবনের আচরণে ব্যবহারে ফুটাইয়া তুলিতে চায় নাই—দেয়ও নাই। সে বৈধব্যের প্রচলিত বিধিকে অন্যায় অহেতুক বলিয়া মনে করিয়াছে। ভাবিয়াছিল—সে নিজেও ভাবিয়াছিল, তাহার অন্তরঙ্গ জনেরাও ভাবিয়াছিল—সময়ের ব্যবধানে মন স্বাভাবিকভাবে বিশ্বনাথকে বিস্মৃতির আবরণে আবরিত করিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিবে। নিঃশেষিত পুষ্পফলরিক্ত গাছের জীবনে বৎসরান্তে আবার আসে যেমন নব বসন্ত—তেমনি তাহার জীবনেও আসিবে নূতন বসন্ত। তাহার জীবনে সেই নিয়মের গতিরও কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ধীরে ধীরে আর একজনের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক মাস আগেও বলিয়াছিল—"আর না। এর শেষ করে ফেলব

এইবার। তুমি ব্যবস্থা কর।" সবই স্থির ছিল। কল্পনাও সে অনেক করিয়াছিল। এই সামান্য শহর ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইবে, মহানগরীর এক কোণে-খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া নীড় বাঁধিবে—জীবনব্রতের বিপুল বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে নূতন আবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শুধু সে বুঝিতে পারে নাই বিশ্বনাথকে সে কতখানি ভালবাসিত। বিশ্বনাথ তাহার জীবন কতখানি জুড়িয়া আছে।

সেদিন প্ল্যাটফর্মের উপর প্রচণ্ড একটা আক্রোশ লইয়া ন্যায়রত্নের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার হাত ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া যে দৃষ্টিতে ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের দিকে তাকাইয়াছিলেন—সে-দৃষ্টি তাহার বুকে বিষাক্ত শলাকার মতো বিঁধিয়াছিল। তাহার জ্বালা সে কোনদিন ভুলিতে পারে নাই। মানুষ ভুলিতে পারে না, সচেতন ভাবে পুষিয়া না রাখিলেও তাহার অজ্ঞাতসারে মূলজ উদ্ভিদের মতো অন্তরে অন্তরে বাঁচিয়া থাকে; সুযোগ মিলিলে কোনদিন সে পাথর ফাটাইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ন্যায়রত্নের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের উপর সাক্ষাতের ক্ষণটি ছিল সেই ক্ষণ। কিন্তু কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিল সে। কথা বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল অজয়ের মুখের উপর। সে কি হইয়া গেল! ষোল-সতের বৎসর বয়সের কিশোর অজয়। সে কি অজয়। বহুদিন পূর্বে অরুণার দাদা সেবার ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছে অরুণার বয়স তখন দশ কি এগার। একদিন অরুণার দাদা অবিকল এমনি এক কিশোরকে তাহাদের বাসায় লইয়া আসিল। সে দিনটি তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া আছে। তাহার দাদা তাহাকে বলিয়াছিল—বিশুকে তুই গান শুনিয়ে দে।

সে বলিয়াছিল- না। দাদার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। তাহার বন্ধু হইলেই কি তাহাকে গান শুনাইতে হইবে।

দাদা বলিয়াছিল—বিশুও শোনাবে তাহলে।

—উনি গান গাইতে পারেন?

—গান না, সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করে শোনাবে, সে তোর গানের চেয়ে অনেক ভাল।

সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করিবে- এইটুকু ছেলে তাহার দাদা ফার্স্টক্লাশ অর্থাৎ সংস্কৃত লইয়া হিমসিম খাইয়াছে, অনুস্বার বিসর্গযুক্ত ভাষাটাকে একখানা এবড়ো খেবড়ো পাথরের মতো শক্ত মনে হইত। দাদা ক্রমাগত মুখস্থ করিত কস্মিংশ্চিত কস্মিনশ্চিত কস্মিন্‌শ্চিত বনোদ্দেশে বনোদ্দেশে—এঁ্যা এঁ্যা কস্মিনশ্চিত কস্মিন্‌শ্চিত। সেই ভাষায় কাব্য আবৃত্তি করিবে এবং সেই আবৃত্তি তাহার গানের চেয়েও ভাল লাগিবে। হঠাৎ মনে হইয়াছিল, তাহার দাদা নিশ্চয়ই এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে দিয়া হাস্যকর কিছু শুনাইবার জন্য এমন ভণিতা করিতেছে। দাদার গম্ভীরভাবে রসিকতা করার স্বভাব তো তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না। ছোট পকেট আয়না কিনিয়া আনিয়া দাদা বলে—এই অরুণা—আজ একটা বাঁদর পেয়েছি র।

—বাঁদর। কই? কোথায়?

—আছে। আছে।

—মিথ্যে কথা।

—তোর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি—সত্যি কথা।

—কোত্থেকে কিনলে? টাকা কোথায় পেলে?

—কিনতে হয়নি, ভগবান দিয়েছেন।

—কই? দেখাও।

—চোখ বোজ। আমি নিয়ে আসি।

অরুণা চোখ বন্ধ করিবার পরই দাদা বলিত—দেখ এইবার।

চোখ খুলিয়া অরুণা দেখিত—তাহার মুখের সামনে ছোট আয়নাখানি। দাদা বলিত, বাঁদর নয় বাঁদরী। আয়নার মধ্যে দেখ। দেখ দেখ, কেমন দাঁত বের করেছে।

অরুণার সর্দি হইলে দাদা হঠাৎ বলিত—দুটো নাম বের করেছি অরুণা। তোর একটা আমার একটা। বুঝলি, এ নাম পাল্টে নেব ঠিক করেছি।

—নাম? কি নাম?

—একটা হল 'থাস্ কি'? আর একটা হল 'সিক্‌নি'।

—যাঃ। ওই নাম কি হবে?

—হবে। তোকে যখন সকলকে না জানিয়ে ডাকব—তুই যখন আমাকে কাউকে না জানিয়ে ডাকবি, তখন কি মজা হবে বল তো। কেউ বুঝবে না, অথচ আমরা বুঝব।

সে ভাল হবে।

—তাহলে কোন নামটা তুই নিবি বল? 'সিক্‌নি'?

—ও! আমার সর্দি হয়েছে বলে ঠাট্টা হচ্ছে!

—বেশ তো—তা হলে—আমার নামই 'সিক্‌নি'!

হ্যাঁ-হ্যাঁ। সিক্‌নি-সিক্‌নি—তুমি 'সিক্‌নি'।

—তা হলে অভ্যেস করে নে। আগে আমি ডাকি—তারপর তুই সাড়া দিবি। আমি তোর নাম ধরে ডাকব, তুই আমার নাম ধরে সাড়া দিবি। আচ্ছা—এই থাস্ কি।

—সিকনি।—না বুঝিয়াই উত্তর দিত অরুণা।

থাস কি?

—সিকনি।

—কি বললি? কি থাস?

অরুণা এবার বুঝিয়া হাউমাউ করিয়া উঠিত।

সেই দাদা তো! অরুণা উৎসাহিত হইয়া গান গাহিয়া শুনাইয়া বলিয়াছিল—কই এইবার ওঁকে বল সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করতে! হাসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সে—মনে মনে পুরোহিত মহাশয়ের বিড়বিড় বজবজ মন্ত্রোচ্চারণ করার স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল। মুখ গুঁজিয়া হাসিবার জন্য উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অবাক হইয়া গেল।

বিশু বলিল—রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি করছি।

রঘুবংশ?—মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ! এইটুকু ছেলে—তাহার সবিস্ময় চিন্তা

স্তম্ভিত হইয়া গেল পরের মুহূর্তে। এইটুকু ছেলেটি শুরু করিল—রঘুপতি ভগবান রামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে—লঙ্কার যুদ্ধ শেষে উদ্ধার করে নিয়ে পুষ্পকরথে আরোহন করে ফিরছেন। বনবাসের কালও উত্তীর্ণ হয়েছে। ফিরছেন অযোধ্যাভিমুখে। রথ—পুষ্পক-রথ আকাশমার্গে উঠেছে সশব্দে। নিচে দেখা যাচ্ছে সসাগরা ধরিত্রী। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু সমুদ্র। রামচন্দ্র সেই শোভা দেখে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন—সেই বিমুগ্ধতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি প্রিয়তমা জানকীকে ডেকে বললেন—বৈদেহি। দেখ।—বলিয়া কথার শেষ ছেদ টানিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করিল গানের মতো সুর করিয়া—প্রায় গান গাহিয়া আবৃত্তি—

"বৈদেহি। পশ্যা মলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম।
ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্।"

বিশ্বনাথ গান শিখিতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ছিল বড় মধুর। যেমন গম্ভীর তেমনি মধুর ঝঙ্কারময়। আর এই পিতামহের শিক্ষায় হয়তো বা বংশ-রক্তের গুণেও সংস্কৃত কবিতা এমন অপরূপ আবৃত্তি করিত যে—শ্রোতার মনেই শুধু নয়—তানপুরার গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনির মতো সমগ্র স্থানটিতেও একটা মোহের সঞ্চার হইত। শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গেল। একটানা দীর্ঘায়িত সুরধ্বনি যেন বাজিয়া বাজিয়া চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে থামিয়া সহজ সুরে কিন্তু ওই সঙ্গীতের সঙ্গে ভাষায় ভঙ্গিতে ভাবে আশ্চর্য সমতা এবং সঙ্গতি রাখিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছিল। অরুণার মুখের দিকে চাহিয়াই সে বলিতেছিল—"ঐ দেখ—সমুদ্রের বালুবেলাতে বিশালকায় অজগরেরা পড়ে আছে।"

"বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্মিবিস্ফূর্জথু নির্বিশেষাঃ।"
সূর্যাংশু সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-রাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ"

অবাক হইয়া গিয়াছিল অরুণা। হয়তো বা মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সেদিনই প্রথম ভালবাসিয়াছিল। নহিলে সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি তাহার মনে এখনও সূর্যাংশু সম্পর্ক-সমৃদ্ধ—সাপের মাথার মণির মতো এমন উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে কেন? সে তো আজ বহুদিনের কথা। এবং মাপিলে গেলে পুষ্পকরথারূঢ় রাম সীতা আর অধোলোকের সমুদ্র বালুবেলার ব্যবধান চেয়েও বেশী। বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের স্মৃতি অবজ্ঞার স্মৃতি ওই বিচিত্রবর্ণ অজগরদেহের মতো বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। ব হইতে মণি দীপ্তির মতো ওই প্রথম পরিচয়টুকু না থাকিলে—সে পরিচয়ের আদি-অন্ত খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। সেদিনের স্মৃতির সঙ্গে সেদিনের বিশ্বনাথের কিশোর রূপও মণিময় বিগ্রহের মতো অন্তরলোকে অক্ষয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া রহিয়াছে।

সেদিন প্ল্যাটফর্মের উপর সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই মণিময় বিগ্রহ যেন তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, ছুটিয়া, এব হইতে বাস্তবে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, বলিতেছে—না—না না! ঠাকুর—না।

প্ল্যাটফর্মের উপর হইতে লাইনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া গেল। প্রচণ্ড সর্বধ্বংসী ভূমিকম্প। বর্তমান সকল কিছুকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফাটাইয়া পাহাড় মিলাইয়া গেল—সেখানে জাগিয়া উঠিল এক বিশাল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের জলে উঠিল আকাশস্পর্শী জলোচ্ছ্বাস—প্লাবিত করিল সমস্ত পৃথিবী, জাগিয়া উঠিল মহাদেশ—সমতলে জাগিয়া উঠিল গিরিশৃঙ্গ। ধ্বংস করিয়া নূতন রচনা করিয়া এক অভিনবের আবির্ভাবের সূচনা করিয়া দিল।

তাহার অন্তরাত্মা চিৎকার করিয়া উঠিল সব মিথ্যা সব ভ্রম। সে জীবনে আর কাহাকেও কখনও চাহে নাই, চাহে না, চাহিতে পারে না। শুধু এই ইহাকেই চাহিয়াছিল সে। ইহাকেই সে চায়।

তাই সকল মর্যাদা, সকল শিক্ষার উদ্ধত অহঙ্কার এক মুহূর্তে প্রবল মাদকের আচ্ছন্নতার মতো মিলাইয়া গিয়া জাগিয়া উঠিল নিদারুণ তৃষ্ণা। মনে হইল জীবন মিথ্যা জন্ম মিথ্যা যদি সে অজয়কে না পায়। বিশ্বনাথকে সে কত ভালবাসিত সে সেইদিন সেই চরম মুহূর্তেই অনুভব করিল। ওই ছেলেটিকে সে চায়—তাহাকে তাহার পাইতেই হইবে। অন্যথায় ব্রত মিথ্যা—বুদ্ধি মিথ্যা—বিদ্যা মিথ্যা এই পৃথিবীটাই মিথ্যা। সে অনুভব করিল—জীবনে এমন ভালবাসা আছে—সে ভালবাসাকে কাল ক্ষয় করিতে পারে না, দেহের ক্ষুধায় তাহাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না, বুদ্ধি-জগতের সকল বিচার, সকল সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ করিয়া দেয় সে ভ্রান্তি নয়—সে সত্য।

এত কথা সে সেদিন বিচার করে নাই। সেদিন সে শুধু উন্মত্তের মতো—অন্তরে অন্তরে দুই হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল অন্তরের সেই মণিময় বিগ্রহকে যে মণিময় বিগ্রহ এতদিন ধূলার আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল আজিকার বিপর্যয়ে-কম্পনে-ঝড়ে সে যেন সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে সর্বমালিন্যমুক্ত হইয়া দীপ্তিমান হইয়া হাসিতেছে।

ন্যায়রত্নকে সে নিজেই বলিয়াছিল সে কাশী যাইবে। অজয় কাশীর ট্রেনে উঠিয়া পড়িয়াছে, গৌর সঙ্গে গিয়াছে, সেও যাইবে। সে তাহাকে ধরিয়া আনিবে—একান্ত আপনার করিয়া জড়াইয়া ধরিবে।

ন্যায়রত্ন আপত্তি করেন নাই। তিনি কোন কিছুতেই আপত্তি করেন না। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। কখনও কখনও বলেন মৃত যা, অতীত যা, তা শুধু সাক্ষ্যই দেয় নীরবে, আপত্তি তো সে করে না—আমি তাই।

মোগলসরাইয়ের কাছাকাছি আসিয়া অরুণা অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার হাত-পা ঘামিতে লাগিল, প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল।

কি বলিবে সে ?

বলিবে অকপটে বলিবে সব কথা। বলিবে অজয়—আমি তোমার মা। কোন্ ধর্মে, কোন নীতিতে তুমি 'না' বলতে পার বল ?

হঠাৎ তাহার মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। অজয়ের প্রশ্ন সে নিজেই আবিষ্কার করিল।—গর্ভে ধরার অধিকার তো তোমার নাই। তবে বল, কোন্ দাবী তোমার ?

—তিনি যে আমাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিই যে আমার সব । তাঁর

অভাবে সব যে আমার শূন্য হয়ে গেছে। তুমি তাঁর পুত্র—আমার সকল শূন্যতাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব যে তোমার।

—সে পরিচয় তো তুমি বহন করছ না। পৃথিবী তোমার শূন্য কেমন করে বিশ্বাস করব আমি? তোমার এই বেশভূষা—তোমার এই ।

আর সে ভাবিতে পারে নাই, পাগলের মতো চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, না—সে অজয়ের সামনে গিয়া এই মূর্তিতে দাড়াইতে পারিবে না। দরজা খুলিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ট্রেনের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল। সে নিজেই দিয়াছিল। সেই মুহূর্তে চাবিটার কথা মনে পড়ে নাই। নহিলে হয়তো সাময়িক উন্মত্ততার মধ্যে—সেদিন সে জীবনান্তই করিয়া বসিত।

অরুণার দিদিমা তাহার মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন এ কি?

অরুণা বলিয়াছিল—আমাকে তোমার একখানা থান কাপড় দাও দেখি, আছে?

নিঃশেষিত পুষ্পফল—রিক্ত পত্রপল্লব—উদ্ভিদজগতে বৎসরে বৎসরে আসে নববসন্ত। জীবজগতে বৎসরে বৎসরে অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তরে আসে জীবনবসন্ত—বসন্তের স্পর্শে নারী-পশু উতলা হইয়া তাহার বাসা ছাড়িয়া বাহির হয়, জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রে অকস্মাৎ উন্মনা হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ডাক দেয়। বিচিত্র ডাক। সে ডাকের উত্তর একদিন আসে। পুরুষ-পশু সাড়া দিয়া আসিয়া সামনে দাড়ায়। মানুষের জীবনেও হয়তো এমনিই হয়। নব নব বসন্তের সাড়া হয়তো দেহকে নাড়া দিয়া বলে পুরাতনকে পিছনে ফেলিয়া নূতনের সন্ধানে চল। কিন্তু মানুষের মন তা চায় না। বহু সহস্র বৎসরের তপস্যায় যে মন অহরহ জীবন চাঞ্চল্যের মধ্যে স্থির হইয়া অতীত বর্তমান মিলাইয়া ভবিষ্যৎ রচনা করে—যে মন মরজগতের মধ্যে অমৃতকে আবিষ্কার করিয়া আস্বাদন করিয়াছে সে মন তা চায় না। মানুষের সেই মন মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। তাহার যে ভালবাসার ধনকে মৃত্যু হরণ করে, তাহার সকল অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাকে সে অমৃতে সঞ্জীবিত করিয়া নিজের আমরণ জীবনে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া রাখে। সে অমৃত ভালবাসা। মানুষের মন যাহাকে ভালবাসিল তাহাকে তাহার ভুলিবার উপায় নাই। দেহ যত জোরালো দাবি লইয়াই আসুক এ ভালবাসার কাছে তাহাকে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইতে হইবে। সেই কারণেই যে মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জন্য একজনও কেহ কাঁদিবার থাকে না—এ সংসারে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা সেজন। মানুষের এই মনই তো তপস্বিনী সাবিত্রীর মত শত দুর্যোগেও সদাজাগ্রত যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভালবাসার ধনকে আপন মনের মধ্যে নূতন জীবনে বাঁচাইয়া তোলে। ভালবাসা যেখানে নাই সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে আছে সেখানে এই কথাই মহাসত্য।

—স্বর্ণকে কথাটা বলতে পারিনি, রূঢ় হবে বলে। আপনাকে বলছি। বলুন তো স্বর্ণ কি আপনাকে হারিয়ে নূতন জনকে নিয়ে আবার জীবন শুরু করতে পারবে?

সে যখন বাল্যকালে বিধবা হয়ে—আপনাকে বিবাহ করেছে—তখন অন্তত তার কাছে সমাজপ্রভাব—মনের বিকৃত ধর্মভয়, এসবগুলো একেবারেই নাই।

কথা হইতেছিল দেবুর সঙ্গে। অরুণার এই পরিবর্তন যেন গোটা পৃথিবী সহ্য করিতে পারিতেছে না। অরুণা যেদিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—সেদিন দেবু আত্মগোপন করিয়া বেল কলোনীর মধ্যে লুকাইয়াছিল, সেখানে বসিয়াই কথাটা সে শুনিয়াছিল। শুনিয়া অবধি তাহার অস্বস্তির সীমা ছিল না। দিন দুয়েক পরেই সে একদিন রাত্রে জংশন হইতে হাঁটিয়া—পরবর্তী ডাউন স্টেশনে গিয়া আপ ট্রেনে জংশন স্টেশনে প্রকাশ্যভাবে নামিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে, কয়েকজনকে ডাকিয়া পুলিশ অনেক জিজ্ঞাসাবাদও করিয়াছে। দেবু স্টেশনে নামিতেই তাহাকেও পুলিশ ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এস-পি শামসুদ্দিন তাহাকে বেশ শাসাইয়াও দিয়াছে—বলিয়াছে—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমার চেয়ে অনেক চতুর আমরা। খবর আমরা সবই রাখি। হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—পিঠের চামড়া আমি তুলে নেব তোমার and then···, then I shall send you to Port Blair—you understand?—হাঁ।

দেবু স্থির হইয়া বসিয়াছিল—এতটুকু চঞ্চল হয় নাই।

শামসুদ্দিন বলিয়াছিল: হাঁ—আর একটা কথা। Tell that bitch—that woman—তোমাদের মিসেস ভটচায্যি গো, তাকে বলো—কাদা মাখলে যমে ছাড়ে না। থান কাপড় পরলে—একাদশী করলে—আমি ছাড়ব না। দরবারী ঘাবড়েছে, আই-বির ইনসপেক্টর ঘাবড়েছে—they were fools—আমি ঘাবড়াতাম না। এর পর আমিই তাকে ডাকব। যত সব।

দাঁতে-দাঁত ঘসিয়া বলিয়াছিল—কোন ধর্ম মানে না, সুবিধের জন্য হিন্দু থেকে মুসলমান হয়, আবার শুদ্ধি করে হিন্দু হয়—সেই মেয়ে আজ থান পরে বিধবা সেজে একাদশী করছে। Well- tell her—রথ তার জন্যে আসবে—prison van, —স্বর্গে তাকে আমি পাঠাব।

থাক সে সব কথা।

দেবু পুলিশ অফিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া সবাগ্রে দেখা করিল অরুণার সঙ্গে। দেখা করিয়া বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল। কৃত্রিম বিস্ময়ে অভিভূত হইবার ভান করিল। অন্যথায় সকল জিজ্ঞাসায় রূঢ় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যথাসাধ্য মুক্ত মন লইয়া অরুণাকে বিচার করিয়া বুঝিবার তাহার অভিপ্রায় ছিল, একেবারে অরুণার বাড়িতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—অরুণাদি! মধ্যে মধ্যে সে অরুণাকে দিদি বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

অরুণা তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া নিজের জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। সেই অবধি অর্থাৎ যেদিন হইতে সে থান কাপড় পরিয়াছে—সেইদিন হইতে তাহাকে কয়জনের

শ্লেষপূর্ণ বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে হইল। তাহার পরিচিত যে তাহাকে দেখিল সেই বিস্ময় প্রকাশ করিল—তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে শ্লেষ মিশাইয়া প্রশ্ন করিল—এ কি ?

তারপর কেহ হাত দিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেখাইয়া দিয়া প্রশ্নটা করিল ইঙ্গিতে। কেহ বা দৃষ্টিতেই প্রশ্নটা ফুটাইয়া তুলিল। দু-চারজন মুখ ফুটিয়াই প্রশ্নটা করিল—হঠাৎ এ রকম বেশবাসের পরিবর্তন ? একজন প্রৌঢ় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াছেন—"একি রূপ হেরি হরি—ধরেছ যোগীর বেশ ?"

অরুণা তাহাদের সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছে—এই ভাল লাগল।

—হঠাৎ।

—হ্যাঁ—হঠাৎ। হঠাৎ এই ইচ্ছে হল, এই ভাল লাগল।

এই উত্তর দিয়াও কিন্তু সে বার বার নিজেই নিজেকে জেরা করিয়া আপনাকে বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে—তাহার ভালবাসা সত্য। এ ভালবাসার নির্দেশ—দাবী লঙ্ঘন করিলে—জীবনে তাহার দুঃখ-অশান্তির আর অন্ত থাকিবে না ; জ্বলিয়া পুড়িয়া জীবনটা খাক হইয়া যাইবে। যেখানে ভালবাসা নাই—সেখানে ভালবাসার ভান করিয়া অথবা অসহায়ভাবে সমাজের নির্দেশে দেহের দাবীকে উপেক্ষা করিলে যে অশান্তিতে মন পুড়িয়া যায়, এখানে মনের দাবী উপেক্ষা করিয়া নূতন জীবনদর্শনের পুঁথির নির্দেশে দেহের দাবীকে বড় করিতে গেলে—অশান্তি হইবে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি। আজও যতবার সে শ্লেষপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—ততবার সে এই উপলব্ধিকে যাচাই করিয়া দেখে। যাচাই করিয়া দেখিতে গিয়াই—বিশ্বনাথের জন্য সে কাঁদে। এই চোখের জলই তাহার উপলব্ধিকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তোলে। সমস্ত সংকোচ, লজ্জা, বেদনা ধুইয়া যায়, অনাবিল প্রসন্নতায় অরুণার অন্তর বাহির অপরূপ মাধুর্যে ভরিয়া উঠে। হয়তো দুইদিন স্বর্ণের শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যবাণের সম্মুখীন হইয়া আবার নিজেকে যাচাই করিয়া দেখিল, একটা গোটা রাত্রি সে বিশ্বনাথের জন্য কাঁদিল। কান্নার মধ্যেও সে নিজেকে প্রশ্ন করিল, অতি রূঢ় প্রশ্ন,—বোধ করি তাহার জীবনের রূঢ়তম প্রশ্ন। নিষ্ঠুর উত্তেজনায় মায়া মমতাহীন হইয়া সকল চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া স্বর্ণই তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। বলিয়াছিল—আজ যে বিশ্বনাথবাবুর কিশোর রূপ মনে পড়ে আপনি আকুল হয়ে উঠেছেন অরুণাদি—সে আকুলতার মূলেও কি দেহ নেই আপনার ? ওই যে অজয়কে আপনার করে পেতে চাচ্ছেন—স্বামীর বদলে ছেলের রূপে চাচ্ছেন—সে-ও কি আপনার ওই চাওয়ারই রকম-ফের নয় ? আপনি তো আমার চেয়ে অনেক পড়েছেন—অনেক জানেন—বলুন না। সেটার সত্য অর্থ তো আপনি না-জানা নন—

স্বর্ণ যেন অরুণার কণ্ঠনালীটা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, শুধু শ্বাসই নয়—প্রসন্ন প্রভাতে [illegible] মাখিয়া দিয়া নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার লেপিয়া দিয়াছিল বিশ্বসংসারের সর্বাঙ্গে। সে হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া স্বর্ণকে বারণ করিয়াছিল—থাম স্বর্ণ, থাম।

স্বর্ণ থামে নাই। কথা শেষ করিতে বাকিও বড় কিছু ছিল না, শুধু আরও এক

বার উত্তরের সদর্প দাবী জানাইয়া সে থামিল—বলুন—বুকে হাত দিয়ে বলুন, সত্য কথাটা শুনি। কথা শেষ করিয়া সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উত্তেজনায় অল্প অল্প হাঁপাইতেছিল।

অরুণা চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিয়াছিল—তোমার কথা এতটুকু মিথ্যে নয় স্বর্ণ, বর্ণে বর্ণে সত্য, তা আমি স্বীকার করছি—আমার এ চাওয়ার মধ্যেও দেহ আছে। কিন্তু—

মধ্যপথে বাধা দিয়া অসহিষ্ণু স্বর্ণ বলিয়া উঠিয়াছিল—এরপর আর কিসের কিন্তু অরুণাদি ?

—আছে। আলো আর অন্ধকার প্রখরতম আর গাঢ়তম অবস্থায় এক হয়ে যায় এবং অভিন্নও বটে, কিন্তু তা বলে আলো আর অন্ধকার স্বতন্ত্র হয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন সে ভিন্ন বস্তু। তার রূপই ভিন্ন নয়—তার স্পর্শ, তার প্রভাব, তার ক্রিয়া সব ভিন্ন। স্বর্ণ—যে কোন নারীর যে কোন পুরুষ হলেই তার জীবনের দাবী মেটে না। আমার স্বামীর স্থানে আর কাউকে বসিয়ে আমার দাবী মিটবে না, সেটা হবে মদ খেয়ে নেশা করে আনন্দ সন্ধান করার মতো। তার ফলে দেহ-মন দুটোকেই আরোগ্যের বদলে বিষাক্ত রুগ্ন করে তুলবে। অজয়কে আমি আমার সন্তানরূপে পেলে তবেই মিটবে আমার জীবনের দাবী। তার মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে—তার কপালে চুম্বন দিয়ে, সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়ে, শুধু দেহ-মন নয—স্বর্ণ. আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে- ভরে উঠবে। এর কদর্থ করতে চেষ্টা করো না স্বর্ণ—মূলে এর অর্থ যাই হোক—মুক্ত বেণীর মতো দুই ধারায় পৃথক হওয়ার পর অর্থও পৃথক হযে গেছে। ও দুইয়ে মেশাতে চেষ্টা করো না। এক নদী দুই শাখায় ভাগ হয়ে গেলে তখন আর এক থাকে না—দুই ধারার জলে একই গুণ থাকে না। মাটির গুণে জলধারার রঙ পাল্টায়—গুণও পাল্টায়। যে বোঁটায় ফুল ফোটে সেই বোঁটাতেই ওই ফুল থেকে যে ফল ধরে সে দুটোর বোঁটা এক বলে —এক জিনিস নয় স্বর্ণ।

একটু চুপ করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে তারপর বলেছিল—এর বেশি আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না স্বর্ণ, আমি আর উত্তর দেব না।

স্বর্ণ তবু আবার কথা বলিতে চেষ্টা করিযাছিল। বাধা দিযা অরুণা বলিয়াছিল —বিচারকের আসনে বসবার চেষ্টা করো না স্বর্ণ। নিজের অধিকারের কথাটা স্মরণ রেখো। যদি কেউ তোমাকে বিচারকের পদ দেয়—বা গায়ের জোরেই নাও—তবে একতরফা বিচার করে যা খুশী রায় দিয়ো—আমি কথা বলতে নারাজ।

স্বর্ণ আর কথা বলে নাই, নীরবেই চলিয়া গিয়াছিল. সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে অরুণার কাছে আসে নাই। অরুণা বিশ্বনাথের জন্য কাঁদিয়াছে—আর ওই প্রশ্নই বার-বার নিজেকে করিয়াছে। সে প্রশ্নে সে অপ্রতিভ হয় নাই, লজ্জিত হয় নাই, যেমন ধীরতা ও শান্ত সংযমের সঙ্গে স্বর্ণকে উত্তর দিয়াছে তেমনি ভাবেই—ওই একই উত্তর বার বার দিয়াছে। বরং ধীরতা ও শান্ত সংযমের সঙ্গে একটি অনাবিল প্রসন্নতা তাহার

মুখে একটি হাসির রেখা আঁকিয়া দিল।

দেবু আসিয়া তাহাকে ডাকিতেই সে ওই হাসিমুখেই বাহির হইয়া আসিল। প্রসন্ন সম্ভাষণে তাহাকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন দাদা।

দেবু তাহাকে অরুণাদি বলিয়া ডাকিলে সে দাদা বলিয়াই সাড়া দেয়।

দেবু যথাসাধ্য কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—একি! কি ব্যাপার?

অরুণা আরও বেশি হাসিল, বলিল—আমার বেশ-ভূষা দেখে তো?

– হ্যাঁ। এ কি করেছেন? হঠাৎ— ?

তাহার বিস্ময়ের প্রকাশভঙ্গিকে সে যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল—বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, এ পরিবর্তনের ফলে তাহার বিস্ময়ের অন্তরালে নিছক বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নাই। ভাল বা মন্দ কোন ধারণাই এ বিস্ময়ের পিছনে নাই।

অরুণা তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হঠাৎ নয় দেবুবাবু, অনেক ভেবেছি, অনেক ভাঙাগড়া হয়ে গেছে আমার।

—মানে? মুহূর্তে ভ্রূ-দুটির উপরের কুঞ্চনরেখায় বিরূপ মনের রূঢ়তা আত্মপ্রকাশ করিল। এটুকুকে সযত্নে গোপন করিবার চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

অরুণা হাসিল। বলিল—একটা জীবনের ভাঙাগড়ার কাহিনীর এককথায় তো মানে বলা যায় না ভাই। সময় লাগবে। বসুন। যদি সময় এখন না থাকে তবে অবসর করে আসবেন—আমিও বলতে চাই। দুঃখের কথাই হোক আর সুখের কথাই হোক—কাউকে না বলতে পেলে মন হাল্কা হয় না।

দেবু বসিয়া বলিল—অবসর করতে হবে মিসেস ভট্টচাজ। একটু চুপ করিয়া বসিয়া সে বলিল—আপনার বাইরের রুচি বা আচারের পরিবর্তনের সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক বুঝতে হবে আমাকে।

অরুণা বলিল– তার মানে আমার বিচার করবেন? সে হলে আমি আসামীর মতো চুপ করেই থাকব। আপনি সাক্ষী সাবুদ নিয়ে যা রায় দেবার দেবেন। রাজনৈতিক দলে কর্মী হয়ে ঢুকেছিলাম যখন, তখন দেশের জন্য মুখ বুজে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলাম। আর আজ আমার নিজের জীবনের পরম বস্তুর জন্য আপনার দেওয়া সাজা নেবার সময় হাল্কার কথা কইতে যাব কেন?

দেবু চকিত হইয়া অরুণার দিকে চাহিল।

অরুণা বলিল—বিচারের প্রহসনই হয়ে থাকে—রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধে – রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিচারালয়ে। রাষ্ট্রনীতি নিয়ে যে সব দল কাজ করে– তারাও বিচারের সময় ওই একই ধারায় বিচার করে। তেমনি বিচার করেন তো আমার কথা আপনার শুনেই বা কাজ কি—আমার বলেই বা লাভ কি? যা খুশী করুন গিয়ে। তবুও আপনি আমার স্বামীর আকর্ষণে তাঁরই দীক্ষায় এ দলে এসেছিলেন— একসময় আমিও আপনাকে হয়তো কিছু-কিছু শিখিয়েছি, নূতন দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করেছি। তাই কটা কথা বলছি। আমার ভাঙাগড়ার মধ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্বরূপকে আবিষ্কার করেছি· নিজেকে চিনেছি, তাই বুঝতে পেরেছি যাকে একদিন স্বামীত্বে বরণ করেছিলাম তার

অস্তিত্ব তার দেহের সঙ্গেই আমার জীবনে শেষ হয়ে যায়নি, তাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই—নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।' দেবুবাবু হঠাৎ বুঝলাম কথাটা। অজয়কে দেখে সেই সত্য হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আজ আমি কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে ঘর বেঁধে সুখ পেতে পারি না—শান্তি পেতে পারি না! তাই আমার স্বামীর সন্তান—আমার সন্তান—অজয়কে নিয়ে ঘর বাঁধবার কামনায় আকুল হয়ে উঠেছি। তাকে আমাকে জয় করতে হবে—তার মা হতে হবে। এ সজ্জা আমার বিধবা মায়ের সজ্জা। এর জন্যে—

দেবু মাটির দিকে চোখ রাখিয়া অরুণার কথাগুলি শুনিতেছিল—হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—এর জন্যে—?

—এর জন্যে যে কোন মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত দেবুবাবু।

—অর্থাৎ এতকালের বিশ্বাস, আদর্শ, দল—সব ?

—হ্যাঁ। সব, সব, সব। কিন্তু

—আবার কিন্তু কি ?

—কিন্তু আছে দেবুবাবু। বিশ্বাস আদর্শ আমাকে ছাড়তে হবে না। ছাড়তে যেটা হবে সেটা দল। দেবুবাবু, নারীর হাতে ভিক্ষা নেওয়ার জন্য চৈতন্য তাঁর ভক্তকে বর্জন করেছিলেন, কিন্তু ভক্তের বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাস সে ধর্মমতে সাধনার অধিকার কেড়ে নিতে পারেননি। আমার জীবনের বিশ্বাস আদর্শবাদ আপনারা কেড়ে নেবেন বা আপনাদের সঙ্গে না বনলে ছাড়তে হবে এমন ধারণা করবার স্পর্ধা আপনার বা আপনাদের হল কি করে ?

দেবু হাসিয়া বলিল— কিন্তু ছেলের সঙ্গে যদি বিরোধ হয় আদর্শ নিয়ে ?

—আমি এমন মা হতে চাই দেবুভাই, যে আমার রক্ত সুধা হয়ে তার দেহের রক্ত হয়ে প্রবাহিত হবে, আমার ভাবনা আমার ভাষাই হবে তার ভাবনা—ভাষা। বিরোধ আমার হবে না দেবুবাবু। অরুণার চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিল।

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আপনার কামনা সফল হোক অরুণাদি—সর্বান্তঃকরণে আমি প্রার্থনা করছি।

অরুণা বলিল—বসুন, আপনার মানুষের মন আজও বেঁচে আছে। নইলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন না। স্বর্ণকে কয়েকটা কথা বলবেন, সে মারাত্মক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি সে আঘাত পাবে বলে। বাল্যকালে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—যার সঙ্গে ভালবাসা জন্মাবার —যাকে ভালবাসবার সময় পায়নি বলে—সকল বিয়েতেই তাই হবে ? সে যে ধোয়া-মোছা মন নিয়ে আপনাকে গ্রহণ করেছে, আপনার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে—এসবও কি ধুয়ে মুছে যাবে—আপনার দৈহিক অস্তিত্বের অভাবে ? স্বর্ণ কি আপনাকে হারিয়ে নূতন জনকে নিয়ে আবার জীবন শুরু করতে পারবে ?" সে যখন বাল্যকালে বিধবা হয়েও, আপনাকে ভালবেসে বিবাহ করেছে, তখন অন্তত তার কাছে সমাজপ্রভাব— মনের বিকৃত ধর্মভয় এসবগুলো তো একেবারেই নাই।

অরুণাদি।

স্বর্ণ নিজেই আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

দেবু শঙ্কিত হইয়া বলিল—চল স্বর্ণ - বাড়ি চল।

স্বর্ণ বলিল—না।

অরুণা বলিল—বল স্বর্ণ, কি বলছ বল?

—বলছি না কিছু, বাহবা দিচ্ছি। যে সব তত্ত্বকথা চমৎকার বক্তৃতা করে বুঝালেন এতক্ষণ তার জন্য বাহবা দিচ্ছি।

—চল স্বর্ণ।

যাচ্ছি। ঝগড়া আমি করব না। শুধু একটা কথা ওঁকে জানিয়ে যাই। গোটা শহরটা ওঁর এই নতুন ঢং নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পার্টির প্রত্যেক মেম্বার এর জন্যে শপথ করে বলেছে—পার্টি থেকে ওঁকে বের করে দিতেই হবে।

পার্টি আমি ছেড়ে দিলাম দেবুবাবু। আপনি ওপরে জানাবেন।

সত্য সত্যই এত ঘটনাটা লইয়া সারা দ্বারমণ্ডল শহরে আলোচনার আর অন্ত নাই। হিন্দু বিধবার বেশে তাহাকে পুলিশ আপিসে উপস্থিত হইতে না হইলে হয়তো ঠিক এমন ধরনের আলোচনার ব্যাপার হইয়া উঠিত না। যেন ঢেঁড়া পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া দিল এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের বড়দিদিমণি, যে মেয়েটির বেশবিন্যাস কেশপ্রসাধন দেখে মানুষ নিন্দা-বিস্ময়ে চেয়ে থাকত যার আধুনিক মতবাদের উগ্রতার সঙ্গে মেয়ে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়াত, যে মেয়ে এ সংসারে সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে চলেছে এতদিন, যে এতদিন হিন্দুধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আবার ইসলাম ছেড়ে নামমাত্র হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেও কোন ধর্মকেই মানে না বলে ঘোষণা করেছিল, সেই মেয়ে অকস্মাৎ বৈধব্যের নিরাভরণতায় নিজেকে নিরাভরণ করেই ক্ষান্ত হয় নাই—একাদশীর উপবাস করে নূতন পদ্ধতিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এর চেয়ে বিচিত্র আর কি হতে পারে।

গোটা শহরটার একটা দুপুরের মধ্যেই কথাটা ছড়াইয়া গিয়াছে।

কোথাও উঠিল উচ্চহাস্য।—বল কি, একেবারে তপস্বিনী? কিন্তু সে বয়স তো হয়নি।

কোথাও তিক্ত ক্ষোভ বনবন করিয়া উঠিল।—কোন্ অধিকার তার? লজ্জাহীনা নাস্তিক।

কোথাও তীক্ষ্ণ সন্দেহ উদ্যত হইয়া উঠিল।—কারণ কি? নূতন কোন উদ্যম? কি সে উদ্যম?

কোথাও অবিমিশ্র বিস্ময় মনশ্চক্ষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আশ্চর্য—অবাক!

কোথাও আবার অনুচ্ছ্বসিত প্রকাশে জাগিয়া উঠিল বুদ্ধিমানের সহানুভূতি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল শক্তি ফুরিয়ে গেলে পরাজয় এমনি ভাবেই মানুষকে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়।

কোথাও বিস্ফোরকের মতো ফাটিয়া পড়িল ক্রোধ।—জীবনে সম্মুখের পথ ছেড়ে পিছন দিকে মুখ ফেরালো যে—সে পলাতক, শাস্তি তাকে পেতে হবে।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা—একটি বিস্তীর্ণ অংশের অনেক অনেক মানুষ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে, প্রসন্ন স্নেহে, গভীর শ্রদ্ধায় প্রায় বিগলিত হইয়া গেল। অনেকের চোখ সজল হইয়া উঠিল। এইটিই যেন তাহারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিল। তাহারা বলিল —জয় হোক, তোমার জয় হোক। ইহারা দ্বারমণ্ডলের হিন্দু সমাজের সাধারণ মানুষ। ইহারা গণনায় অসংখ্য, কিন্তু গুরুত্বে নগণ্য। বুদ্ধি দিয়া বিচারের শক্তি ইহাদের নাই। দৃষ্টিহীন মানুষের স্পর্শ দিয়া পৃথিবীকে চেনার মতো ইহারা সব কিছুকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে, অথবা প্রত্যাখ্যান করে। যখন গ্রহণ করে তখন চোখ ছলছল করিয়া উঠে, ঠোঁট দুইটি কথা বলিতে গিয়া কাঁপে। নগ্ন বক্ষের উত্তাপও বোধহয় বাড়িয়া যায়।

চারিপাশে চারখানি পঞ্চগ্রাম—অর্থাৎ বিশখানা গ্রামের হৃৎপিণ্ডের মতো কেন্দ্রস্থল জংশন দ্বারমণ্ডল। এখানেই আসে বিশখানা গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য। এখান হইতেই বিশখানা গ্রামে যায—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ। বিশখানা গ্রামের প্রাণবান দুঃসাহসী যাহারা—তাহারা এই দ্বারমণ্ডলেই আসিয়া আসন পাতে। এখান হইতেই তাহারা তাহাদের জীবনের প্রভাব ছড়াইয়া দেয়—চারিটি পঞ্চগ্রামে। দ্বারমণ্ডল এখানকার হৃৎপিণ্ড। ক্ষুদ্র একটি ঘটনা—একটি মেয়ের জীবনের ঘাত-সংঘাতে পরিবর্তনের প্রভাবে হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করিয়া দ্রুততালে চলিতে শুরু করিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যন্ত ভাগের মতো সাধারণ মানুষগুলির দারিদ্র্যশীর্ণ পল্লী এমন কি কুঁড়েঘরগুলিও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দ্বারমণ্ডলে একটি বিশেষ শ্রেণী আছে—যাহারা নূতন কালের অভিজাত শ্রেণী। এ শ্রেণীর অস্তিত্ব চারিদিকে পঞ্চগ্রামের গ্রামে বড় একটা নাই। ইহারা হইলেন একাধারে ধনী এবং জ্ঞানীর দল—অর্থাৎ মোটা চাকুরে—উকীল—মোক্তার—ডাক্তার—ইংরাজী কায়দায় চেয়ার-টেবিল-প্রধান ব্যবসাদার। দু-চারজন জমিদারবাড়ির ছেলে বি-এ এম-এ পাস করিয়া ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সমাজনেতৃত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। সুরপতিই ইহাদের তরুণ নেতা। কঙ্কণার জমিদারবাড়ির ব্যারিস্টার ছেলেটি—যাহাকে সুরপতি জমিস্টার বলিয়া থাকে—সেও এই দলের একজন মাননীয় ব্যক্তি। শুধু মাননীয় ব্যক্তিই নয়, সুরপতির একজন প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। গেল মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে চেয়ারম্যান পদে সেও একজন প্রার্থী ছিল; সুরপতির কাছে শোচনীয় হার হারিয়াছে। হারিয়া বিলাত-ফেরত নরেন সর্বাগ্রে সুরপতির হাত ধরিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল। সুরপতি এদেশের খাঁটি মফঃস্বল শহরের ছেলে, সে আপনার শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী ধন্যবাদ জানাইতে গিয়া নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিল—সাধে কি তোকে জমিস্টার বলি রে ভাই? এই জন্যেই বলি। বনেদী চালের সঙ্গে বিলিতি চাল মিশিয়ে একেবারে স্বর্গীয ব্যাপার করে তুলেছিস। তুই ভাই বয়সে বড় হলে—ফুটডাস্ট নিয়ে মাথায় মাখতাম। বয়সে ছোট, তোর চাঁদমুখে একটা চুমো খাই।

চিবুক স্পর্শ করিয়া সত্যসত্যই সে চুমু খাইয়া বলিয়াছিল—কিন্তু মাই ডিয়ার—

একটা কথা বলব—রাগ করো না যেন। তোমরা ব্রাদার—বনেদী জমিদার—এ অঞ্চলের কিং-এম্পারার! শুনেছি কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের পাল্কী যেত পথ দিয়ে—পথের দু-ধারের মানুষেরা দুহাতে সেলাম বাজাত। বাবুরা যদি কান বা মাথা চুলকাতে হাত তুলতেন তো মানুষেরা আঁতকে উঠে মাথা নামিয়ে চিৎকার করত--হুজুর মাপ করুন, রাজা রক্ষে করুন। মানে কি? না—কঙ্কণার বাবুর হাত যখন উঠেছে—তখন কারুর মাথা না-নিয়ে তো নামবে না। ব্রাদার, তুমি হলে সেই বংশের Bamboo-holder তার 'পর তুমি বিলেত ঘুরে এসে—সোনায় সোহাগা লাগিয়েছ। তোমার এই জংশনের চেয়ারে লোভ কেন? রাধে-রাধে—আমাদের এ হল গিল্টির বাজার—এর মধ্যে খাঁটি-সোনা -তোমাকে মানাবেই বা কেন? না-না-না, এদিকে নজর দেওয়া তোমাদের মানায় না। বেড়ালের চোখ ইঁদুরছানার দিকে পড়ে, তোমরা বাবা চিতে বাঘ—সিংহ হল ব্রিটিশ, রয়াল বেঙ্গল হল--রাজা রাজড়া, তোমরা চিতে বাঘ তোমাদের নজর ইঁদুরের দিকে পড়লে--আমরা খাব কি?

এই বড় দীর্ঘ বক্তৃতার উত্তরে নরেন হাসিয়াছিল মাত্র। কোন কথাই বলে নাই। ভিতরের সত্যটা অজানা কাহারও ছিল না। নরেনেরও না, সুরপতিরও না।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

আজ দ্বারমণ্ডলের আধিপত্যের আসরের চেয়ারম্যানশিপই এ অঞ্চলের রাজ-সিংহাসন। শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ বলে--ও চেয়ার দখল আপনাকেই করতে হবে। এ অঞ্চলের মাটি আমাদের—আমরা কিস্তি-কিস্তি রাজকর যুগিয়ে যাচ্ছি--আর রাজত্ব করবে ওরা।

শিবকালীপুরের পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষ—সম্প্রতি তাহার দেউলিয়া জমিদারের জমিদারীস্বত্ব কৌশলে নিলামে কিনিয়া জমিদার হইয়াছে। দ্বারমণ্ডলের নদীর খেয়াঘাট এবং আরও খানিকটা জায়গা শিবকালীপুরের সীমানাভুক্ত, সেই হিসাবে সেও দ্বার-মণ্ডলের একজন জমিদার। কঙ্কণার নরেনবাবুর সঙ্গে সেও এখানকার প্রাধান্যের একজন দাবীদার। এখানকার আভিজাত্যের অহঙ্কারে অহঙ্কৃত সম্প্রদায়টির পঞ্চায়েতের মাননীয় না হইলেও গণনীয় ব্যক্তি।

এই সম্প্রদায়টি নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অরুণার এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সুরপতি থানাতেই—আই-বি অফিসার রণদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া-শ্রাগ করিয়া দুই হাত উল্টাইয়া বলিয়াছিল—কে জানে বাবা!

তাহার পর আসরে-মজলিসে এ সম্প্রদায়ের প্রধানেরা কাঁচা-পাকা গোফের অন্তরালে হাসি লুকাইয়া সুরপতিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কি ব্যাপার হে সুরপতি?

সুরপতি বলিয়াছিল—বুঝতে পারছি না দাদা! কিন্তু একেবারে তপস্বিনী।

—কিন্তু বয়স তো হয় নাই ভাই!

—সেই তো!

এবার গোফের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু আড়াল হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখা-দেওয়ার ভঙ্গিতে বাহির হইয়া পড়িল। প্রবীণ ডাক্তার রমণীবাবু বলিলেন—এ যে একেবারে

রাধিকার কালীমূর্তি ধারণ !

বুড়ো ব্রজবিলাসবাবুর টাকা পয়সার সুবাদ আছে। ভদ্রলোক তদনুযায়ী গম্ভীর এবং খটরোগা ব্যক্তি—তিনি এ কথায় খিঁচাইয়া উঠিলেন—আঃ রমণী ! দেবদেবীর নাম নিয়ে তুলনা দিয়ে আর অপরাধ বাড়িয়ো না ! ওসব ওদের ঢং—ওদের—।

ঢং বলিয়াও পরিতৃপ্তি হইল না ব্রজবিলাসবাবুর—পরিশেষে বলিতে চাহিলেন—ওসব ওদের ছেনালী ! কিন্তু ছেলেদের দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন ছেলে-পিলে রয়েছে—কি বলব বল ?

সুরপতি বলিল—বলছি, দাদা কি বলবেন—আমি বলছি—রহস্যময়ীদের রহস্য।

—হ্যাঁ—এই বলেছ ঠিক।

নরেন পাইপে অগ্নিসংযোগ করিতেছিল, এতক্ষণে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—Woman in the white—the mystry woman—eh !

সকলে তারিফ করিয়া উঠিল।

এমনিভাবেই ব্যাপারটা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সকলে চকিত হইয়া উঠিল। অরুণা নিজেই চকিত হইয়া উঠিল বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহারই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল—অদ্ভুতদর্শন এক বৃদ্ধ। মাথায় ছয় ফুটেরও বেশী। কালো কষকষে গায়ের রঙ। দেহের চামড়া শিথিল হইয়াছে, কোচকানো চামড়ায় শীতের খড়ি পড়ার ছাপ এখনও সব উঠে নাই। কিন্তু এককালের জমাটবাঁধা হাতের গুল -বুকের অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি পেশীযুগল বা কপাটজোড়াটা ঠিক আছে। এত বড় কালো মানুষটার মাথায় চকচকে টাক ঘিরিয়া ধবধবে পাকা কোঁকড়া চুল, মুখে একজোড়া পাকা পাক-দেওয়া সুঁচালো বাহারে গোঁফ ! ঘরের উঠানে আসিয়া গলার সাড়া দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কোচহীন সাড়া এবং বেশ ভারিক্কী চালের জোরালো সাড়া।

সেদিন রবিবার। অরুণা চিঠি লিখিতেছিল জয়াকে। অকপটে খুলিয়া আপনার কথা জানাইতেছিল। এমন সময়ে গলার সাড়ায় সে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

জবাব আসিল—টুকচা বাইরে আসেন তো মা-ঠাকরুণ।

—কে ? প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া অরুণা বাহিরে আসিয়া মানুষটিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। লোকটিও অসঙ্কোচে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিনিটখানেক চাহিয়া রহিল। তারপর ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল—চরণের ধুলো লোক আমি। অরুণা সাবধান হইবার পূর্বেই অসঙ্কোচে হাত বাড়াইয়া সে অরুণার পায়ের আঙুল ছুঁইয়া মুখে মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—আপনাকে দেখতে এসেছিলাম মা ! তা—তা হ্যাঁ, সাথক হল নয়ন।

অরুণা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। সন্দেহ হইতেছিল—এ বোধ করি জংশনের উকীল-মোক্তার-ডাক্তারদের পক্ষের ইঙ্গিতে পরিচালিত কোন বিচিত্র কুটিল পরিহাস। সে একটু কঠিন স্বরে বলিল—তুমি কে ? আমাকে দেখে তোমার নয়ন সার্থক হল। তার মানে ?

—মানে আবার কি ? শুনলাম আপনার কথা, শুনে মন বললে—যাই দেখে আসি ঠাকরুণকে ; আমাদের ঠাকুরমশায়ের নাতবউ, বিশু দাদাঠাকুরের বউ—দেখে আসি। দেখে যদি নয়ন সার্থক হয় তো পেন্নাম করে চরণের ধুলো মাথায় নিয়ে ফিরে আসব। আমি রামভল্লা—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। মাণিকে মাণিক চেনে। আমার পাপের অন্ত নাই, পাপ থাকলে আমার চোখে ছাপি থাকবে না। তা—তুমি মা—পবিত্ত। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পয্যন্ত ঝলমল করছ তুমি। নয়ন আমার সাথক হল।

বুড়ার কথায় বিস্ময়কর জোর, যেমন জোরালো গলার স্বর—তেমনি জোর দিয়া উচ্চারণ করে, তেমনি হাত মাথা নাড়ে জোরে-জোরে।

অরুণা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সন্দেহের অবকাশ নাই, প্রতিবাদ করিবারও কিছু নাই, তাহার অন্তরের পবিত্রতা—এ সত্য প্রশংসাতে বিনয়ে কুণ্ঠিত হইল না—তপস্বীর মতো দেবতার বরের মতোই অসঙ্কোচে গ্রহণ করিল—কোন কিছু বলিবার না পাইয়া লোকটির নামটিই প্রশ্নের সুরে উচ্চারণ করিল।

—রামভল্লা। নামটা যেন পরিচিত। শুনিয়াছে সে। কাহার কাছে ঠিক মনে পড়িতেছে না—হয়তো বা স্বামীর কাছে, হয়তো দেবুর কাছে—হয়তো স্বর্ণের কাছে।

রামভল্লা বিস্মিত হইয়া গেল। কি আশ্চর্য—তাহার নাম শুনে নাই ঠাকরুণ ? সে বলিল—এ্যাই দেখেন ? রামভল্লার নাম শোনেন নাই ? ডাকাত রামভল্লা ! বিশু-দাদা বলতেন—রামচন্দ্র নয়—তুমি রামদাস। হনুমান বীর। আপনি তো মা—শ্বশুরের ভিটেতে থাক নাই। আর এসেছ ক'দিনই বা হল ? বুড়া হয়েছি, ছ'বছর কালাপানি খেটে এই দিন পনের এসে ফিরেছি—নইলে শুনতে পেতে বেটে রামের আবা-বা-বা শুনতে পেতে।

—তুমি ! তুমিই রামভল্লা ! সবিস্ময়ে সস্নেহে অরুণা মুহূর্তে যেন কতদিনের জানা মানুষ হইয়া গেল, যেন একাল তাহাকে জানিবার জন্য দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল সে।

—হ্যাঁ, আমিই সেই রামভল্লা। রাম হাসিল। বিশুদাদা বলত—রামদাদা। হঠাৎ সে বিষণ্ণ হইয়া গেল—একমুহূর্তে অত্যন্ত সহজে—অতি স্বাভাবিকভাবে। সমুদ্রে যেন সূর্য ডুবিয়া গেল, লাল-ছটা—তাজা নীল জল—কালো হইয়া গেল। বলিল—বিশু-দাদা আমাদের সোনার মানুষ ছিল গো। মহাগ্রামের ঠাকুর-বংশ সাক্ষাৎ আগুনের বংশ ; হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে তার আশ্চয্যি কি—ছটার দিকে চোখ চেয়ে কথা বলা যেত না। সেই বংশের ছেলে—তাপ নাই- চোখ জুড়িয়ে যায়—বুক জুড়িয়ে যায় ! হ্যাঁ—আর গড়ে গিয়েছিল দেবুকে ! ভাল ছেলে, মরদ ! তিনুদাদার মেয়ে স্বন্ন-মা আমাদের তাকেও সে বিয়ে করে সংসার পেতেছে—লেখাপড়া শিখিয়েছে—আচ্ছা কাজ করেছে।

অরুণা হাসিল। ভারী ভাল লাগিল মানুষটিকে। অপরূপ সহজ ছন্দের সোজা মানুষ, তেমনি সরল বিচারের প্রসন্ন ভাল লাগা। স্বর্ণ এবং অরুণা এবং দেবুকে—একই দৃষ্টিতে

ভাল লাগিয়াছে তাহার। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেল।

অরুণা বলিল—স্বর্ণের সঙ্গে দেবুবাবুর সঙ্গে দেখা করেছ? এই তো—ওই পাশে থাকেন ওঁরা!

—করব—করব দেখা, যাব। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দেখা করব মনে করি—কিন্তু একটুকুন কিন্তু-কিন্তু লাগে। বুঝেছ না মা। এমনভাবে সে ম্লান হাসিয়া অরুণার মুখের দিকে চাহিল যে, অরুণা যেন সবই জানে—সবই তো বুঝিতেছে—! বেশী বলিয়া কি হইবে।

—তা আজ দেখা করেই আসি! বুয়েচ মা—একটি নিবেদন কিন্তু করব তোমার কাছে।

—কি বল!

—চারটি পেসাদ। আজ চারটি পেসাদ পাব তোমার ঘরে। অঃ—ছ'বছর ঘ্যাঁট আর তেঁতুল-গোলা খেয়ে জীবের আর সাদ বলে কিছু নাই। বাড়িতেও কেউ নাই। মাগ মরেছে। বিটীর ঘর অনেক দূর। হাত পুড়িযে খাই আর ভাবি—একদিন কারুর ঘরে পেসাদ চেযে খেয়ে আসব। না-হয় তো কারুর বাড়িতে একদিন রেতে—চুরি করে হেনসেলকে হেনসেল খেয়ে চেটে দিয়ে আসব।

বলিয়া হাঃ হাঃ করিযা হাসিযা সারা হইয়া গেল। তারপরই ডাকিল: স্বন্ন! মা স্বন্নমণি!

সে বাহির হইয়া গেল। বলিতে বলিতেই গেল নয়ন সাথক হল মা—স্বন্ন—নয়ন সাথক হল। অন্তরটা জুড়িযে গেল!

স্বর্ণকে দেখিয়াও রামভল্লা ওই একই কথা বলিল, অরুণাকে দেখিয়া সে যা বলিয়াছিল তাই বলিল—নয়ন আমার সাথক হল তোকে দেখে। দেখালি বটে মা। চাষী ছিল তিনকড়ি দাদা, চাষীর ঘরের বেটী তুই—একেবারে সাক্ষাৎ সরস্বতী হযে উঠেছিস মা!

স্বর্ণ খুব খুশী হয় নাই—সে তাহার কথা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল—আসলে তোমার নয়ন দুটিই ভাল রামকাকা। নয়ন দুটি তোমার সার্থক হবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে।

রামভল্লা খাতির কাহাকেও করে না। করিত এক তিনকড়িকে, স্বর্ণ তাহারই কন্যা—ছেলেবেলায় তাহাকে কোলে পিঠে মানুষ করিযাছে সেই জন্যও খানিকটা বটে এবং আজ তাহার মনটি নরম পরিতৃপ্তিতে মধুর হইয়া আছে সে জন্যও বটে—স্বর্ণের কথার সুরের মধ্য হইতে যে খোঁচাটুকু তাহাকে বিদ্ধ করিল সেটুকুর জন্য এক মুহূর্তে উদ্ধত হইয়া উঠিল না। স্বর্ণের কথার অর্থ সে বুঝিতে পারে নাই, শুধু খোঁচার বক্র তীক্ষ্ণাগ্রের স্পর্শই অনুভব করিয়াছিল—সে সেটুকু উপেক্ষা করিয়াই বলিল—তা সাথক হবার জন্যেই তো নয়নের ছিষ্টি রে স্বন্ন। দুঃখু কি জানিস?—দুঃখু হল—নয়ন সাথক হতে পায় না। সংসারের দুঃখী পাপী মানুষ—এই দেখেই কষ্ট পেতে হয়। আজ বিশুদাদার বউকে দেখলাম, তোকে দেখলাম—নয়ন আমার ভরে গেল।

—তাই তো বলছি রামকাকা—তোমার বিশুদাদার বউকে দেখে যে চোখ তোমার সার্থক হল, আমাকে দেখে তোমার সেই চোখ সার্থক হল কি করে? তোমার বিশু-দাদার বউ নতুন করে তপস্বিনী সেজেছে দেখেই তো হল। কিন্তু আমি বিধবা মেয়ে, বিয়ে করেছি। আমাকে দেখে তো তোমার চোখ সার্থক হবার কথা নয়, রামকাকা।

এবার রামভল্লা গম্ভীর হইয়া গেল—স্থির দৃষ্টিতে স্বর্ণের দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তাহার পর বলিল—কথা বটে কি না-বটে, তা আমি জানি না স্বন্ন। তবে নয়ন আমার সার্থক হয়েছে। যা হয়েছে তাই বলেছি। মাকে দেখে মনে হল—মা আমার জলের বুকে ডোবা শ্বেতপদ্ম, তোকে দেখে মনে হল ঘরের বাগানে ফোটা স্থলপদ্ম। দুই-ই ভাল লাগল, চোখ জুড়িয়ে গেল।

হঠাৎ রাম উঠিয়া পড়িল, বলিল—আচ্ছা উঠলাম।

—উঠবে? জল খাবে না?

—না। জল খেয়েছি। এসেছিলাম থানাতে হাজরে দিতে। ফিরছিলাম নদীর ঘাটে মুড়ি ভিজিয়ে খেতে খেতে শুনলাম—ক'জনাতে বলাবলি করছে ওই মায়ের কথা। গাঁয়ে এসে অবধি ওর কথা শুনছি। তা মনে হল একবার নিজের চোখেই দেখে যাই। জল খেয়েছি। এখন দুপুরে মায়ের ঘরে পেসাদ পেয়ে বাড়ি যাব। যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছি। চললাম।

—একেবারে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করেছ!

রাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—হ্যাঁ।

রামের চোখের চাহনি দেখিয়া স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল। সে জানে—বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদের মতো এই দৃষ্টি রামকাকার চোখে ঝলসিয়া উঠিবার পরই ডাকাত রামভল্লা একটা চিৎকার করিয়া ওঠে। ভুরু দুইটা কুঞ্চিত হইয়া আসে। চওড়া কপালে শিরা ফুলিয়া ওঠে—একটা পাশবিক ভঙ্গিতে মুখবিবর হাঁ হইয়া যায়, তাহার ভিতর হইতে একটা বর্বর চিৎকার বাহির হইয়া আসে।

রাম কিন্তু চিৎকার করিল না। তাহার ভুরু দুইটা ঠিকই কুঁচকিয়া উঠিল—নাকটাও ফুলিয়া উঠিল—কিন্তু মুখটা হাঁ হইল না। কয়েক মুহূর্ত এমনি তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—চোখ তোকে দেখে জুড়াল স্বর্ণ, কিন্তু কান জুড়াল না রে। নেকা-পড়ার কাটায় জিভখানা তোর বেজায় ধবধবে হয়ে উঠেছে। ইহার পর কয়েক মুহূর্ত সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। ভুরুর কুঞ্চন, নাকের ডগার ফুলা মিলাইয়া গেল। রাম ঘাড় নাড়িয়া শান্ত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—না-না-না। এ ভাল নয় মা—এ ভাল নয়।

সে বাহির হইয়া গেল। দরজার ও-পাশ হইতে বলিল—দেবুখুড়োর সঙ্গে দেখা হল না। তাকে বলিস, ও বেলাতে খেয়ে-দেয়ে যাবার সময় একবার না হয় হেঁকে যাব।

স্বর্ণ আর কথা বাড়াইল না। কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। বিশেষ করিয়া রামভল্লার মত মানুষের সঙ্গে।

* * *

অরুণার ঘরে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া রাম খানিকটা অপ্রস্তুত হইল। খাইতে

খাইতে সে বুঝিতে পারিল যে অরুণার হেঁসেলের সমস্ত ভাতগুলি সে একাই শেষ করিয়াছে। অরুণার অবশ্য এ-দেশে কম দিন হইল না, এ-দেশের চাষী-মজুরদের আহারের পরিমাণের কথা তাহার না-জানা নয়, তবুও সে এমন ধারণা করিতে পারে নাই। অরুণার নিজের খাওয়া কমই। কিন্তু নিজের ছাড়াও যে সে আরও দুই জনের আয়োজন করিয়াছিল। তাহার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে একজন মেয়ে, ওই রামভল্লাদেরই জাতের মেয়ে সে— সেও কম খায় না। অরুণার আহারের পরিমাণের তিনগুণ তো বটে। তাহার ভাগটাও রাম দিব্য শেষ করিয়া দিয়া পরম পরিতৃপ্তি সহকারে একঘটি জল আলগোছে গল-গল করিয়া খাইয়া বলিল—একটুকুন বেশী হয়ে গেল খাওয়াটা। তা মা তুমি যা বেঁধেছিলে—ওই ঠাণ্ডাগাণ্ডা শুকতো, ব্যান্নরটির মতো এমন অমৃতি আমি খাই নাই। তবে ওই অড়রের ডালে খানিকটা অসুবিধে হল। আমরা যা চড়ামাটির দেশের মানুষ, মাস-কলাইয়ের ডাল একেবারে ভাত ভাসিয়ে না-মেখে খেলে বাধো বাধো লাগে।

ঝি মেয়েটি বলিল—তা ভালই হয়েছে গো মুরুব্বি। না-হলে মাকে আবার হাঁড়ি চড়াতে হত। তিনজনার ভাত তুমি খেয়ে দিলে—আবার বলছ—অসুবিধা হল।

অরুণা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না-না-না।

রাম অপ্রস্তুত হইয়া গেল প্রথমটা। —তাই তো। তবে তো-। পর মুহূর্তেই সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তা বেশ হয়েছে। ভালই হয়েছে। মা সীতের হাতকণের হনুমান-ভোজন হয়ে গেল।

হাত মুখ ধুইয়া আবার একদফা পায়ের ধুলা লইয়া রাম চলিয়া গেল।

এই রামভল্লাই সমস্ত জংশন শহরের আকাশ বাতাসকে চকিত করিয়া তুলিল। অরুণার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহার স্বভাব-উচ্চ কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়া দিল—নয়ন আমার সার্থক হয়ে গেল,—সাক্ষাৎ সাবিত্তি দর্শন করে এলাম, অন্নপূন্নার পেসাদ পেয়ে এলাম। যে বেটা মায়ের নিন্দে করে—সে বেটার নরকে ঠাঁই হবে না। আমার ছামনে বললে বেটার মুখ ভেঙে দেব আমি এক কিলে। আমি রামভল্লা, ষোল বছর বয়সে ডাকাতিতে হাতেখড়ি নিয়েছি—আজ বয়েস ষাট-সত্তর-আশি কে জানে কত হল—অনেক দেখেছি আমি। নিজে অনেক পাপ করেছি - অনেক পাপী আমি দেখলাম- ঘাটলাম, পাপ রামভল্লাকে ফাঁকি দিতে পারে না। ওই জয়তারার থানে জটাধারী সাধু এসেছিল, বেটা ফেরারী আসামী, জটা রেখে -- গন্ধবাবা সেজে আসর জমিয়ে বসেছিল---সবাই বেটার ধাপ্পায় ভুলেছিল, ভুলি নাই আমি। বেটার জট কেটে নিয়ে বিদেয় করেছিলাম। সে তখন লোকের কি রাগ রামভল্লার ওপর। তার মাসখানেক বাদেই দেখি পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল—সাত বছরের ফেরারী আসামী সে। রামভল্লার ভুল নাই।

ঠিক দিন দুই পরেই রামভল্লার ঘোষণাটা এমন চেহারা লইল যে একদিনেই গোটা নবগ্রাম এবং তাহার চারিপাশের গ্রামগুলি তোলপাড় হইয়া গেল।

রামভল্লা সেদিন আবার জংশনে আসিয়াছিল একটা বড় মাছ বেচিতে। রামভল্লার

জাতীয় পেশা নাই, পেশার ধারও ধারে না। পেশা বলিতে. সেকালে ছিল. ডাকাতি, দাঙ্গাবাজি, লাঠিয়ালি। পেশা কয়েকটাই ছিল। তার মধ্যে মাছ ধরার পেশাটা প্রবল ছিল। গ্রামে ফিরিয়া সে দশজনের সঙ্গে দেখা যেমন করিয়াছে, এখানকার ঠাকুরস্থানে যেমন প্রণাম করিয়াছে, তেমনি ময়রাক্ষীর তীর ধরিয়া কোথায় নূতন দহ পড়িয়াছে—পুরাতন দহগুলির কোন্‌টি আছে কোনটি মজিয়াছে—ঘুরিয়া সব দেখিয়া আসিয়াছে। পঞ্চগ্রামের শ্মশানের ধারের বড় দহটি দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল—দহটায় মাছ আছে। মাছও আছে, কুমিরও আছে। কিছুদিন আগেই নবীন ধীবরকে কুমিরে ধরিয়াছিল এই দহে। নবীন জাল ফেলিয়াছিল। জাল টানিতেই বঝিল—বড় মাছ পড়িয়াছে। মাছটা দহের তলার মাটিতে চাপিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছে, টানিতে গেলেই জালটা কাঁপিতেছে। নবীন বিলম্ব না করিয়া মাছটাকে ভাল করিয়া জড়াইয়া জলে ডুব মারিয়াছিল। জালের প্রান্তের লোহার কাঁটার ইশারা ধরিয়া মাছটার গায়ে হাত দিতেই মাছটা ঝাপটা মারিয়া নবীনের কাঁধ কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। নবীন ধীবর কৌশলী বিচক্ষণ লোক এবং গায়ে তাহার শক্তিও আছে। মেছো কুমীরটাকে লইয়াই জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং সেটার দাঁত ছাড়াইয়া উঠিয়া আসিয়াছিল। সেই দহে রাম পর পর কয়েক রাত্রি বাগি এবং ছিপ লইয়া বসিয়া কাটাইয়া অবশেষে গত রাত্রে একটা প্রকাণ্ড চিতল শিকার করিয়াছে। ওজনে সাড়ে-ষোল সের হইয়াছে। ও অঞ্চলের ধীবরেরা আসিয়াছিল তাহার কাছে—'ভল্লা মশাই মাছটা দেন—যা হয় দাম লেন। পেটী আধসের আপনাকে এমনি দোব।' আগের কাল হইলে রাম তাই দিত। রামভল্লা নিজে হাতে মাছ বিক্রি করিবে, এ সে নিজেও ভাবিতে পারিত না। কিন্তু রামভল্লা নিজেই জেলেদের বলিয়াছে—ওরে বাবা—দায়ে পড়ে বাঘা কাঁকড়া খায়। জানিস তো—বাঘের যখন আহার মেলে না তখন বাঘ দায়ে পড়ে নদীর ধারে এসে বসে—নদীর কিনারা থেকে কাঁকড়া বের হয়—তাই মেরে তখন খায়। আমার এখন সেই দশা। আমি ওটাকে জংশনে নিয়ে যাব। ভাগা দিয়ে বেচব। দশটা টাকা আমার হেসেখেলে হবে। বুঝলি না ভাই—ওতে তোরা আর ভাগ বসাস না।

জংশনেও আবার হাটের পরিবর্তে মাছটা লইয়া আসিয়া বসিয়াছিল—একেবারে মহাজনপটির গুদাম এলাকায়।

জংশনের মহাজনপটি গোটা বাংলাদেশে বিখ্যাত। গোটা রাঢ় অঞ্চলে ধান-চাল-গম-গুড়-আলু-কলাই-লঙ্কা তামাক প্রভৃতি জিনিসের সবচেয়ে বড় বাজার। বহুলক্ষ টাকার কারবার। গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যে ধুলিয়ান হইতে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল—প্রায় একশত মাইল ব্যাপী ভাগীরথী তীরের উৎপন্ন ফসল এখানকার ব্যবসায়ীরা কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখে। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ মাড়োয়ারী—বাঙালীও দু-চারিজন আছে। বিচিত্র স্থান। ফুট পাঁচেক চওড়া একটা রাস্তার দুধারে ব্যবসায়ীদের পাকা বাড়ি. সামনের অংশ অধিকাংশই দোতলা। নিচের তলায় গদি - পুরু তোষকের উপর চাদর বিছানো আসরে তাকিয়া, কাঠের বাক্স, মোটা মোটা খেরো বাঁধানো খাতা লইয়া কাগজে-কলমে কারবার চলিতেছে। পিছনের দিকে বড়-বড় গুদাম, প্রত্যেক গুদামেই বিশ-

পাঁচিশখানা গাড়ি লাগিয়া আছে। হয় মাল বোঝাই হইতেছে, নয় খালাস হইয়া গুদাম বোঝাই হইতেছে। কতক গাড়ি আসিয়াছে গ্রামাঞ্চল হইতে—চাষী গৃহস্থেরই গাড়ি, তাহারা মাল বোঝাই করিয়া বেচিতে আসিয়াছে। হাত-ছয়েক উঁচু বাঁশের তে-পায়ায় বড়-বড় লোহার কাঁটা-যন্ত্র খাটাইয়া ওজন চলিতেছে। আর হাঁকও চলিতেছে—রাম-রাম, রাম-রাম, রামে-রাম—দুই-দুই, দুই রামে—তিন-তিন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। গুদামের মুখে দুইমণি বস্তাগুলা পিঠে করিয়া ধনুকের মতো বাঁকিয়া মুটেগুলো চলিয়াছে—হট্-হট হট্-হট—হট-হট। এ—এইয়া। ইহারই মধ্যে চলিতেছে কলহ। গাড়োয়ান মুটে গ্রাম্য কারবারি এখানে তো কম নয়। অন্ততপক্ষে দুশো-আড়াইশো। ইহা ছাড়া এমনি বহুসংখ্যক লোক এই কারবারেই স্টেশন-গুদামে আলাদা খাটিতেছে—মানুষ ছাড়া আছে হাজার দরুণে পায়রা। তাহার সঙ্গে আছে কাক-শালিক-চড়ুই-গোটা রাস্তাটা ছাইয়া বসিয়া আছে। মানুষ গেলে—একটু সরিয়া পথ দেয়—উড়ে না। রাস্তার ধুলা ধান-চাল-গম-কলাইয়ে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলা ভিখারি ভিখারিনী কোথায় কখন কোন বস্তাটা ফাটিবে—সেই প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ অবিরাম কোমরে ঝুড়ি লইয়া গোবর কুড়াইয়া ফিরিতেছে। দুশো-আড়াইশো গাড়ির বলদ আছে—তাহার উপর ঘুরিতেছে শেঠজীদের বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাই-বাছুর।

রামভল্লা মাছটা লইয়া এইখানে আসিয়া হাজির হইল। খরিদ্দার তাহার শেঠজীরা নয়, গদীর কর্মচারীরা নয়, খরিদ্দার ওই গাড়োয়ানেরা এবং মজুরেরা। গৃহস্থ ভদ্রজনেরা কি খাইবার শখের জন্য পয়সা দিতে পারে? তাহাদের কি সে বুকের ছাতি আছে? শেঠজীরা মাছ খায় না। নহিলে ইহারা ভাল খায়। খাঁটি ঘি, খাঁটি দুধ নহিলে উহারা স্পর্শ করে না। মাছ-মাংস খাইতে জানে এই সব গাড়োয়ান ও মুটেরা। উহাদের মধ্যে মুসলমানেরাই আমীর খরিদ্দার। দিনে চার-পাঁচ টাকা কামাইবে। স্বচ্ছন্দে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া একটা ভাগা উঠাইয়া গামছায় বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। পিঁয়াজ রসুন-আদা বাড়িতেই আছে। দু-চার আনার গরম মশলা কিনিয়া লইবে সঙ্গে সঙ্গে।

একটা গাছের তলায় বসিল রাম। তাহার সঙ্গে ছিল পতিপুত্রহীনা ধীবর-প্রৌঢ়া সুখমণি জেলেনী। সুখো অনেকদিন পর তাহার বঁটি ও তৌলদাঁড়ি বাটখারা বাহির করিয়াছে। যেমন দামেই বিক্রি হউক, রাম তাহাকে পুরা দেড় টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। সুখো মাছ কুটিয়া ভাগা সাজাইয়া দিবে। চব্বিশটা ভাগা সাজাইল। আট আনা করিয়া ভাগা। সুখো খুব হুঁশিয়ার মেয়ে। সে খুব হিসাবের উপর চুল-চেরা ভাগ করিয়া গাদা ও পেটি এক এক ভাগে সাজাইয়া দিয়াছে। তৌলদাঁড়িটা কাপড় চাপাই আছে।

মহাজনপটির গন্ধও বিচিত্র। লঙ্কা-তামাক-গুড়-কলাই-ধান—গোবর-চোনা—মশলা—নূতন কাপড়-সূতা—ঘি-সরিষার তৈল, সমস্ত কিছুর গন্ধ একত্র মিশিয়া সে এক বিচিত্র গন্ধ। কোন একটাকে বাছিয়া স্বতন্ত্র করিবার উপায় নাই। ইহারই মধ্যে

ষোল সের কাটা-মাছের গন্ধ কতটুকু—কিন্তু তবু মজুরদের নাকে তাহা এড়াইল না। দেখিতে দেখিতে তাহারা চারিপাশে ভিড় জমাইয়া ফেলিল। এত বড় পাকা চিতল মাছ দেখিয়া তাহারা লোলুপ হইয়া টপ-টপ এক-একটি ভাগা উঠাইয়া লইল। দাম দস্তুর করিল না, ওজন দেখিল না, আটা আনা হিসাবে পয়সা প্রায় সকলেই ফেলিয়া দিল। জনা চারেক বলিল—পয়সাটা ভাত ওবেলা নইলে হবে না। গদী থেকে পয়সা নিয়েই দিয়ে দোব। তাহাদের মধ্যে কুসুমপুরের আসগর শেখ একজন।

রামের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। দিনকয়েক আগে সে কুসুমপুর গিয়াছিল পুরানো বন্ধুলোকের সঙ্গে দেখা করিতে। দেখা করিতে নয়, ভিখুকে দেখিতে। ভিখু শেখ একবার তাহাদের সঙ্গে একটা কারবারে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। ভিখুই ছিল কারবারটার মূলে। গরু-বাছুরের পাইকারি করিত ভিখু—গাম গামান্তরে ফিরিত, সে-ই একদিন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—তাহার একটা চেনা বাড়িতে ধনী কুটুম্ব আসিয়াছে। মেয়েদের গায়ে অনেক গহনা। পরের দিন রাত্রেই তাহারা চলিয়া যাইবে। যাহা করিতে হয়, আজ রাত্রেই করিতে হইবে। সময় থাকিলে ভিখু তাহার কাছে আসিত না। তাহার বরাবরের কারবার ছিল খড়বোনার গাযের দলের সঙ্গে। মাকা খাঁ জাঁদরেল সর্দার, তার কড়া হুকুম ছিল - ছুটা কুত্তার পাঁচ বাড়ির এঁটোকাঁটা শুঁকিয়া বেড়ানোর মতো যাহারা আজ এ-দলে কাল ও-দলে কাজ করে তাহাদের ঠাঁই তাহার দলে নাই। দায়ে পড়িয়া ভিখু সেদিন রামের কাছে আসিয়াছিল। বেলা তখন তিন প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে, সেই রাত্রেই কাজ শেষ করিতে হইবে। কুসুমপুর হইতে খড়বোনা কমপক্ষে পাঁচ ক্রোশ অর্থাৎ দশ মাইল পথ। রামের গ্রাম মাত্র তিন মাইল। রাম ভিখুকে লইয়া সেই রাত্রেই কাজ শেষ করিয়াছিল। প্রাতঃকালেই খবর পাইল পুলিশ ভিখুকে ধরিয়াছে। বাড়ির একটি মেয়ে ভিখুকে চিনিয়াছে। ভিখু তাহাকে সকলের অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া গিয়া ধর্ষণ করিয়াছিল। ভিখু ধরা পড়িল, কিন্তু আশ্চর্য, পুলিশের মারপিট সত্ত্বেও মুখ খুলে নাই। মামলাটায় তাহার একা সাজা হইয়াছিল, আট বৎসর দ্বীপান্তর। সেই ভিখুর রোগ ধরিয়াছে—প্রায় শেষ অবস্থা শুনিয়া রাম তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। ভিখুকে সে ঘৃণা করে—তাহার দলে কড়া হুকুম আছে—মেয়েলোকের গলা কাটিয়া হার খুলিয়া লও, হাত কাটিয়া চুড়ি বালা লও—কিছু বলিব না, কিন্তু যে লোক মেয়েলোকের সতীত্ব নাশের জন্য হাত বাড়াইবে, তাহার মুণ্ডটা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে। সেদিন ঘটনার সময় জানিতে পারিলে হয়তো তাই হইত—ভিখু তাহার হাতেই মরিত। ঘৃণা সত্ত্বেও খানিকটা করুণা না করিয়া সে পারে নাই; ভিখু কাহারও নাম করে নাই। সে তাহাদের অনায়াসেই ধরাইয়া দিয়া রাজসাক্ষী সাজিয়া মাফ পাইতে পারিত। তাহা সে করে নাই। করুণা এই জন্যই। ভিখুর বাড়ির পাশেই আসগরের বাড়ি। রাম বলিল - দাঁড়া আসগর। সুখো, যা মাছ রেখেছিস —তিন ভাগ কর, এক ভাগ দে আসগরকে। আসগর তু গিয়ে যেন ভিখেকে দিস। হ্যাঁ—কিন্তু আল্লার কিরে। আর তোমার কাছে আমি ভাই মাছের দাম-পয়সা নেবো না।

—কেনে? আসগর বিস্মিত হইয়া গেল।

—আমি সেদিন ভিখুর বাড়ি গিয়েছিলাম। তোমার ঘরের কলার কাঁদি আমি দেখে এসেছি। তখনই দেখেছিলাম—রঙ ধরেছে। আমাকে এক ছড়া—ওই উপরকার ছড়াটা তোমাকে দিতে হবে। কাল নিয়ে এস।

মহের শেখ গাড়োয়ান কুসুমপুরের পাশের গ্রামের লোক। কঙ্কণার বাবুদের অনুগত ব্যক্তি, মহলে কিস্তির সময় ডাক-হাঁকের কাজ করে, লাঠি ধরিতে জানে। সে একটু বক্র ব্যঙ্গ করিয়াই বলিয়া উঠিল—কি রকম। রামদাদার এইবার কলায় রুচি হল নাকি? মদ মাংসের রুচি গেল? বুড়ো হলে রামদাদা?

রাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল বয়স তো হল, বুড়োও হয়েছি। সে না-বলছে কে? তবে তু যে বুড়ো বলছিস মহের, সে বুড়ো রাম হবে না। কলা আমি খাব না রে, দেবতার জন্য। মা-ঠাকরুণকে দোব। সাক্ষাৎ দেবতা রে। নয়ন সার্থক হয়ে গেল আমার।

নয়ন সার্থক হয়ে গেল' কথাটা শুনিয়াই মহের বুঝিয়া লইল অ। তুমি ওই হয়ার কথা বলছ। ওই মহাগেরামের ঠাকুরের নাতবউটার কথা। বিশু ঠাকুরের ছোট বিবিটার কথা।

মুহূর্তে রামের প্রসন্ন মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। 'নাত বউটা—ছোট বিবিটা' শব্দ দুইটা তাহার কানে যেন খোঁচা মারিয়া বিঁধিয়া গেল। গম্ভীর স্বরে সে বলিল হ্যারে, তাঁরই কথা বলছি। সাক্ষাৎ দেবতা।

—হুঁ - হুঁ। জানি—জানি।

—কি জানিস? কি বলছিস?

কি বলব রামদাদা? ওই মেয়েটিকে জানি গো। সঙ্গি করবার লেগে কলমা পড়ে মসলমান হয়েছিল। ফের হিন্দু হল। এখন আবার দেবতা হল। তা ভাল।

—ওরে বেকুব—দেবতার আবার জাত লাগে নাকি? দেবতা দেবতা।

—আরে যাও যাও।

এবার রাম প্রচণ্ড জোরে হাঁক দিয়া উঠিল। —খবরদার।

মহেরও দমিল না, সে রুখিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল—এই ও।

মহের এবং রামের আচরণের পিছনে খানিকটা ইতিহাস আছে। বৎসর আষ্টেক আগে রাম একবার মহেরকে বৎপরোনাস্তি ঠ্যাঙাইয়াছিল। সে এক লাঠিখেলার প্রতিযোগিতার আসরে। রাম তাহার দলবল লইয়া খেলা দেখাইতেছিল। মহের লাঠি ধরিতে জানে, তখন বয়স কম—রক্তের তেজ বেশী। রাম বুড়া। সে লাফ দিয়া আসরে পড়িয়া বলিয়াছিল—ই হচ্ছে আপোসের খেল। ই আবার খেল নাকি? এস আমার সাথে এস।

রাম তখন মদে চুরচুরে হইয়া আছে সে বাঁ হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—যা—যা।

মহের যায় নাই—উপরন্তু রামের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—না। এসো —

আমি খেলবো লাঠি তুমার সাথে।

সঙ্গে সঙ্গে মির্জা এনায়েৎ আসবে নামিযা বলিযাছিল—উ যখন খেলতে চাইছে তখন কেনে খেলবে না তুমি?

—না। ওর সঙ্গে লাঠি ধরি না।

—তবে তুমি হার মান।

হার মানব?

—নিশ্চয়।

কযেক মুহূর্ত বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিযা রাম বলিযাছিল—আচ্ছা তবে আয়।

ছোট ছুই হাত লাঠি লইয়া খেলা। রাম পাঁয়তাড়া করিল না, একেবারে সোজা আসিয়া আক্রমণ করিল। মহেব লাঠি ভালই খেলে, এতক্ষণ সে রামের খেলা দেখিয়া ভাবিযাছিল—বুড়া হইয়া রামের হাত পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মুহূর্তে তাহার ভুল ভাঙিল, সে দেখিল—এ সে রাম নয়। এ সেই পুরানো রাম, তাহার বড় বড় চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতো জ্বলিতেছে, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বন্য জানোয়ারের মতো আগাইয়া আসিতেছে। তবু মহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল। কিন্তু রামের কাছে সে নিতান্তই ছেলে, রাম অদ্ভুত ক্ষিপ্র হাতে লাঠির উপর লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাঁ হাতে মহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া আসরের ঠিক মাঝখানে টানিয়া আনিয়া মাস্টার যেমন ছাত্রকে পেটে তেমনি করিয়া পিটিতে শুরু করিল। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। এনায়েৎ মির্জা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু এমন এক হাঁক দিল রাম, যে সে সভয়ে পিছাইয়া গেল। আরও ঘা-কয়েক পিটিয়া মহেবকে ছাড়িয়া দিয়া রাম বলিয়াছিল—যা। ঘর যা।

রামের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেও কুসুমপুর বা স্থানীয় মুসলমানেরা কিছু বলিতে সাহস করে নাই। দলবল সমেত রাম এ অঞ্চলে অপরাজেয়, ভয়াবহ ছিল। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তারপর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, রামের বয়স অনেক বাড়িয়াছে, দলবল নাই। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানদের মধ্যে এ কালে একটা নূতন চাঞ্চল্য আসিয়াছে। তাই মহেব রামের সমান উঁচু গলায় হাঁক দিয়া উত্তর দিল, হঁয়ো।

রাম গায়ের চাদরটা ফেলিয়া দিয়া হাতের লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিল। বলিল—একা লড়বি না সবাই লড়বি?

বলিয়াই সে ডাকাতের সেই প্রচণ্ড কুর ডাক ছাড়িয়া উঠিল। আ—ভো ভো ভো ভো।

গোটা মহাজনপটি শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

শেঠজীরা বাহির হইয়া আসিলেন। দারোয়ানেরা ছুটিয়া গেল বন্দুক বাহির করিতে। যে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ গোবর কুড়াইয়া জড়ো করিতেছিল, তাহারা ভয়ে ছুটিয়া পটি হইতে পলাইয়া গেল। যতীন্দ্র গেল—বলিতে বলিতে গেল—মার লেগে যেয়েচে। ওরে

রানাশরে—সে কি হাঁক। বন্দুক-সন্দুক বার করে সে না-তা কাণ্ড।

খবরটা থানা পর্যন্ত চলিয়া গেল।

থানা হইতে দারোগা জন চারেক কনেস্টবল লইয়া সশস্ত্রে আসিয়া হাজির হইল। তখন অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। রাম তাহারই মধ্যে চিৎকার করিয়া বলিতেছে —মুখ আমি মুড়ে দোব। যে আমার মায়ের নামে অ-কথা কু-কথা বলবে—তার দাঁত ভেঙে জিভ টেনে ছিঁড়ে নোব। সাক্ষাৎ দেবতা আমি দেখছি সাক্ষাৎ দেবতা। আমার নয়ন সার্থক হয়েছে, বাঁশি শুনে পরাণ জুড়িয়েছে, প্রাণ ধন্য হয়েছে — আমি বলছি।

—কে?

—কে?

—কার কথা বলছে? কে?

—মেয়ে ইস্কুলের বড় দিদিমণি।

—ন্যায়রত্ন ঠাকুরের পৌত্রবধূ হে।

রামভল্লা নবকুলে যাহাকে বলে শার্দূল—সেই জাতের মানুষ। মহেশ শেখও তাই—তবে রামের মতো গোবাদার নয়, গুলছাপ মারা চতুর চিতা। এ ক্ষেত্রে হয় মহেশকে পালাইতে হয়, নয় লড়াইটা অনিবার্য হইয়া উঠে। হইয়া উঠিয়াছিলও তাই। মহেশ পশ্চাদপসরণ করে নাই, সে বেশ জানিত, কঙ্কণায় লাঠিখেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রাম যে-দিন তাহার লাঠিসুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিয়া ঠ্যাঙাইয়াছিল, সে-দিন হার নাই। তাহাদের অর্থাৎ মুসলমানদের একতা চিরদিনই আছে, বর্তমানে সে একতা আরও শক্ত এবং আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে এবং হিন্দুর ক্ষেত্রটি—এ ক্ষেত্রটির সঙ্গেও কোথায় যেন মুসলমান সমাজের সঙ্গে একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। বিশ্বনাথ এবং অরুণা ইসলামকে অবজ্ঞা করিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে—ইহার জন্য দেশের সকল মুসলমানই অসন্তুষ্ট হবে এ কথা মহেশ জানে। তাই সে পলাইবার কথা ভাবে নাই। তাহার পিছনে মুসলমান গাড়োয়ানেরা মুখ চোখ কঠিন করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। যুদ্ধটা প্রলয় যুদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু লোকজন পুলিশ ও সমাজের মাতব্বরেরা এমনভাবে আসিয়া পড়িল যে, ব্যাপারটা প্রায় অঙ্কুরেই পরিণত হইল। দুই পক্ষকেই তাহারা পৃথক করিয়া দিল।

রাম কিন্তু চিৎকার করিয়া সেই এক কথাই ঘোষণা করিল। সে উচ্চ ঘোষণা লোকে চুপ করিয়া শুনিল। শুনিবারই কথা। যে বিশ্বাসের জন্য মানুষ এমনভাবে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, সে বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করিবার মতো দাম্ভিক রসিকতায় দখল সহজ কথা নয় এবং ও জিনিসটা ওখানে অচল বটে।

রামের ঘোষণা লোকে স্তম্ভিত হইয়া শুনিল। এইগুলি মুসলমানের সঙ্গে এরা বিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাহা বলিল, অধিকাংশ মানুষই তাহা বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া অরুণা কেমন হইয়া গেল।

সংকোচ আসিয়া তাহাকে যেন প্রথমটা অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার পর কি

জানি কেন, কান্নার আবেগ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অতি বাস্তবপন্থী বিদ্যার মার্জনায় এবং শান-ঘর্ষণে মার্জিতবুদ্ধি মেয়েটি কোনমতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে স্কুলে গেল না। শরীর অসুস্থ বলিয়া একখানা দরখাস্ত দিয়া ঘরেই শুইয়া রহিল। কাঁদিল আর ভাবিল, ভাবিল আর কাঁদিল।

সারাটা দিন এমনি করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার মুখে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে একবার জয়তারা আশ্রমে দাদু অর্থাৎ ন্যায়রত্নের কাছে যাইবে। তাহার সমস্ত অন্তর তাহার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। একবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিল—এ কি তাহার প্রশংসালিপ্সা নয়? রামভল্লার এত ঘোষণায় সারা জংশন শহরে এই যে তাহার জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহার ক্রিয়াটা সেই কঠিন কঠোর মায়াবাদী বৃদ্ধের উপর কি হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্যই কি সে যাইতেছে না? আজ তিন পুরুষ ওই বৃদ্ধ তাহার উত্তর পুরুষগণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া নিজের জীবনের ধ্বজা উঁচু করিয়া ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—তাহার সেই ধ্বজাটি ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়াছে কিনা দেখিবার জন্যই কি তাহার এ আগ্রহ নয়?

না।

সে দৃঢ়কণ্ঠেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে পা বাড়াইল।

সাধারণ রাস্তা ছাড়িয়া সে রেলওয়ে ইয়ার্ডের ভিতর দিয়া একটা পায়ে হাঁটা পথ ধরিল। জংশনের রেল-ইয়ার্ড সুবিস্তীর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান। ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আগে যখন ইয়ার্ড ছোট ছিল, মাত্র চার জোড়া লাইনে কাজ চলিত তখনকার দিনে লোকে ওভার-ব্রিজ পার হইয়া যাওয়ার হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য, রেল আইন অমান্য করিয়া ইয়ার্ডের লাইন পার হইবার জন্য এই পথটি রচনা করিয়াছিল। প্রথম পথিকৃৎ ছিল রেলখালাসীরা। প্ল্যাটফর্মের পর ইয়ার্ড, ইয়ার্ডের গায়ে মালগুদাম, গুদামের ওপাশে ছিল খানকয়েক কুলি-ব্যারাক। রেলের লোক রেলের আইন অমান্য করিয়া যাতায়াত করিত, তাহাদের দেখাদেখি স্থানীয় দুঃসাহসীরা চলিত ফিরিত। ক্রমে ইয়ার্ড বাড়িতে শুরু করিল। দ্বারমণ্ডল জংশনে পরিণত হওয়ার পর হইতেই পুরান লাইনের পাশে পাশে লাইনের পর লাইন পড়িতে আরম্ভ করিল। যে গুদাম ছিল ইয়ার্ডের সীমানার এক প্রান্তে, সে গুদাম এখন মাঝখানে পড়িয়াছে। কুলি-ব্যারাক ভাঙিয়া অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের যাওয়া-আসাও বাড়িয়াছে। কুলিরা যায় আসে। পয়েন্টস্‌ম্যান জমাদার গার্ড গুদামবাবুদের ঘুরিতে ফিরিতে হয়, ব্যবসায়ী শেঠরা মালগুদামে যাওয়া আসা করেন, কুলীদের মেয়েরা-ছেলেরা ঝুড়ি হাতে অনবরত ইঞ্জিন-ঝাড়া কয়লা কুড়াইয়া ফেরে। তাহাদের পায়ে-পায়ে অনেক পথ-চিহ্ন আঁকা হইয়া গিয়াছে। এ পথ অরুণার বিশেষ পরিচিত পথ। এই সেদিন পর্যন্ত এই পথে রাত্রির অন্ধকারে প্রায় নিয়মিত আনাগোনা করিত। তখন তাহার জীবনে রাজনীতির নেশাটাই ছিল বড়। জমাদার রামভরোসা এই সাইডিং-এরই ওই পাশে আড্ডা বসায়, সেই আড্ডায় আসিত। দেবু গৌর সঙ্গে থাকিত। কখনও কখনও বিশেষ প্রয়োজনে সে

একাই যাওয়া-আসা করিয়াছে। আজও সে এই পথ ধরিল। এ পথে লোকজন কম। লাইনের উপর সারি-সারি গাড়ি তাহারই মধ্য দিয়া পথ। বিচিত্র গন্ধ। তেল-গুড়-ঘি-তামাক-লঙ্কা ও নানা মশলার গন্ধ একসঙ্গে বিচিত্র গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। মাড়োয়ারী ও দেশী ব্যবসায়ীদের গুদামের এলাকায় যে গন্ধ তাহা অপেক্ষাও এ গন্ধ তীব্র এবং জটিল। এই গন্ধই যেন জংশন শহরের গায়ের গন্ধ।

আগেকার দিনে এমন অনেক কথাই তাহার মনে হইত। আজও কথাটা মনে হইল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। একটা বেদনাদায়ক কথা মনে জাগিয়া উঠিল।

সে তো সেই-ই আছে। এই জংশন শহর সম্পর্কে তাহার ধারণা-ভাবনা সবই তো সেই-ই আছে। শুধু নিজের জীবনের এক অজানা তৃষ্ণাকে সে জানিয়াছে। সে জানিয়াছে বিশ্বনাথকেই সে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকেই সে আজও ভালবাসে, তাহারই প্রতিবিম্বের মতো তাহার আত্মজ অজয়কে না পাইলে কোনদিন তাহার তৃষ্ণা মিটিবে না। এই লইয়া গোটা শহরটায় এ কি আন্দোলন হইয়া গেল! যাহারা বন্ধু ছিল, কর্মজীবনের সঙ্গী ছিল তাহারা পর হইয়া গেল।

মাইজী! কে যেন তাহাকে ডাকিল। কণ্ঠস্বর পরিচিত। অরুণা ফিরিয়া দেখিল। দুইপাশে গাড়ির সারি, কিন্তু সে সারির ফাঁকের মধ্যে কেহ কোথাও নাই। বোধহয় সারির ও-পাশ হইতে কেহ ডাকিতেছে।

— কে?

হামি রামভরোসা।

ও-পাশ হইতেই সে ডাকিয়াছিল। দুইখানা মালগাড়ির সংযোগস্থলে রামভরোসা গাড়ির তলা দিয়া পার হইয়া এ-পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রামভরোসা।

হাঁ মাইজী! প্রণাম!

রামভরোসার কথার মধ্যে যেন খানিকটা অপরিচিত নূতন কিছু রহিয়াছে! ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না অরুণা।

ভাল আছ রামভরোসা?

হাঁ মাইজী, ভাল আছি।

তোমাদের ব্যারাকের সকলে ভাল আছে?

সব সব ভাল মাইজী।

ইহার পর অরুণা কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে সংকোচ বোধ করিতেছিল। সে তো দেবু, স্বর্ণ এবং অন্য কর্মীদের মনোভাব জানে এবং সেই মনোভাব যে রামভরোসাদের মনেও সংক্রামিত হইয়াছে, ইহাতেও সে নিঃসন্দেহ। সংকোচ সেই জন্য।

রামভরোসাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে-ও প্রশ্ন করিতে সংকোচ বোধ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পর অরুণা বলিল আমি যাই রামভরোসা!

— কাঁহা যাবেন মাইজী?

-- যাব একবার জয়তারা আশ্রমে। দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আবার কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া অরুণা অগ্রসর হইল। এ যেন সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

মাইজী।

কি? বল রামভরোসা।

আপনি হামিলোককে ছাড়িয়ে দিলেন মাইজী?

অরুণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, না রামভরোসা, তোমাদের কি ছাড়তে পারি? কিন্তু

কি মাইজী?

দেবুবাবু স্বর্ণ এরা সকলে আমাকে বাদ দিয়েছে।

বাদ দিয়েছে? তব কেও উলোক বোলা কি আপ হি আপনা ইচ্ছাসে ছোড় দিয়েছেন?

তাই বলেছেন ওরা?

হাঁ মাইজী!

না-না-না। এই কথা তোমাকে কে বললে? আমি তোমাদের ছাড়িনি। কোনদিন ছাড়ব না। তবে। একটু বোধহয় একটি মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, তবে ওদের সঙ্গে বোধহয় আর আসব না। ওরা বোধহয় আমাকে ছাড়বেন।

উন লোক ছাড়বেন আপনাকে?

হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। আর।

রামভরোসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বর্ণ দিদিজী বললেন কি, অরুণাদিদি তো সন্ন্যাসিনী মাতাজী বনে গেলেন। আর তো আসবেন না। কাশী চলে যাবেন কি দেশ-গাঁও নিয়ে বইঠে যাবেন। তুমলোগকে আস্তানামে আসবেন না। তুমলোগকে ছুঁবেন না। অপবিত্র হো যাবেন।

রামভরোসা কথা বলিয়াই চলিয়াছিল। অরুণা কিন্তু ঠিক শুনিতেছিল না, সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমটায় রামভরোসার বাক্য এবং আচরণের মধ্যে যে খানিকটা কিছু অপরিচিত নূতন মনে হইয়াছিল, যাহা সঠিক কি, বুঝিতে পারিতেছিল না—সেইটুকু সে অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়াছে। ওই—"স্বর্ণ দিদিজী বললেন কি অরুণাদিদি তো সন্ন্যাসিনী মাতাজী বনে গেলেন"—ওই কথাটুকু শুনিবামাত্র চকিতের মধ্যে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। রামভরোসা আগে তাহাকে "দিদিজী" বলিত, আজ সে তাহাকে "মাতাজী" বলিয়াছে। সম্ভ্রমের দিক হইতেও তাহার আচরণ অনেক বেশী সম্ভ্রমপূর্ণ।

রামভরোসা বলিতেছিল, মাইজী, যখন শুনলাম আপনি কাশীসে কলকাত্তা হো-কে এখানে লোটকে এসেছেন, আর এসেছেন একেবারে তপস্বিনী বনে গিয়ে, রঙ্গিলা কাপড় ছেড়ে পিহিনেছেন সফেদ কাপড়া, ধরমকে নিয়েছেন শিরপর, তখনই বললাম মনে মনে হাঁ, এহি তো, এহি তো ঠিক হইয়েছে। হামলোগের ভিতর কত

বাতচিত হল। হামলোগ পথ চেয়ে থাকলম কি—আপনি আসবেন হামলোকের আস্তানা ধন্ হোবে। আপ আইলেন না, তখন ভাবলম কি- হম যায়েগা এক রোজ—মাইজীকে দেখে আসব। তো আপলোকের দলের আদমী বললে ওই বাত। ফির দিদিজীকে পুছ লাম—উ ভি বললে ওই বাত। মনমে ডর হো গেল। বললম কি হাঁ, মাইজী ধেযান করছেন কি পূজা-উজা কুছু করছেন হামি যাব তো উসমে গড়বড় হোগা, মাইজীর হয়তো গোসা হো যাবে।

অরুণার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। আনন্দ এবং বেদনা এমন করিয়া অনুচ্ছসিত সংঘর্ষহীন সম্রমে মিশিয়া এমন অপরূপ মুক্তবেণীর সৃষ্টি আর কখনও হয় নাই, অন্তত তাহার জীবনে হয় নাই। চোখের জল তাহার বাঁধ মানিল না। চোখের কোণ হইতে মুক্তধারায় গড়াইয়া আসিল। রামভরোসার সামনে এ চোখের জলের জন্য সে কোন সংকোচও অনুভব করিল না।

মাইজী! রামভরোসা খানিকটা সমস্যায় পড়িল। মাইজী কাঁদিলেন কেন?

অরুণা হাত বাড়াইয়া রামভরোসার হাত ধরিল রামভরোসা!

মাইজী।

ও সব মিথ্যে কথা। ওদের মনগড়া কথা। আমি সেই আছি বাবা, কোনখানে আমি বদলাই নি। আমি বিধবা। আমি শুধু বিধবার ধরম—তার নিয়ম আগে মানতাম না আজ সে নিয়ম মেনেছি।

রামভরোসা এবার সাহস পাইয়া অরুণার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মানতে হবে মাইজী না-মানলে দুনিয়াতে থাকবে কি বল? দুনিয়া যে ধরম হারিয়ে [illegible] একদিন [illegible] হো যাবে। হামার বাপজী [illegible] এক সতী [illegible]—

রামভরোসার কথা চাপাইয়া দিয়া ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ উচ্চ বাঁশি বাজিয়া উঠিল। গোটা ইয়ার্ডটা যেন সচেতন হইয়া উঠিল। কোথা হইতে কে হাঁক মারিল—হো হো—পয়েন্টসম্যান!—এ রামভরোসা।

রামভরোসা হাঁক দিল ঠাহর যাও!

তারপর ব্যস্ত হইয়া বলিল হাম আভি যাই মাইজী! শান্টিং শুরু হোবে। গাড়ি বোঝাই হো গেয়া।

হ্যা হ্যা। যাও যাও।

রামভরোসা দুইটা মালগাড়ির সংযোগস্থলে লাইন পার হইতে হইতে বলিল হামি যাব মাইজী হামি যাব আপনার বাড়ি। এক রোজ আপকে আসতে হবে মা হামলোককে হিঁয়া। সব কোই—বালবাচ্চা বুঢ্ঢা জেনানা আপকে দর্শন চাহতে হ্যায়।

আবার ইঞ্জিনটা বাঁশি দিল। কাজ শেষ হইয়াছে এইবার ছুটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যন্ত্রদানব। ছুটিবে জংশন হইতে ডাহিনে ছুটিলে চলিবে হাওড়া- সেখান হইতে পোর্ট রেলের লাইন ধরিয়া ডকের প্রান্তে। রাঢ় অঞ্চলের শস্য পণ্য জাহাজে

বোঝাই হইয়া চলিবে- কোন দেশান্তরে।—আপ লাইনে গেলে যাইবে পেশোওয়ার পর্যন্ত।

গাড়ির সারিটা একটা ঘট-ঘট শব্দ তুলিয়া নড়িয়া উঠিল তারপর চলিতে শুরু করিল। লাইনের জোড়ের মুখে ঘটাং-ঘটাং শব্দ তুলিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। অরুণাও চলিতে শুরু করিল। তাহার মন গভীর উদ্বেগে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল রামভরোসাও তাহার উপর বিরূপ এবং দলের অন্য সকলের মতোই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সে অনুমান মিথ্যা জানিয়া শুধু সে আশ্বস্তই হয় নাই সে আজ অনুভব করিল, ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে জানিয়াছে যে রামভরোসা আগের চেয়ে আরও অনেক বেশী ভালবাসিয়াছে তাহাকে। আরও একটা কথা মনে হইল আজিকার আগে কোনদিন কখনও রামভরোসা তাহার সঙ্গে এমনভাবে আপনজনের মতো কথা বলে নাই।

সে চলিতে শুরু করিল।

আগে পাশে দীর্ঘ মাল গাড়িটা তাহার উল্টা দিকে চলিয়াছে।

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

মনে হইল সে কি উল্টামুখে চলিয়াছে?

না।

সে আবার চলিতে শুরু করিল। সারি সারি লাইন গাড়ির ফাঁক দিয়া পার হইয়া সে একেবারে সাইডিং-এর শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখেই কয়েকটা পল্লী। পল্লী। এখানকার প্রতিটি পল্লীই তাহার পরিচিত। ডাইনের পল্লীটা পতিতা পল্লী, বাঁয়েরটায় একটা বিচিত্র বসতি। খড়ে ছাওয়া, পাকা ছাদ কতকগুলা বাড়ি। এ সব বাড়িতে স্থায়ী বাসিন্দা বড় কেহ নাই। দেশ-বিদেশের নানা বিচিত্র ধরনের মানুষ আসিয়া বাসা লইয়া থাকে, কিছুদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে দু-চার-জন শিখ আসে। আরও নানান দেশের নানান জাতের মানুষ আসে। ইরানী জিপসীরা আসে, আগে তাঁবু গাড়িত, এখন বাসা লইয়া থাকে।

সে থমকিয়া দাঁড়াইল। এ পথ ধরিয়া যাইবার কথা তাহার নয়। আরও খানিকটা বাঁয়ে ওই বিদেশীদের আস্তানাটাকে ডাহিনে রাখিয়া যে পথ—সেই পথের কথা মনে করিয়া সে আসিতেছিল। গাড়ির সারির মধ্যে চলিতে গিয়া নিশানা ও আন্দাজ হারাইয়া সে অনেকটা বেশী চলিয়া আসিয়াছে।

—আপনি? আপনি এখানে?

অরুণা চমকিয়া উঠিল। সামনে খানিকটা দূরে দেবকী সেন। হন-হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। সেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে বলিল—আপনাকে কে খবর দিলে?

সবিস্ময়ে অরুণা বলিল—কি খবর?

—তবে আপনি এখানে এ সময়ে?

—আমি জয়তারা আশ্রমে যাব। দাদুর কাছে যাব।

—অ! কিন্তু এ পথে এলেন কেন?

—এ পথে তো অনেকবার যাওয়া-আসা করেছি। পথ আমার জানা। তবু ভুল হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম—এর পরেরটা ধরে যাব।

—অ! আসুন আমার সঙ্গে।

অরুণা নিশ্চিন্তমনে সেনকে অনুসরণ করিল।

—অজয়ের মা আজ এসেছেন—জানেন?

—অজয়ের মা!

—হঁ্যা। বিশ্বনাথবাবুর প্রথম স্ত্রী—আপনার—।

—দিদি? দিদি এসেছেন?

—হঁ্যা।

অজয়? সে?

-তারই খোঁজে এসেছেন।

মানে? অজয় কি—? অজয় কোথায়?

দেবকী সেন মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া অরুণার দিকে চাহিয়া দেখিল।

—দেবকীবাবু!

—এঁ্যা!

—বলুন! কি হয়েছে? অজয় কোথায় গেল?

আর সে বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল, ক্রন্দনের আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

—কাঁদবেন না, আসুন। ওখানেই সব শুনবেন।

বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ধরা গলায় অরুণা বলিল—সে-কি—সে-কি আমার জন্যে এমন করে—?

আবার তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কান্নার স্রোত আবার বাধ ভাঙিয়া বহিয়া গেল।

মূর্তিমতী বৈরাগ্যের মতো রূপ। অজয়ের গর্ভধারিণী—বিশ্বনাথের প্রথমা পত্নী জয়া। বৈরাগ্যের মতো রূপ কিন্তু কোথাও একবিন্দু বিষণ্ণতা নাই। প্রসন্ন মুখ, প্রশান্ত দৃষ্টি। শুভ্র দেহবর্ণ, শুভ্র পরিচ্ছদ। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা—মাথায় ছোটখাটো একটি মেয়ে—অরুণাকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে দেখিল—তারপর বলিল—এস।

অরুণা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। করিবারই যে কথা। মনে মনে অপরাধ-বোধ কাঁটার মতো খোঁচা মারিতেছিল। মনে হইতেছিল—নিজে সে বঞ্চক, ওই মেয়েটিকে বঞ্চিত করিয়া সে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ একদা কাড়িয়া লইয়াছিল। শুধু কাড়িয়া লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার স্বত্বটুকু পর্যন্ত লোপ করিয়া দাবীটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য বিশ্বনাথের সামাজিক সত্তাটুকু মুছিয়া দিয়া তাহাকে অন্য মানুষে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এ অস্বস্তিকর ভাবটুকু ওই বঞ্চিত মেয়েটিই ঘুচাইয়া

দিল। আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিল—যাঁকে নিয়ে তোমাতে আমাতে ঝগড়া বিবাদ হতে পারত ভাই—তিনিই যখন নাই—তখন তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে দুঃখ পাব আমি। এখন তো আমাদের দুজনেরই এক দুঃখ। সুখের অংশ নিয়ে ঝগড়া হয়, এক দুঃখের দুঃখী যারা তাদের ঝগড়া নাই। দুঃখ তাদের বুকে-বুকে মিলিয়ে দিয়ে আত্মায়-আত্মায় মিলিয়ে দেয়।

অরুণা তাহাকে প্রণাম করিয়া পাশে বসিল। অনেক কষ্টে তাহার সঙ্গে আলাপের ভূমিকা করিয়া—নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো অতি সাধারণ অর্থহীন প্রশ্ন করিল—ভাল আছেন আপনি? জয়াকে সে যতক্ষণ দেখে নাই ততক্ষণ তাহার মনে একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এখন সামনে আসিয়া সে যেন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

জয়া বলিল—শরীর আমার ভাই বড় একটা খারাপ কখনও হয় না। তবে অজয়টা আমাকে দুঃখ দিতে চেষ্টা করছে— এই জন্যে মনটা ভাল নাই। বলা নেই কওয়া নেই পালিয়ে এসেছে।

—এখানে এসেছে?

—হ্যাঁ, এখানেই এসেছে। দাদুর সঙ্গে দেখা না-করে সে কোথাও যাবে না। এসেও ছিল দাদুর কাছে।

—কবে?

—দিন সাতেক আগে। দাদু লিখলেন—অজয় এসেছিল—বোধহয় না বলেই চলে এসেছে। আমার কাছে একবেলা থেকে—একটু ঘুরে আসি বলে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরে নাই। সে কাশী ফিরেছে কি না জানাবে। কি করব, অগত্যা ছুটে এলাম।

—খোঁজ পেয়েছেন কিছু? এই তো ছোট একটুখানি শহর—এখানে সে লুকিয়ে থাকবে কোথায়?

—খোঁজ কিছু পাইনি! দেখি, ফিরবেই তো। না ফিরে যাবে কোথায়?

—না ফিরে যাবে কোথায়! এ আপনি কি বলছেন?

এবার যেন আর একটি মানুষ এই সহজ সরল মানুষটির ভিতর হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল। জয়া বলিল—নাই যদি ফেরে, তাই বা কি করব? একটি হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল—বিচিত্র বিস্ময়কর রূপ সে হাসির। কণ্ঠস্বর অনাসক্ত। প্রসন্ন। বিষণ্ণতার এতটুকু স্পর্শ নাই।

অবাক হইয়া গেল অরুণা।

ঠিক এই সময়েই খড়মের শব্দ বাজিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন আসিতেছেন। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেবকী সেনের সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইলেন।—সেন সংবাদ দিলে তুমি এসেছ।

অরুণা তাঁহাকে প্রণাম করিল।

জয়া আসন পাতিয়া দিল, ন্যায়রত্ন বসিয়া বলিলেন—জয়া এসেছে কাল। তোমায় খবর দিতে বলেছিল। আমি বলেছিলাম—জয়ারই গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করাটা

উচিত হবে। জয়া যেত, তুমি তার আগেই এসে পড়েছ। ভালই হয়েছে।

অরুণা ও-সব কথা এড়াইয়া একেবারে বলিয়া বসিল—আপনার কাছেই আমি আসছিলাম। প্রশ্ন ছিল একটা। কিন্তু পথে দেবকীবাবুর মুখে অজয়ের কথা শুনে সে প্রশ্ন আমার আর মনেই নেই, শুধু একটা কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করব।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল, অথচ—ওই প্রশ্নটাই তাহার মনের মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেই তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

ন্যায়রত্ন তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

অরুণা বলিল—এ কথার সত্যি জবাব আমাকে আর কেউ হয়তো দেবেন না। আমি দুঃখ পাব বলেই দেবেন না। কিন্তু আপনি নিজে দুঃখকে ভয় করেন না, দুঃখ মিথ্যে বলেই ভয় করেন না। আপনি আমাকে বলুন—অজয় যে ঘর ছেড়ে মাকে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করে—আপনার কাছ থেকেও চলে গেল, সে কেন? তার কারণ কি আমি?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর একবার কাঁপিল না বা কোনক্রমে সঙ্কুচিত হইল না। বলিলেন—হ্যাঁ।

অরুণা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তারপর বলিল—তার অভিযোগটা কি? আমার বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু আপনাদের অপরাধটা কি? আমাকে স্বীকার করা?

ন্যায়রত্ন হাসিলেন, ওই স্নিগ্ধ হাসিই অরুণার কথার জবাব। ওই হাসিই বলিয়া দিল—হ্যাঁ।

অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমি আপনাদের সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখব না, অজয়কে বলবেন।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—সে তো জয়াও পারবে না। বিশ্বনাথ তাকে তার শেষ-পত্রে অনুরোধ করে গিয়েছে।

অরুণা চকিত হইয়া মুখ তুলিল। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ জয়াকে শেষ-পত্রে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে? শেষ-পত্র?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—জেলের হাসপাতালে মৃত্যুশয্যা থেকে সে জয়াকে পত্রখানি লিখেছিল। এই একখানি পত্রই সে লিখেছিল, সম্পর্ক ভঙ্গের পর। আমি সে পত্র দেখিনি। জয়া আমাকে কাল এসে দেখালে। তোমাকে সে বিবাহ করেছিল, ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল—এসব কোন কথাই আমি জানতাম না। মৃত্যুশয্যায় আমার সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। তুমি ছিলে তার শেষ-শয্যার পাশে, তুমি জান সে তোমাকে কিছু বলে গিয়েছিল কি না। আমি যখন গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন সৎকার হয়ে গেছে। সংবাদ শুনে আমি জেল ফটক থেকেই ফিরে এসেছিলাম। যাক সেসব কথা। তোমার সঙ্গে জংশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা হল—তুমি এসে দাবী জানালে, ইরসাদ বললে—সে

সাক্ষী, মুসলমান হয়ে সব সম্পর্ক ছেদ করে তোমাকে নিয়ে নূতন জীবন শুরু করেছিল। আগেকার দিন হলে আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতাম না। বার বার অস্বীকার করেছি। করে, আজ যে উপলব্ধিতে পৌঁছেছি তাতে তোমাকে অস্বীকার করতে আমি পারি না—পারলাম না। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে আব কিছু নাই। কঠোর ধর্ম পালন কবে মানুষেব চেয়ে বড কিছু আমি পাইনি। মানুষকে আঘাত কবেছি— বর্জন করেছি—করে, পরে দুঃখ পেয়েছি। তোমাকে স্বীকার করলাম—অজয় না-না বলে ছুটে পালাল। কিন্তু কি করব? অজয়কে আমি ত্যাগ করিনি। সে-ই ত্যাগ করলে আমাকে। করুক। আমি এখানেই থেকে গেলাম। আমার গৃহ-দেবতা নিয়ে সমস্যা—ওটা নিতান্তই ছদ্ম একটি আবরণ। গৃহদেবতার সেবার জন্য জমি আছে। জমির জন্য অনেকে নেবেন পূজার ভার। তা ছাড়া, আমাদের বংশেব নির্দেশ আছে—যদি কোনদিন কোন কারণে গৃহদেবতার পূজা অচল হয়—যদি নির্বংশ হয় মহাগ্রামের এই ঠাকুরবংশ—তবে যে জয়তারার আশ্রম থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই জয়তারা আশ্রমেই ফিরে যাবেন এই বিগ্রহ এবং তার সঙ্গে যাবে, তার সমুদয় দেবোত্তর। আমি বিগ্রহ জয়তারার আশ্রমেই এনে রেখে—এখানেই থেকে গেলাম, তার কারণ ওই অজয়। আমি কাশী ফিরে গেলে অজয় আমার উপর অভিমান করে হয়তো নিষ্ঠুর একটা-কিছু করতে পারে। কিন্তু জয়া যে বিশ্বনাথের অনুরোধ আদেশ বলে শিরোধার্য করে অজয়ের সঙ্গে বিরোধ ঘটাবে—সে কি করে জানব? অজয় এল, বলল—ঠাকুর, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম—একটা কথা?

বললাম—বল কি কথা?

বললে—আপনি কাকে চান? আমাকে, না—ওই—

কি বলে তোমাকে বুঝাবে ভেবে পেলে না। মা বলতেও চায না, আবার নাম ধরে—কি কোন অসম্মানজনক উক্তি করেও বুঝাতে বাধে। আমি বুঝলাম, বুঝে আমিই কথা জুগিয়ে দিলাম, বললাম—কার কথা বলছ? আমার কনিষ্ঠা পৌত্রবধূর?

বললে—হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাঁর কথাই বলছি।

বললাম- ভাই, আমাব তো আর চাওয়ার দিন নাই। এখন যাওয়ার ভাবনাই বড়। এ সময় কাউকে আঁকড়ে আমি ধরে নেই। তবে স্বীকার-অস্বীকারের কথা যদি বল—তবে বলব বিশ্বনাথ আমার পৌত্র—। তুমি যেমন তার পুত্র—সে তেমনি তার স্ত্রী। বিশ্বনাথ যে ধর্মই গ্রহণ করুক—সে আমার পৌত্র—এ সত্যটা যখন কিছুতেই ঘুচবে না, তখন তুমিই বল—কেমন করে আমি অস্বীকার করে বলব—সে আমার কেউ নয়? বললাম, তার চেয়ে তোমরা সকলেই আমাকে মুক্তি দাও। আমি যে মুক্তি নিয়েছি—সেই মুক্তিকে তোমরা সকলেই স্বীকার করে নাও। বল—তুমি মুক্ত। তোমার উপর আমাদের কোন দাবী নাই। তুমি আমাদের কেউ নও।

শুনলে, কোন জবাব দিলে না। দ্বিপ্রহরের পব—আসছি, বলে চলে গেল।

ন্যায়রত্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কাল জয়া এল, তার মুখে শুনলাম। সেখানে

মায়ের সঙ্গে এই প্রশ্ন নিয়ে তার বিরোধ হয়েছে বলে— সে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। জয়া তাকে বিশ্বনাথের পত্র দেখিয়েছে—বলেছে, তাঁর আদেশ অমান্য করতে আমি পারব না।

অরুণা বলিল—সে পত্র আছে? আমাকে দেখাবেন একবার?

—তুমি দেখবে?

দৃঢ়কণ্ঠে অরুণা উত্তর দিল—হ্যাঁ—আমি দেখব।

ন্যায়রত্ন জয়াকে বলিলেন—পত্রখানি দাও। পড়ে দেখুক।

পত্রখানি হাতে লইতেই অরুণার হাত কাঁপিয়া উঠিল। কঠিন সংযমে নিজেকে দৃঢ় করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর পত্রখানি খুলিল।

বিচিত্র পত্র, বিশ্বনাথেরই উপযুক্ত পত্র।

হাসপাতালে বোধহয় মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছি, চিকিৎসকেরা সঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। সঙ্গী-সাথীরাও সঠিক বুঝিতেছেন না, কিন্তু আমি বুঝিতেছি—এ শয্যা হইতে আমি উঠিব না। দাদু বলিতেন, তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম, আজ অনুভব করিতেছি—হয়তো আমাদের বংশগত সাধনার প্রভাব আমার রক্তধারায়, আমার দেহকোষে যে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহার গুণেই আমার অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে মিলাইয়া অনুভব করিতেছে। আমার সমস্ত দেহমন—একটি তিক্ত বিস্বাদে ভরিয়া গিয়াছে। এক অসহনীয় অস্বস্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর সর্ব বস্তুতে—শুধু জিহ্বার অরুচি নয়—সমস্ত কিছুর প্রতি একটা বিরাগের অরুচি আসিয়াছে। কিছু খাইতে ভাল লাগে না, কোন মানসিক আকাঙ্ক্ষাও আর নাই। শুইয়া-বসিয়া বিশ্রামের শান্তি পাই না, ঘুম হয় না। অথচ মনে হয়, একটা গভীর নিদ্রার প্রয়োজন। তাহা হইলেই বাঁচি। দাদু বলিতেন—এই হইল মৃত্যুর স্পর্শ, বর্ষণের শান্তির পূর্বে রৌদ্রের প্রখরতার মতো এটুকু আয়োজন-পর্ব। এবং মন আমার বলিতেছে—দিন নাই—দিন নাই—দিন নাই। তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই, আমি ও-ভাবনায় নির্ভয় এবং প্রসন্ন।

শুধু কয়েকটা কথা তোমাকে জানাইতে চাই।

তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম—তাহার কারণ তুমি জান।

আমার জীবন-বিশ্বাসে—তোমাদের জীবন-বিশ্বাসে অনেক প্রভেদ। অনিবার্যরূপে তোমাদের সঙ্গ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। না হইলে—আমার বিশ্বাস বিসর্জন দিয়া তোমাদের লইয়া অন্য জীবন যাপন করিতে হইত। কারণ তোমরা অর্থাৎ তুমি বা দাদু আমার পথের পথিক হইতে পারিতে না। এ লইয়া কোন অনুশোচনা আমার নাই। যাক, তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই। আমি আইনগতভাবে ধর্মগত পদ্ধতিতে তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া অরুণা সেন নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম—পরে আবার হিন্দু হইয়াছিলাম। সে আমার কর্মসঙ্গিনী। জীবন-বিশ্বাসে আমরা এক সম্প্রদায়ের মানুষ। তোমাকে বিবাহ করিয়া প্রথম যৌবনে যেমন সুখী

হইয়াছিলাম—তেমনি সুখী হইয়াছিলাম। সে কলিকাতায় তাহার পিত্রালয়ে আছে। আসিবার পূর্বে পত্র লিখিয়াছি।

মৃত্যুকালে অনেক ভাবনা ভিড় করিয়া আসিতেছে।

আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দিলেও তোমরা চুকাইয়া দাও নাই এইটাই প্রথম ভাবনা। ভাবিতেছি—যাচাই করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, সেখানে তো ফাঁকি নাই। তুমি ধর্মবিশ্বাস এবং ভালবাসা, দুইটাকে এমন এক করিয়া লইয়া আমাকে মনে করিয়াই রিক্ত জীবনযাপন করিতেছ—তাহার সম্পর্কে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছি না। অনেকের মধ্যেই এই জীবনে ফাঁকি আছে, অসত্য আছে—কিন্তু তোমার মধ্যে নাই—এ আমি জানি। কোন লোভ তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। সেখানে শুধু যে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসই একমাত্র সত্য—তা-তো নয়। আমি জানি—সেখানে আমার প্রতি ভালবাসাও সমান সত্য—একথা আমার চেয়ে আর তো কেউ বেশি জানে না। আমি পরিত্যাগ করিয়াও আমার উপর তোমার যে দাবী—সে দাবীকে তো উচ্ছেদ করিতে পারি নাই। সে এক অদ্ভুত অক্ষয় দাবী। ভালবাসা ধর্মকে মহীয়ান করিয়াছে—ধর্ম ভালবাসাকে অক্ষয় অমর করিয়াছে। সেখান হইতে আমার স্মৃতির সম্পর্কের মুক্তি নাই। আমি বাহির হইতে যত আঘাত হানিতে যাইতেছি—তত সে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। আমি লজ্জিত হইতেছি। তাই ওখানে হাত দিব না। বারণ করিব না। তাই এ চিঠি লিখিতে আমি বাধ্য হইলাম। নূতন জীবন-বিশ্বাসে আমার যাহা ধারণা, তাহার সঙ্গে না মিলিলেও—তোমার এই শুচি শুভ্রতার প্রতি মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। এই জীবন বিশ্বাস মতো—তোমাকে যে পথনির্দেশ দেওয়া আমার কর্তব্য—তাহা দিব না—কারণ সে উপদেশ তোমার জন্য নয়। তুমি সাধারণ হইতে ব্যতিক্রম।

যাক। অন্য কথা। এইবার বলিব আমার বর্তমান স্ত্রী সম্পর্কে। এককথা আমার শক্তিময়ী জীবনসঙ্গিনী। আমার কর্মের দোসর। ভাবনার সহভাবিনী। আমাদের নূতন জীবন-বিশ্বাস অনুযায়ী সে তাহার পথ বাছিয়া লইবে, দ্বিধা করিবে না, আমিও তাহাকে বলিয়া যাইব। সে পুনরায় বিবাহ করিবে। সুখী হইবে। জীবনের কর্মপথে দোসর খুঁজিয়া লইয়া সে আবার চলিতে শুরু করিবে। নিজে সে শিক্ষিতা মেয়ে আপন জীবিকা সে উপার্জন করিয়া লইতেও পারিবে। ভাবনা কিছুই নাই। তবুও ভাবিতেছি। ভাবিতেছি—তাহার ভালবাসাটাও যদি তোমার মতোই সত্য হইয়া উঠিতে থাকে? ধর্মবিশ্বাসের বাদ দিয়াও তো এমন হয় বা হইতে পারে? তাহার মন যদি আমাকে ভুলিতে না-পারিয়া—জীবনের সমস্ত দাবীকে উপেক্ষা করিয়াই থাকিতে চায়? তাই যদি হয়, কোনদিন রোগে হোক বিপদে হোক—এমন কি বার্ধক্যেও—তাহার আপনজনের আশ্রয়ের বা সেবার প্রয়োজন হয়—সেদিন যদি তুমি বাঁচিয়া থাক—তবে তাহাকে আপনজন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইও। এইটুকু অনুরোধ করিয়া গেলাম। মেয়েটির মা-বাপ নাই। আছে একমাত্র ভাই—সে-ও আমারই মতো রাজনৈতিক কর্মী—তাহারও জীবন অনিশ্চিত, আর আছে খুড়ো এবং খুড়ি।

তাহাদের উপর চিরটা কাল ভরসা করা যায় না। শাহ শাহ'র সম্পর্কে আমার চিন্তা। জানি চিন্তা মিথ্যা। জীবন আপন পথ বাছিয়া লয়। দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া পথ কাবেয়; পওয়ার শক্তি তাহার অদ্ভুত। তবুও তোমাকে লিখিলাম। অবশ্য প্রযোজন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না—কারণ অরুণা যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অসাধারণ দৃঢ়চিত্ত মেয়ে -কর্মপথের সকল স্মৃতির দুর্বলতা পিছনে রাখিয়া সম্মুখে চলিবার শক্তি তাহার আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

চিঠিখানি শেষ করিয়া অরুণা মুখ তুলিল।

জয়া বলিল—এবার চিঠিখানা অজয়কে পড়তে দিতে হবে। দিদিমণি, ... খানিকটা লাগে।

হাসিল সে।

জংশন শহর দ্বারমণ্ডল বিচিত্র স্থান।

অরুণা বলিয়াছিল—এইটুকু জায়গায় অজয় কোথায় লুকাইয়া থাকিবে? কিন্তু এইটুকু জায়গা বলিতে যে কথাটা বুঝায়, জংশন দ্বারমণ্ডল তাহা নয়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তাহার পরিধি খুব বড় নয়, কিন্তু জটিলতায় সে অত্যন্ত কুটিল। একটা মহানগরীতে যাহা আছে—এখানেও তাহার সবগুলিই আছে, অবশ্য কম পরিমাণে। কিন্তু জট—সে ছোটই হউক আর বড়ই হউক—সে পাকাইয়া উঠিলে, জমিয়া গেলে—তাহার প্রকৃতি এক।

এইটুকু জায়গা—কিন্তু শহরের মতোই এখানে কেহ কাহাকেও বড় চেনে না। গলিঘুঁচি পাড়া-পটি জাতি-সম্প্রদায় এখানে মিলিয়া মিশিয়া চালে-ডালে-সাবধায় একাকার হইয়া গিয়াছে।

অরুণা নিজেই কয়েকদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরিয়া বেড়াইল। হাটে বাজারে সকাল হইতে নয়টা পর্যন্ত ঘুরিয়া ইস্কুলে যাইত, ইস্কুলের ছুটির পর—আবার একদফা ঘুরিত। স্টেশনে গিয়া ঘুরিয়া দেখিত। প্রতিদিন এই সময়েই কলিকাতার গাড়িতে খবরের কাগজ আসে। এ যুগের ছেলেরা খবরের কাগজের আকর্ষণ অনুভব করিবে ইহা স্বাভাবিক। আরও একটা কথা -আপ এবং ডাউন ট্রেন দুইটা এইখানে একই সময়ে ক্রসিং হয়। কোথাও যাইতে আসিতে নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। স্টেশনের বাহিরেই যেখানটা হইতে বাস ছাড়ে—সে জায়গাটাও নজরে পড়ে। মোটর বাসেরও এখান হইতে চার-পাঁচটা রুট আছে।

ট্রেন আসে, প্ল্যাটফর্মটায় চাপবন্দী মানুষ শুধু নড়ে-চড়ে। মৌমাছির চাকে ঢিল দিলে কি খোঁচা দিলে মাছিগুলার মধ্যে যেমন একটা চাঞ্চল্য জাগে, ভন-ভন শব্দ করিয়া তোলে, ঠিক তেমনি ভাবেই চলা-ফেরা, নড়া-চড়া ও কলরব করিয়া একদল মানুষ গাড়ি হইতে নামে, একদল ওঠে। গাড়ি দুইখানা তাহাদের নির্দিষ্ট সময়ে বাঁশি বাজাইয়া হুস হুস শব্দে ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়। প্ল্যাটফর্ম দুইটা আবার শান্ত জন-

বিরল হইয়া পড়ে। অরুণা আরও কিছুক্ষণ থাকে ওই ওভারব্রিজের উপর। লোকগুলি বিভিন্ন রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িয়া মিশিয়া যায় জংশন শহরের গলি-ঘুঁচির মধ্যে। আর তাহাদের চিনিয়া বাহির করা যায় না। অরুণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আরও কিছুক্ষণ ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া দূর—দূরে পর্যন্ত প্রসারিত বেললাইনের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া একবার রামভরোসার সঙ্গে দেখা করে। রামভরোসাকে সে বলিয়া রাখিয়াছে—ট্রেনের সময় সেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

রামভরোসা খুব ভাল করিয়া না-হইলেও অজয়কে দেখিয়াছে এবং চিনিতে পারিবে বলিয়াই মনে করে।

—রামভরোসা। অরুণা কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

—নেহি মাঈজী। রামভরোসা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে, অর্থাৎ সে কোন সন্ধান পায় নাই।

অরুণা সেখান হইতে ফিরিয়া স্টেশনের বাহিরে নলিনের গিরিন-কেবিনের সামনে গিয়া দাঁড়ায়।

নলিনকেও সে বলিয়াছে। নলিনও তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। নলিন অজয়কে দেখিয়াছে। নলিন বলিয়াছে—একবার দেখলে কি হবে—তিনি যে তাঁর বাপের মতো দেখতে; বিশ্বনাথবাবুকে যে দেখেছে, সে তাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

শুধু কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। একদিন একখানি ছবি বাহির করিয়া অরুণার হাতে দিয়া বলিয়াছিল—দেখুন ঠিক হয়েছে কি-না?

একটু হাসিয়া কাঁধ দুইটা নাড়িয়া অস্বস্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—আমরা তখন তো ছেলেমানুষ—বিশ্বনাথবাবুকে দেখতাম কঙ্কণার ইস্কুলে যেতেন—দেবু ঘোষের কাছে আসতেন। তখন ফাস্ট কেলাসে পড়তেন। একদিন, মনে আছে—আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমি মেঘের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখছি মেঘগুলো ফুলছে—কাঁপছে—আর রকম রকম ছবি হচ্ছে। এই একটা পাহাড়ের চুড়ো—দেখতে দেখতে এই একটা মানুষ হয়ে গেল—তার পরেই দেখতে দেখতে হয়তো লম্বা হয়ে কেটে দুখানা হয়ে হল চার পা-ওয়ালা একটা জন্তু। বিশ্বনাথবাবু দেখে—আমাকে ডাকলেন—তা আমি শুনতে পাই নাই। তখন চুপি-চুপি এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন। আমার মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল—তিনি একটা পাকা কলা ছাড়িয়ে আমার মুখে টপাস্ করে ফেলে দিলেন। বোশেখ মাস—কাদের ফলদানের ব্রতের কলা পেয়েছিলেন। সেই কলা। আমি বেকুব হয়ে তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালাম; তো জিজ্ঞাসা করলেন—হাঁ করে কি দেখছিলি? আমি লাজে বলতে পারি না—তিনিও ছাড়েন না। শেষে বললাম—মেঘে ছবি দেখছিলাম তা, তিনি বললেন—মেঘে ছবি? সে কি? আমি বললাম—হ্যাঁ, মেঘে ছবি হয়। পাহাড় হয়—মানুষ হয়, আবার জন্তু-জানোয়ার হয়—কত রকম হয়। তিনি বললেন—কই দেখা আমাকে। তখন দেখালাম। তিনি পরের দিন একটা লাল নীল পেনসিল কিনে দিয়েছিলেন। সেইদিনকার তাঁর স্মৃতি—আমার চোখে জ্বলজ্বল করছে। বুঝেছেন না, সেদিন যখন অজয়বাবু

নামলেন ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে—আমি একেবারে চমকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন তিনি।

একটু হাসিয়াছিল নলিন—তাহার স্বভাবগত সেই সলজ্জ অপ্রতিহত হাসি। হাসিয়া বলিয়াছিল—কাল বিকেলে আপনি বললেন অজয়ের খোঁজ করতে, রাতে বাড়িতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে সেই সব কথা মনে হল। তা পরেতে এঁকে ফেললাম ছবিখানা। বলি—দেখি, কেমন মনে আছে। তা দেখলাম—ঠিক মনে আছে।

আবার বার কয়েক ঘাড় নাড়িয়া, অস্বস্তিকর অঙ্গভঙ্গি করিয়া—বোধহয় সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া বলিল—আপনি তো সে সময়ের বিশ্বনাথবাবুকে দেখেন নাই! আপনি তাকে—। কথাটা আর শেষ করিল না সে, একটু বিচিত্র হাসি হাসিল। বোধহয় বুঝাইতে চাহিল যে, সে বিশ্বনাথ ছিল অপরূপ, অপূর্ব। পরবর্তীকালের শহরের মার্জনায় উজ্জ্বল যুবক বিশ্বনাথ অপেক্ষা সেই কিশোর বিশ্বনাথ অনেক মনোহর ছিল।

অরুণা হাসিল। আর কোন কথা বলিল না। কেমন করিয়া বলিবে—সেই কিশোর বিশ্বনাথই তাহার ভালবাসার দেউলে দেবতার মত অক্ষয় হইয়া আছে! কিন্তু এই বিচিত্র গ্রাম্য চিত্রকরটির আশ্চর্য শক্তিতে সে বিস্মিত হইয়া গেল। বিশ্বনাথের কৈশোর, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র বিশ্বনাথ, সে তো আজ হইতে আঠারো-উনিশ বৎসর পূর্বের কথা! সেই দিনের একটি বালকের চিত্তে সমাদরের স্মৃতি হয়তো অক্ষয় হইয়াই আছে, তবু সেই স্মৃতি হইতে এমন ছবি আঁকা তো সহজ নয়! প্রসন্ন, মুগ্ধদৃষ্টিতে অরুণা নলিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নলিনের শক্তির কথা তাহার না-জানা নয়। দেবু তাহাকে দিয়া যে-সব প্রাচীরপত্র আঁকাইয়াছিল সেগুলি সত্যই ভাল হইয়াছিল। নলিনের হাতের তৈয়ারি পুতুল এখানে তো সকলের চিত্তই জয় করিয়াছে; এই সেদিন—সেই বুড়ো পুতুলটা লইয়া কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার মূলে তো ছিল সে নিজেই। কিন্তু সে শক্তির সঙ্গে এ শক্তির অনেক প্রভেদ। অনেক! মুহূর্তের জন্য সে আপনার কথা ভুলিয়া গেল। মুগ্ধ, প্রসন্নদৃষ্টিতে নলিনের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি এত ভাল ছবি আঁক নলিন? এত ভাল!

নলিন একেবারে লজ্জা ও সঙ্কোচের অস্বস্তিতে ম্রিয়মান হইয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া অনবরত ডান হাতখানা দোলাইতে শুরু করিল।

—এটা আমি নিলাম নলিন।

—বেশ। বেশ। নিন। হ্যাঁ—ও তো আপনার লেগেই —। মানে আমি নিয়ে কি করব?

—কি দিতে হবে বল?

—কি দেবেন? অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল সে।

—হ্যাঁ।

নলিনের পয়সার গরজের কথা অরুণা জানে।

নলিন বলিল—উ কিছু দিতে হবে না। উ আপনি নেন। আমি এঁকেছিলাম —বলি দেখাব আপনাকে যে, অজয়কে দেখলেই আমি চিনতে পারব। বলিয়াই সে হন হন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। খানিকটা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। মাথা

হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—আপনাকে খুব ভক্তি করি আমি। আগে ভয় লাগত। যেদিন কঙ্কণার বাবুদের ছেলেটার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নিয়েছিলেন—সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আপনি এখন দেবতা হয়ে গিয়েছেন, খুব ভক্তি হয় আমার। মায়ের মতন ভক্তি করি।

অরুণার চোখের স্নায়ুগুলির প্রকৃতি হৃদয়ের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাইয়া গিয়াছে। আজকাল সহজেই চোখে জল আসে। একটা ভূমিকম্পে যেন পাথরের শক্ত দেশ ফাটিয়া তলদেশের জলের উৎসগুলি উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। অরুণা কাঁদিতে চাহে নাই—তবু চোখে জল আসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিল।

নলিন বলিল—চোখে আমার পড়তেই হবে। আমি ঠিক সন্ধান বার করব। আমি ইষ্টিশানের ফটক আগুলে বসে থাকি। আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কোথা?

আজ সে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া নলিনের গিরিন-কেবিনের সম্মুখে দাঁড়াইল।

—নলিন!

নলিন খুব ব্যস্ত। অনেক পুতুল লইয়া সে সাজাইতে বসিয়াছে। গিরিন-কেবিনের কাঠের শেল্‌ফের পিছন দিকে পুতুলের ঝুড়িগুলি হইতে সন্তর্পণে প্রত্যেক রকমের পুতুল দুইটা করিয়া বাহির করিতেছিল। সে বোধহয় তন্ময় হইয়া ছিল, কথা সে শুনিতে পাইল না।

সামনেই বাসগুলা দাঁড়াইয়া আছে। যাত্রীরা কতক বাসে চাপিয়াছে, কতক বা চা-পান-মিষ্টির দোকানে বসিয়া আছে।

—নলিন!

—কে?

মুখ বাড়াইয়া অরুণাকে দেখিয়া নলিন বলিল—অ।

সে বাহির হইয়া আসিল।—আমি বুঝতে পারি নাই।

—খোঁজ কিছু পাওনি?

—না। আমি খুব ব্যস্ত। মানে গাজন এসেছে কি-না। মেলা যাব। তা-ছাড়া গাজনের সঙের লেগে এবারে আবার ছবি এঁকে দেবার ভার পড়েছে। কাল থেকে আর একবারও বেরুতে পারি নাই। আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক খোঁজ করব।

অরুণা সেখান হইতে চলিয়া আসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।—"আমি খোঁজ করব।"—আর কবে খোঁজ করিবে? আজ এক সপ্তাহ অজয়ের মা আসিয়াছে, তাহারও এক সপ্তাহ পূর্বে—অজয় আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে কেহই তাহাকে দেখিল না?

এবার সে ফিরিল। এইবার গৌরের কাছে যাইবে। গৌরকেও সে বলিয়াছে। তাহার জীবনের গতি পরিবর্তনের ফলে—রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ প্রায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দলের প্রত্যেক সভাই তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সে নিজেও

সরিয়া আসিয়াছে। কাছাকাছি হইলেই পরস্পরের অন্তরের উত্তাপের সংঘর্ষণে বজ্রপাত হইবার সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠে। কিন্তু গৌরের সঙ্গে তাহার অন্তরের যোগ যেন বিচ্ছিন্ন হয় নাই! বিচিত্র ছেলে, অদ্ভুত প্রাণশক্তি। কোন মতবাদ, কোন দলবাদ তাহার প্রাণশক্তিকে আচ্ছন্ন বা আয়ত্ত করিতে পারে না। অপরে যেখানে ভাসিয়া যায় প্রবল স্রোতে—সেখানে সে স্বচ্ছন্দে জলের উপর মাথা তুলিয়া সাঁতার কাটিয়া চলে। গান গায়, পা আছড়াইয়া জল ছিটাইয়া কৌতুক করে। দূরের খাতে যে বা যাহারা সাঁতার কাটে, ভাসিয়া চলে—তাহাদের সঙ্গে চিৎকার করিয়া আলাপ করে। আশ্চর্য। গৌর লেখাপড়া শেখে নাই, গৌর মূর্খ, স্বর্ণ দেবু লেখাপড়া শিখিয়াছে! সে কথা যাক। বিচিত্র গৌর। অদ্ভুত ছেলে। সংসারের সকল দিক দিয়াই আশ্চর্য রকমে নিজেকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। খবরের কাগজ বিক্রি করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বর্ণ ও দেবুর সংসারে মাসে দশটাকা হিসাবে দেয়, দুই বেলা ভাত খায়। ব্যস। টাকাটা নিয়মিতই দেয়, কিন্তু খাওয়াটা নিয়মিত নয়। জংশনের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাইকেল ঠ্যাঙাইয়া কাগজ বিলি করিয়াই বাহির হইয়া যায়—পুরানো দ্বারমণ্ডলে। সেখানে এবং কাছাকাছি দুখানা গ্রামে একখানা হিসাবে দুখানা কাগজ বিলি করিয়া জংশনে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু সব দিন ফেরে না। কোথায় কাহার বাড়িতে কোনদিন আড্ডা জমাইয়া—ভাত হোক—চিঁড়া মুড়ি হোক—খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া, সকালে আর একদফা সাইকেল ঠ্যাঙাইয়া আরও খান দশেক গ্রামে খান পনের কাগজ ফেলিয়া দিয়া এগারটা নাগাদ ফিরিয়া আসে। দুই-একদিন তাও আসে না। দিনের খাওয়াটাও কোথাও সারিয়া—ফেরে আপ ট্রেনের ঠিক আগে। এইটিতে কখনও ভুল হয় না। স্বর্ণ দেবু এবং অন্যান্য সহকর্মীদের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সে অরুণাকে বলিয়াছিল—ভারী ইয়ে হল—অরুণাদি! এদের ধারাধরন দেখে—

হাসিয়া অরুণা বলিয়াছিল—কিয়ে হল? তোরও শেষে লজ্জা হল গৌর?

—না-না-না। লজ্জা-টজ্জার ধার আমি ধারি না। ইয়ে মানে—দুঃখ হল। কি রকম এরা? আমি তো—। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আপনার মধ্যে কি পরিবর্তন দেখলে ওরাই জানে! আপনি তো সেই মানুষই আছেন। শুধু থান কাপড় পরেছেন আর একাদশী করেছেন—এতেই ক্ষেপে গেল ওরা? স্বর্ণকে সেদিন আমি বলেছি। তুই যে ঘরে সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালিস, ধুনো দিস, মাংস খাস না!

—থাক থাক। আর পণ্ডিতি করতে হবে না গৌর, তুই থাম।

—কেন? এর আবার পণ্ডিতি কোথায়? ওগুলো তো এতদিন ধরে ধর্মের নামেই চলে আসছে। স্বর্ণ-ই বল, আর দেবু বল—এগুলো যে ওরা মানে, সে তো সেই ছেলেবেলার মেনে-আসা থেকেই মানছে।

—ওহে গৌর। ও সব কথা থাক। কারুর দোষ ধরে, খুঁত ধরে, বিচার করতে আর আমার ভাল লাগে না ভাই। স্বর্ণ কি দেবুবাবুর নিন্দে তুই আমার কাছে করিস নে। ওতেও আমি দুঃখ পাব। ওরা আমার নিন্দে করেছে শুনলে যত দুঃখ পাব, তার চেয়ে কম পাব না।

গৌর আবার অতি স্বল্প মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল—অরুণাদি, আপনি কিন্তু সত্যিই খানিকটা পাল্টেছেন। এইবার আমার চোখে সেটা ধরা পড়ল। আগে আপনি দুঃখ পেতেন না। নিজের নিন্দেতেও না। রাগে জ্বলে উঠতেন। এখন পরের নিন্দেতেও দুঃখ পাচ্ছেন। চোখে আপনার জল আসছে। কাঁদতে শুরু করেছেন—পরিবর্তন আপনার হয়েছে।

অরুণা বলিয়াছিল—মানুষ তো পাল্টাবেই ভাই। সেই তো নিয়ম।

—সে অবস্থা পাল্টালে—যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ যুদ্ধ করে সেটা ভাঙলে তখন সে পাল্টায়।—যাক গে। আপনি পাল্টেছেন তাতেই বা কি? আপনাকে আমার ভাল লাগে, ভালবাসি। সেটা কেন যাবে? সেটাই যদি যায় তবে আর—ওই ঠাকুর মশাই—আপনার দাদাশ্বশুরের দোষ কি? যার সঙ্গে তাঁর মতে মেলেনি, তিনি তাকেই বর্জন করেছেন, কটু কথা বলেছেন। ছেলে, নাতি—

—না-না গৌর, তাঁর সমালোচনা থাক। ও সব বলিস নে। কারুর নিন্দেতে কারুর সমালোচনাতেই আর দরকার নেই ভাই। আমায় তোর ভাল লাগে—আমায় ভালবাসিস। আমার একটা কাজ কর। তুই তো ভাই জংশন শহরের চারিপাশের সর্বজ্ঞ, সবই তোর নখদর্পণে; অজয়ের সন্ধান আমায় করে দে। তুই তাকে ভাল করে চিনিস, তার সঙ্গে সঙ্গে কাশী গিয়েছিলি। তাকে তুই খুঁজে বের করে দে। আমি যে তার মায়ের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারছি না।

গৌর বলিয়াছে—আচ্ছা। তিন দিনের মধ্যে খবর এনে দিচ্ছি।

তিন দিন আজ সাত দিন হইয়া গেল। গৌরও কোন সন্ধান আনে নাই। আজ আবার দিন তিনেক গৌরেরই কোন পাত্তা নাই। গৌরের কাগজবিলির কাজ করিতেছে অন্য একটি ছেলে। দলের মধ্যে আবার গৌরের একটি নিজস্ব দল আছে, সেই দলেরই একটি নতুন ছেলে। অরুণা গতকাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তুমি কাগজ দিচ্ছ, গৌর কোথায়?

—বলে তো যায়নি। আমাকে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিল, আমি তো সদর শহরে থাকি; খবর পাঠিয়েছিল—পত্রপাঠ আসবে, ডাউন প্ল্যাটফর্মে ডাউন ট্রেনের সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। দেখা হল—তখন গৌর-দা ট্রেনে চড়েছে। বললে—আমি যতদিন না-ফিরি, কাগজ বিলির ভার তোমার উপর রইল। তুমি সব জান তাই তোমাকেই আনালাম। বলতে বলতে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

গৌর কবে ফিরিবে কে জানে!

সেই খোঁজেই সে চলিল। গৌর ফিরিয়াছে কিনা খোঁজ করিতে হইবে। ওভার-ব্রিজের উপর হইতে যতটা সে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছে তাহাতে গৌর নামে নাই। তবে রাজনৈতিক দলের কর্মী ফিরিল কিনা ওইটুকু লক্ষ্য করিয়াই বুঝা যায় না। আগের ছোট স্টেশনে নামিয়া থাকিতে পারে। তারপর পায়ে হাঁটিয়া ফিরিবে বা ফিরিয়াছে।

বাজারের পথ ধরিল সে।

চৈত্র মাসের অপরাহ্ণ। জংশন শহরের পথ-ঘাট ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পা

ফেলিতেই ধূলা উঠিতেছে, ছাইয়ের মতো। মিউনিসিপ্যালিটির একচেটিয়া এক বলদের গাড়ি হইতে টিনে জল ভরিয়া রাস্তায় জল ছিটাইবার ব্যবস্থা আছে। সেই জল ছিটানো চলিতেছে। কিন্তু সে এতই অপর্যাপ্ত যে একঘণ্টা হইতে না হইতেই সে জলের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। লোকে এ অঞ্চলের উপমায় বলে—হাজারকি মুড়কির ভিয়েন! অর্থাৎ—অতি কম পরিমাণে গুড় দিয়া—এক হাজার খইয়ের মধ্যে একটি খইয়ে গুড় মাখাইয়া যে নামমাত্র মুড়কি করা হয়—এ-ও তাই। ধূলার হাত হইতে আপন আপন দোকানের জিনিসপত্র বাঁচাইতে অনেক দোকানদার এই কারণে নিজ নিজ দোকানের সামনে নিজেরা আর একদফা জল দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুই দলে জল লইয়া বেশ উল্লাস করিতেছিল।

একজন দোকানী অকস্মাৎ হাঁকিয়া উঠিল—এই, আস্তে। এই জল, এই! শেষটায় চিৎকার করিয়া বলিল—ওরে এই জলওয়ালা উল্লুক!

—আজ্ঞে?

—কালা হয়েছিস না মাতন লেগেছে? দেখছিস না উনি যাচ্ছেন! জলের ছিটে লাগবে। ওঁকে যেতে দে।

বিস্মিত হইয়া গেল অরুণা।

—যান মা। চলে যান আপনি।

অরুণা দ্রুত পার হইয়া গেল। সে নিচের দিকে চোখ রাখিয়াই চলিতেছিল। জংশন স্থানটি একটি কুৎসিত জায়গা। ভাল এবং মন্দ লইয়াই সংসার। সব কিছুর মধ্যেই ভালও আছে মন্দও আছে। জংশনে মন্দের পরিমাণটাই বেশি। এখানকার ওই এক তরুণ সম্ভ্রান্ত চুড়িদার পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি ও নিউকাট জুতো-পরা ক্লাব-বিহারীর দল, আর এই বাজারের একদল, তাদের মধ্যে বিড়িওলা হইতে স্টেশনারী দোকানের দোকানদার আছে—যাহাদের বক্র ও শ্লীলতাহীন ইঙ্গিতে এ পথে হাঁটিবার উপায় ছিল না। অরুণাদের একটা নামও আবিষ্কার করিয়াছিল উহারা। রাধে। অরুণা কি স্বর্ণ—কি অমনি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তরুণীকে দেখিলেই তাহারা আকস্মিক চিৎকার করিয়া সকলকে সচকিত করিয়া তুলিত—রা-ধে? জয় রাধে!

কয়দিন অরুণার দেহের মধ্যে রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনের মধ্যে বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মস্তিষ্কের স্নায়ু শিরা প্রচণ্ড ক্রোধে ছিঁড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইয়াছে; চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ছটা ঝিলিক মারিয়াছে।

কাব্যের রাধা নয়, ব্যঙ্গের রাধা। নীচ অশ্লীল মন যাহাদের তাহারা ভস্মকে জলে গুলিয়া কাদা করিয়া শিবের অঙ্গে মাখাইয়া দেয়। রাধার নামে স্বৈরিণীর কলঙ্ক লেপিয়া কদর্থের ইঙ্গিত দিয়া তাহাদের মর্যাদা, তাহাদের চরিত্র, তাহাদের জীবনকে ধূলায় মিশাইয়া দিতে চায়। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিত। সে কারণেই অরুণা এ দিকটা দিয়া বড় একটা হাঁটিত না।

আজ প্রথমেই তাহার সন্দেহ হইয়াছিল—ব্যঙ্গ করিতেছে না তো!

না।—"যান মা চলে যান" কথাটা শুনিয়াই তাহার সে সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। না—

এ বাঙ্গ নয়। সে চোখ তুলিল।

রাস্তায় জনতা ক্রমশ বাড়িতেছে।

চৈত্রের অপরাহ্ণ। চারিদিকে একটি প্রসন্ন মাধুর্য ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছে। ছেলের দল বাহির হইয়াছে, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি—ফিনফিনে ধুতি—চকচকে নিউকাট বা গ্রীসিয়ান কাট জুতা, মুখে সিগারেট। কিছু লইয়া একটা উত্তপ্ত বিতর্ক করিতে করিতে চলিয়াছে। হয়তো বা নূতন কোন নাটকাভিনয় কিম্বা ফুটবল টীম.—নয়তো বা কাহার কোন কুৎসা।

আশ্চর্য! তাহারা অরুণাকে দেখিয়াও এতটুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না।

অরুণা আরও খানিকটা আগাইয়া গেল।

ওই যে। গৌরের অনুচর আসিতেছে। পুরানো নড়বড়ে ঝনঝনে একটা সাইকেল। ডাণ্ডার উপরে একগাদা কাগজ।

—আজ গৌরদার খবর পেলাম।

—কবে আসবে সে?

—দেরি হবে আসতে।

—দেরি হবে?

—হ্যাঁ। লেবার-ইউনিয়নের ইলেকশন যে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাঁড়াচ্ছে কি না!

লেবার-ইউনিয়নের ইলেকশন, গাজনের সঙ, ছেলেদের কোন একটা মিটিং বা অভিনয়। এই সব উচ্ছ্বাসের মধ্যে অরুণা নিচে পড়িয়া গিয়াছে। জংশন দ্বারমণ্ডল—অরুণাকে লইয়া মাতিয়াছিল কিছুদিন। আবার নূতন উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কিন্তু অরুণা তলাইয়া গেলেও মিলাইয়া যায় নাই। সে যেন ফল্গুর মতো নিচে নিচে বহিয়া চলিয়াছে। সে অনুভব করিতেছে সমস্তকিছুর সঙ্গে, সকলের সঙ্গে, একটি সূক্ষ্ম ভাবগত যোগাযোগ।

এখানটায় গাজনের ধুম লাগিয়াছে।

সামিয়ানা খাটানো হইতেছে।

গাজন আসিয়াছে। চৈত্রের শেষ সপ্তাহ। আজ দুই দিন ধরিয়া গোটা জংশন শহরটা ঢাকের শব্দে গমগম্ করিতেছে। বাজারের দক্ষিণ দিকে—যে দিকটায় পুরানো দ্বারমণ্ডল—সেই দিকে বুড়া শিবতলায় প্রাচীনকাল হইতে গাজন চলিয়া আসিতেছে। আগে বুড়া শিবের একটা মাটির ঘর ছিল, এখন সেখানে পাকা ঘর হইয়াছে, সামনের একটা চত্বর বাঁধানো হইয়াছে। একবার সেখানে পাকা টিনের চালাও তৈয়ারি হইয়াছিল, কিন্তু বার-বার তিনবার ঝড়ে টিনের চাল উড়িয়া যাওয়ায় এখন সামিয়ানা খাটাইয়া গাজনের উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবটা বেশ জাঁকালো রকমেরই হয়। দিন তিনেক যাত্রা হয়, মেলা বসে, চড়কের দিন প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক জমায়েত হয়।

ও দিকে—লেবার ইউনিয়নের ইলেকশন আসিয়া পড়িয়াছে।

আর একদিকে আসিতেছে পঁচিশে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

তাহার আগে পয়লা বৈশাখ হালখাতা।

কলিকাতায় ফুটবলের মরসুম আসিতে দেরি থাকিলেও—জংশনের মাঠে ফুটবল পড়িয়াছে।

সুরপতির দল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে। ক্লাবে তিন-তিনখানা নাটক মহলায় পড়িয়াছে। সত্যযুগ হইতে কলিযুগের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃতির সে এক বিচিত্র সমন্বয়। একখানা পৌরাণিক। ফাইনাল হইয়া গেলে—শিল্ড-কাপ বিতরণ এবং অভিনয় একসঙ্গে হইবে।

সবচেয়ে আগে গাজন এবং হালখাতা। গাজনের ঢাক বাজিতেছে। বুড়া শিবতলায় সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে, বাঁশের খুঁটিগুলির গায়ে দেবদারুর পাতা দিয়া ঢাকিয়া রঙিন কাগজের মালা জড়াইয়া সাজানো হইয়াছে। শিবতলায় চারিদিকে ঘিরিয়া দোকানীরা চালা তুলিতে শুরু করিয়াছে। এবারকার আয়োজন—সমারোহ যেন কিছু বেশী। গাজনতলার উদ্যোক্তা জীবন দে সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত চরকির মত ঘুরিতেছে।

জীবন দে—পুরানো দ্বারমণ্ডলের বাসিন্দা। বহুকালের পুরানো গন্ধবণিক বংশের সন্তান। তাহারাই পুরুষানুক্রমে পুরানো দ্বারমণ্ডলের প্রধান ব্যবসায়ী হিসাবে গাজন-তলার ভারপ্রাপ্ত বংশ। গাজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সেকাল হইতেই কিছু জমি আছে—সে জমিরও কিছু অংশ তাহারা ভোগ করে। জীবন দে নূতন কালের ছেলে, সে বি-এ পাস করিয়াছে, ব্যবসার সঙ্গে দ্বারমণ্ডলের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। এখানে বণিক সমিতি গড়িয়াছে, বারোয়ারী গন্ধেশ্বরী পূজার পর্বটিকে জমজমাট করিয়া তুলিয়াছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের গো-সেবা-সমিতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিয়াছে। সুরপতির ক্লাব মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন বোর্ড, এমন কি কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা এ দুয়ের সঙ্গেও তার যোগাযোগ আছে। জীবন দে-র সঙ্গে ঘুরিতেছে রামভল্লা।

রামভল্লাকে জীবন চাকরি দিয়াছে। সেদিন মাড়োয়ারিপটিতে অরুণার ব্যাপার লইয়া ময়েব শেখের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে করিতে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত যে আকস্মিক বিবাদটা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—তাহার মধ্যে রাম যে প্রচণ্ড সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিল—তাহা দেখিয়াই জীবন মুগ্ধ হইয়া তাহাকে চাকরি দিয়াছে।

রাম বহুকালের ডাকাত। লোকে তাহাকে ভয়ই করিয়া আসিয়াছে এতদিন, দুর্জন বলিয়া সযত্নে পরিহার করিয়া আসিয়াছে। সেদিন কিন্তু অরুণার পক্ষ লইয়া যে প্রতিবাদ করিল—সে প্রতিবাদটাকে এ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত হিন্দুই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল এবং তাই উপলক্ষ করিয়াই রাম সকলের প্রশংসা এবং পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করিল এক মুহূর্তে। সেদিন দারোগা পুলিশ আসিয়া রাম এবং ময়েবদের জনকয়েককে থানায় ধরিয়া লইয়াও গিয়াছিল। কিছুদিন আগেই জয়তারা আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে পীরতলা লইয়া অঞ্চলব্যাপী দাঙ্গার যে প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল—তাহার পর এই ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করিতে দারোগা-সাহেব সাহসী হন নাই। বিশেষ অরুণাকে

লইয়া এই বাদানুবাদটিকে সেই ব্যাপারের জের ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

তাহার উপর বাংলাদেশে লীগ মন্ত্রিত্ব—এবং এ জেলার পুলিশ বিভাগটি শামসুদ্দিন সাহেব-দরবারী শেখ-গফুর মিঞার করায়ত্ত। ওদিকে আই-জি সাহেবকে শামসুদ্দিন পুলিস-সাহেব বাবা বলিয়া ডাকেন। মধ্যে শামসুদ্দিন সাহেব রিভলভারের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। কোন বিপ্লবপন্থী গুলি করেন নাই। শামসুদ্দিন সাহেবের নিজের রিভলবারটাই হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল এবং শামসু সাহেবের কপালখানা চার চৌকস বলিয়াই গুলিটা পায়ের মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকিয়াই নিরস্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহাকে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হয়। সেই হাসপাতালে আই-জি সাহেব শামসুদ্দিনকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শামসু সাহেবকে দারোগারা বলিয়া থাকে—দুর্বলের মুগুর—সবলের কুকুর। খুব আস্তে আস্তে বলে শেষ কথাটা। বলে—ঠিক ওই জীবটির মতো লেজ নাড়িয়া সজল চক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শায়িত শামসুদ্দিন শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান দীর্ঘকায় ইংরেজ আই-জির হাঁটু দুটি স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিল—স্যার, আমার চোখে জল আসছে। মনে হচ্ছে আমার মরা বাপ বেহেস্ত থেকে আমাকে দেখতে এসেছেন। আমার বাবার মুখ আর আপনার মুখ ঠিক একরকম। আপনি ইংরেজ। কিন্তু আমার বাবার রঙও কম ফরসা ছিল না।

ঠিক এই মুহূর্তেই সে যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল—উঃ!

সাহেব একটু ব্যস্ত হইয়াই ডাকিয়াছিলেন—ডাক্তার! নার্স।

শামসু বলিয়াছিল—নাঃ, দরকার নাই ফাদার। তুমি শুধু একবার আমার কপালে হাত দাও!

সাহেব হাত দিয়াছিলেন। জাত ইংরেজ আই-জি সাহেবটি ইংরেজ সাম্রাজ্য-রক্ষার প্রয়োজনে দিনকে-রাত রাতকে-দিন করিতে পারঙ্গম এই লোকটিকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াও গরজের দায়ে ভাল না বাসিয়া পারেন নাই। সাহেবের দপ্তরে শামসু সাহেবের প্রবল প্রতাপ। তাঁহার এক রিপোর্টে দু-চারটি দারোগার চাকরি—এক কলমে খতম হইয়া যায়। কাজে কাজেই রামকে থানায় না আনিয়া পারেন নাই। রামকে আনিতে গেলে মেয়েবদের আনিতে হয়। কিন্তু মেয়েবরা আসিবামাত্র হাফিজুল্লা সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাদের জামিন হইয়া খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। হাফিজ সাহেবরা থানার এলাকা পার হইতে-না-হইতেই জীবন দে আসিয়া হাজির হইল। জীবন বলিল—আমি রামের জামিন হচ্ছি দারোগাবাবু!

দারোগা এটা ভাবেন নাই। রামের জন্য কেহ জামিন দাঁড়াইবে এ তিনি ভাবেন নাই। সেই কারণে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি মেয়েবদের জামিন দিয়াছেন। মেয়েবদের ছাড়িয়া দিয়া রামকে সদরে লইয়া গিয়া খোদ শামসু সাহেবের পায়ের বুটের সীমানায় ফেলিয়া দিবার কল্পনা ছিল তাঁহার। সাহেব গোটাকতক লাথি ঠুকিবেন। তারপর যা হয় করিবেন। তবে সে যে সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টির প্রসাদ পাইবে এ সম্বন্ধে তাহার সংশয় ছিল না।

জীবন আসিয়া জামিন দাঁড়াইতেই সে অবাক হইয়া গেল।

জীবনের পিছনে দেবকী সেন। তাহার পিছনে পিছনে সুরপতিবাবু। তাহার পিছনে পিছনে সুরজমলবাবুর লোক।

দারোগাকে জামিন দিতে হইল। না দিয়া উপায় ছিল না। জীবন বলিল—পাঁচ হাজার দশ হাজার—যত টাকার জামিন লাগে—দেব আমি।

জামিন হইয়া রামকে খালাস করিয়া সঙ্গে লইয়া গেল নিজের বাড়ি। তাহার ভাবাবেগ তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বলিল—রাম, চাকরি করবে?

—চাকরি?

—হ্যাঁ! বয়েস তো অনেক হল। আর ওসব কেন? এইবার ডাকাতি-টাকাতি ছাড়।

রাম লজ্জিত হইয়া খানিকটা হাসিয়া লইল। মৃদুস্বরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—এই দেখ! কি সব বলছে দেখ। ডাকাতি আবার কবে করলাম আমি। দেখলে না পুলিশের জুলুম। এই এমনি করে ধরে এনে—ভরে দেয় জেলে। যত দোষ নন্দ ঘোষ—বুঝলে না। সেই কোন কালে ঘি খেয়েছি—তারই গন্ধ হাতে শুঁকে বলে—রোজ ঘি খাস তু। সেই একবার ডাকাতি করেছিলাম তারই দায়ে দেখ না—ডাকাতি হলেই খোঁজে আমাকে।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিল।

জীবন বলিল—হাসি-তামাসা করি নাই রাম। তুমি যদি চাকরি কর তবে তোমাকে আমি রাখব।

এবার জীবনের কণ্ঠস্বরে রাম এমন কিছুর সন্ধান পাইল যে সে আর হাসিল না, গম্ভীর হইয়াই বলিল—কি করতে হবে? ছোট কাজ আমি করতে পারব না। গরুর ছানি-কাটা, কি ছেলে-কোলে-করা, কি তোমার তামুক-সাজা এসব আমি করব না।

—তা তোমাকে করতে হবে না।

—বেশ, তাহলে করব কাজ। কিন্তু কাজটা কি বল? আমি তো তোমার গদিতে বসে লেখাপড়া করতে পারব না! সে তো জানি না।

—রাত্রে পাহারা দেবে বাড়ি-ঘর।

—তা বেশ। সে তোমার ঘরে শুয়ে থাকলেই হবে। আমার নাক ডাকার শব্দ শুনলে যে শালা ডাকাত হোক—লেজ গুটিয়ে পালাবে।

—আর দিনে গদিতে বসে থাকবে। গাড়োয়ানেরা মাল বইবে, নজর রাখবে। দেখা-শুনো করবে।

—বেশ, তা করব।

—বেটাদের যা মেজাজ হয়েছে বুয়েছ কি না! কথায় কথায় চোখ রাঙায়।

—সে আমি রাঙা চোখ সাদা করে দোব।

—কি মাইনে নেবে বল?

—তা দিয়ো গোটা কুড়িক টাকা। না কি বলছ? আর খেতে দিয়ো পেট ভরে।

—বেশ তাই পাবে। আর কাপড়ও পাবে, কেমন।

অবাক হইয়া গেল রাম। সে ভাবিয়াছিল, সে যখন কুড়ি টাকা বলিয়াছে তখন জীবন নিশ্চয় বলিবে দশ। তারপর দুইপক্ষে কাটাকাটি করিয়া হয় চৌদ্দ—নয় পনের—ষোল—এই তিনটার যে কোনটায় খতম হইবে। সে এক কথায় কুড়িতেই রাজি হইয়া গেল? শুধু তাই নয়—কুড়ি টাকার উপর পোশাক! খোরাকি তো আছেই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি যে তোমাকে বলব দে-মশায়, তা বুঝতে পারছি না। তা—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন গো! আমার আর কি সাধ্য বল? তবে আমি তোমার তরে দরকার হলে পরাণটা দিয়ে দোব—এ তুমি ঠিক জেনো।

জীবন হাসিল।

রাম আবার বলিল—এ বুঝেছ—ওই মায়ের আশীর্বাদ। এ আমি নিশ্চয় বুঝেছি। ওই ঠাকুর মশায়ের লাত-বউয়ের। আহা—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ গো। ওর নামে কু-কথা বলে পাজী বেটা? কি বলব? লোকজন জমে গেল—নইলে পেথম ঘায়েই আমি ওই ময়েব বেটার মাথাটা চেলিয়ে দিতাম। সে মনে মনে আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম—আর জেল কালাপানি নয়, এবার শালা ঝুলেই পড়ব ফাঁসিকাঠে।

—না—না—না। সে কর নাই ভালই করেছ রাম। তা হলে জ্বলে যেত, আগুন জ্বলে যেত এখানে।

বাড়ি আসিয়া বেশ একপেট খাইয়া রাম একরকম হইয়া গেল। যাহা করিতে পারিব না, করিব না বলিয়া শর্ত করাইয়া লইয়াছিল—সেই সব শর্তের একটা শর্ত নিজেই সে লঙ্ঘন করিয়া বসিল। জীবনের চার বছরের ছোট ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—এ যে তোমার সোনার চাঁদ ছেলে মশায়।

জীবন হাসিয়া বলিল—সোনা কি কাল হয় রাম? ও হল কেলে। ভারি বজ্জাত। কথায় কথায় মাথা ঠুকবে।

রাম বলিল—তুমি ছাই জান দে। সোনা কাল হলেই তার কদর বেড়ে যায়, তখন হয় কেলে সোনা।

জীবন বলিল—কিন্তু তুই নিজেই নিজের শর্ত ভাঙলি। ছেলে কোলে করলি?

রাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তারপর হঠাৎ বলিল—দে, আজ মনে হচ্ছে কি জান?

—কি?

—মনে হচ্ছে সেকালে—মানে আমরা যে কালে জোয়ান হলাম পেথম—সে কালে যদি তোমরা জন্মাতে তবে চিরজীবনটা ডাকাতি করে কাটত না। জীবনভর বার সাত-আট মেয়াদ খাটলাম! আজ তুমি আমাকে চাকরি দিলে। সেকালে প্রথম মেয়াদ খাটলাম একবছর। ফিরে এলাম—এসে ভাবলাম—নাঃ—চাকরি-বাকরি করব আর উসব নয়। তা চাকরিই কেউ দিলে না। এবারে ফিরে এসে দেখি—দেশের অবস্থা বেবাক পাল্টে গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ে ডাকাতি করব তার ঘর নাই। সব মোটা

গেরস্ত পড়ে গিয়েছে। একটা একটা ঘর আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তাও তারা ঘরে থাকে না। জংশন, নয় তো কলকাতা। দেখলাম—ভাত এক জংশন ছাড়া আর কোথাও নাই। তাই এসেছিলাম জংশনে। ঘুরছিলাম—বলি—কি করা যায় একবার দেখি। এত লোকের ভাত হচ্ছে আমার হবে না। দেখি ভূপতে ছুতোর এখানে। নলে যে নলে—মাটির পুতুল গড়ে, সে এখানে জাঁকিয়ে বসেছে। সতীশ বাউড়ী—সে মাটির ঘর গড়ে। সে-ও এখানে ব্যবসা জমিয়েছে। আমি ভাবছিলাম, লাঠি ছাড়া তো আমার বিদ্যে নাই, সে বিদ্যে এখানে খাটাব কি করে। একজনা খবর একটা দিলে —রেলের মালগাড়ি ভেঙে মাল সরানোর কথা। তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ শুনলাম— ওই মা-ঠাকরুণের বিবরণ। দেখতে গিয়ে নয়ন সার্থক হল, জীবনটা ভরে গেল। মায়ের পুণ্যে থানার দুয়ার থেকে তুমি আমাকে খালাস করে এনে চাকরি দিলে। জংশনের বাড়-বাড়ন্ত হোক, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক—বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্দি হলাম।

*　　　*　　　*

রামভল্লা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। হঠাৎ সে নলিনের দোকানের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। একসারি পুতুলের দিকে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল। সাদা থান কাপড়-পরা পূজারতা একটি নারী-মূর্তি। অবিকল মায়ের মতো। অবিকল।

—রাম, চল এইবার বাড়ি চল। জীবন তাহাকে ডাকিল।

—যাই।

সে একটা পুতুল তুলিয়া বলিল—নলিন ভাই, একটা পুতুল আমি নিলাম। দাম যা হয় নিস! দোব কাল।

নলিন টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার। ধারে তাহার কারবার নাই। তবু রামকে সে না বলিতে পারিল না।

—এটা আবার কি পুতুল রে! এটা?

দারোগা দরবারী হালদার হাতের ছড়ি বাড়াইয়া বলিল—এগুলো কি করেছিস? এঁ্যা?

গাজনের মেলায় কবিগান চলিতেছে। গানটা খুব জমিয়াছে, পাঁচ-সাত হাজার লোক গিসগিস করিতেছে। রাত্রি প্রায় এগারটা। দরবারী হালদার মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মেলার কাণ্ড—কোথায় কখন কি ঘটে কে বলিতে পারে! তাছাড়া চোর-ডাকাত, বে-আইনী আবগারী কারবার—এ সব তো আছেই।

নলিনের দোকানে বেশ লোক জমিয়াছে। নলিনের ভাগ্য ভাল। জোর বেচাকেনা চলিয়াছে। এবার ওই নতুন পুতুল—তপস্বিনীই হোক বা পূজারিণীই হোক—ওটার চাহিদা খুব। নলিন ওটার নাম দিয়াছে—ঠাকুরুণ-পুতুল। ইতিমধ্যে গোটা চল্লিশেক বিক্রি করিয়াছে—আর গোটা দশেক মাত্র আছে। তাহার কোনোটা একটু ভাঙা— রঙচটা—কোনোটা বা পোড়াইবার বা শুকাইবার সময় অল্প বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। তবে যে রকম চাহিদা তাহাতে ওকয়টাও আর পড়িয়া থাকিবে না। তাহার আফসোস

হইতেছে। আরও শতখানেক, অন্তত পঞ্চাশটাও কেন সে গড়ে নাই !

গড়ে নাই অবশ্য ভয়ে। এ পর্যন্ত যত পুতুল সে গড়িয়াছে—সেগুলা আসলে বাজার-চলতি পুতুলেরই নকল। বাজার-চলতি চিনামাটি বা সেলুলয়েডের পুতুল কিনিয়া সেইগুলি সামনে রাখিয়া খানিকটা এদিক-ওদিক করিয়া সে পুতুল গড়িত। তাহার পর সেগুলি হইতে ছাঁচ তৈয়ারি করিয়া লইত। স্বাধীন কল্পনায় পুতুল তৈয়ারি করিবার ইচ্ছা তাহার অনেক দিন হইতেই হইয়াছে, কিন্তু সাহস হয় নাই। এ বিষয়ে দেবু মাস্টার তাহার দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল। পরিকল্পনা যোগাইয়া, ছবি দেখাইয়া, সে তাহাকে দিয়া পোস্টার আঁকাইয়া লইত। একবার তাহাকে বলিয়াছিল—মনে কর খুব একটা বড় যোয়ান—কিন্তু খেতে না-পেয়ে পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গেছে—তাকে কেউ শেকল দিয়ে বেঁধেছে, সে কিন্তু বাঁধা থাকবে না, ছিঁড়বে শেকল—আঁক।

তবুও নলিনের কল্পনা ভাল খেলে নাই। তখন দেবু বলিয়াছিল—ভল্লাদিগে পুলিশের বেঁধে নিয়ে যাওয়া মনে আছে? মনে কর রামভল্লাকে শেকল দিয়ে বেঁধেছে—রাম ছিঁড়ে পালিয়ে আসবে। আঁক।

এবার তাহার মনে ছবিটা আসিয়াছিল। বেশ ভালই হইয়াছিল সে ছবিখানা।

আর একখানা ছবির কল্পনা দিয়াছিল এইভাবে। বলিয়াছিল—রামভরোসা পিঠে বস্তা বয়, দেখেছিস তো? তাই আঁক। কিন্তু বস্তাটা বস্তা হবে না—হবে একজন শেঠ। বুঝলি না? ওই যে বড় শেঠের সেজ ছেলেটা—দেখেছিস তো—কি মোটা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি,—ওই ওকেই চাপিয়ে দে! পিঠের বস্তাটার একদিকে ওর মুখ এঁকে দে। একদিকে ছোট ছোট কিন্তু মোটা মোটা দুটো পা!

এইভাবেই তাহার স্বাধীন কল্পনার বিকাশ হইয়াছিল। একদিন একটা হনুমানের ছাঁচ তৈয়ারী করিতে করিতে মনে হইয়াছিল—এমনি একটি শেঠ মূর্তি তৈয়ারী করিলে কি হয়। প্রকাণ্ড ভুঁড়ির উপর ছোট একটি মুণ্ড—তাহার উপর প্রকাণ্ড পাগড়ী, খাটো মোটা পায়ে এই বড় নাগরা—এই কল্পনায় ছোট পুতুল তৈরী করিলে সে কি এই বুড়া বা হনুমান বা সার্কাসের ক্লাউন, এসব পুতুলের চেয়ে কম কৌতুককর হইবে? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া সাহস হয় নাই। শেঠেরা দেখিলে মহা বিপদ ঘটিবে। এখানে ব্যবসার পাট উঠাইয়া পলাইতে হইবে। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল—গন্নাকাটা দরবারী হালদারের মতো মুখ, আর ভূতের মতো হাত-পা করিয়া যমদূতে পুতুল তৈরী করে। কিন্তু সে সাহসও হয় নাই।

এবার এ মূর্তিটি গড়িতে ভয়ের কিছু তাহার মন বা হাতকে পঙ্গু করিয়া দেয় নাই। শুধু খানিকটা লজ্জা অনুভব করিয়াছিল। তাহার পর একটা ঘটনায় তাহার এ লজ্জা কাটিয়া যায়। কল্পনার বীজ অবশ্য অরুণাই বটে। যেদিন বিধবার বেশে—একাদশীর উপবাস-ক্লিষ্ট মুখে ট্রেন হইতে নামিতেই পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যায়—সেই দিন তাহার মনে এ বীজ ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তারপর তাঁহার আচার আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে করিতে একদিন সে বীজ ফাটিল। একদিন যে অরুণাদিদি জমিদারের ছেলের বাড়ানো হাতের সম্মুখ হইতে পুতুলটা ছোঁ দিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন

—সেই অরুণাদিদির এই ঘোর পরিবর্তনে সে শুধু বিস্মিতই হয় নাই—মুগ্ধও হইয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল তাঁহার একখানি ছবি আঁকে। কিন্তু লজ্জা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—লোকে কে কি বলিবে! এখানকার লোকের রীতি তো তাহার অজানা নয়। আর অরুণাদিদিও হয়তো বিরক্ত হইতে পারেন। এই সব ভাবিয়াই মনের ইচ্ছা সে মনে রাখিয়াছিল। ইহার পর অজয়ের সন্ধান লইয়া তাহার সঙ্গে অরুণার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মনের ইচ্ছা দিন দিন সতেজ অঙ্কুরের মতো মাথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন একখানা মাসিকপত্র তাহার হাতে পড়িল। সুরপতিবাবুদের পাড়া হইতে একখানা ছেঁড়া মাসিকপত্র বাবুদের একটা চাকরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিল সে। চাকরটা ওটাকে সংগ্রহ করিয়াছিল—একখানা রঙিন নগ্নপ্রায় তরুণীর ছবির জন্য। ছবিটা ছিঁড়িয়া লইয়া সে বইখানা নলিনকে দান করিয়াছিল। নলিন তাহার বিনিময়ে তাহাকে চা-সিগারেট খাওয়াইলও। নলিন এই ভাবে বই পাইলে—ছবি দেখে, পড়ে। বেশ লাগে তাহার। ওই বইখানার মধ্যেই ছিল—শ্রীমায়ের ছবি। নলিন মুগ্ধ হইয়া গেল। দিন দুয়ের মধ্যেই তাহার শিল্পী মানসে—দুইটি ছবি মিশিয়া একটি নূতন ছবি জাগিয়া উঠিল। তুলিতে পটে সে ছবিটি প্রথম আঁকিয়া অতি যত্নে একটি পুতুল গড়িল। তাহার পর ছাঁচ গড়িল। এই হইল ছবির মূল রহস্য। এই ছোট পুতুলের মধ্যেও কেমন করিয়া অরুণার কৃশ দেহের গঠনভঙ্গি ও মুখাবয়বের একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে নিজেও তাহা সঠিক জানে না। তবে আসিয়াছে এটা ঠিক। সেটা অবশ্য তাহার চোখ এড়ায় নাই। এই ক্ষীণ সাদৃশ্য কাহারও চোখে ঠেকিবে এটা সে ভাবে নাই। কিন্তু রামভল্লার চোখে কি করিয়া যেন ঠেকিয়া গেল এবং ওই কথাটা ওই হাঁকিয়ে-ডাকিয়ে মানুষটি হাঁক-ডাক করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। তাহার ফলে ক্ষীণ সাদৃশ্যটুকু প্রবল এবং অসামান্য হইয়া লোকের চোখে পড়িল—না, লোকেরা নিজেরাই প্রভাবিত দৃষ্টিতে এমন প্রবল ও অসামান্য করিয়া দেখিল—সে নলিন ঠিক বুঝিল না। বুঝিতেও চাহিল না। শুধু ভয় ছিল—যদি কেহ কোন কুৎসিত বা অমর্যাদাকর মন্তব্য করে। কিন্তু আশ্চর্য—তাহা কেহ করিল না।

নলিন খুশী হইল। মনে মনে তাহার একটি গভীর আত্মতৃপ্তিও জাগিয়া উঠিল। নিজে নির্জন অবসরে পুতুল লইয়া বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। নিজের হাতের এমন কৃতিত্বে সে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু একটা আশঙ্কা তাহার আছে। অরুণাদিদিমণি কি বলিবেন?

দেবু ও স্বর্ণ আসিয়াছিল একদিন। দেবু তারিফ করিয়াছে। উৎসাহ দিয়া বলিয়াছে—এইবার আরও নতুন নতুন গড়। যা ভাল লাগবে গড়ে যা।

স্বর্ণ একটু হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল—বেশ হয়েছে।

রাত্রে দরবারী হালদার আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল। রাত্রি প্রায় এগারটা। দোকানের সামনে এখন আর ভিড় নাই। ভিড় এখন কবিগানের আসরের চারিদিকে।

আর ভিড় আসা যাওয়ার। কতক খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিতেছে, কতক বাড়ি ফিরিতেছে। নলিন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।—আরও শতখানেক—অন্তত গোটা পঞ্চাশেক পুতুলও সে যদি গড়িত! মেলার মধ্যে আর গড়িয়া ফেলা সম্ভবপর হইবে না। যাক। আবার মাসখানেক পরে ধর্মরাজ পূজার ছোটখাট একটি মেলা আছে। এবার বেশী করিয়া গড়িবে। আর ভাবিতেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি আসিতেছে। সুরপতিবাবুদের পাড়ার ছেলেরা আজ তাহাকে বলিয়া গিয়াছে—ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বেশ বড় মূর্তি গড়িয়া দিতে হইবে। পুতুল গড়িলে কি হয়? গান্ধী রাজার পুতুল গড়িলে বেশ বিক্রি হয়!

ঠিক এই সময় দরবারী হালদার কবি-আসরের দিকে যাইবার পথে—দোকানের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। নিজের ছড়িটা দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এটা আবার কি পুতুল রে? এগুলো কি করেছিস? এঁ্যা?

নলিন চমকিয়া উঠিল—আজ্ঞে?

দরবারী হালদার চটিয়া গেল। তাহার মেজাজই ওই রকম। লোকটি প্রকৃতিতে যত রুক্ষ—ব্যবহারেও তত রূঢ়। তাহার উপর শামসু সাহেবের দক্ষিণ হস্ত সে। প্রশ্রয় পাইয়া পাইয়া লোকটা দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে। সে পায়ের জুতার ডগা দিয়া একটা পুতুলকে ফুটবলের মতো কিক্‌ করিয়া দিয়া বলিল—এটা? এটা? এটা আবার কি পুতুল?

পুতুল ভাঙিয়া তো গেলই এবং ভাঙা একটা টুকরা ছুটিয়া গিয়া নলিনের কপালে গিয়া লাগিল। কপালটা খানিকটা কাটিয়াও গেল। ভয়ে নলিনের বুকটা গুরগুর করিয়া উঠিল। দরবারী দারোগার প্রতাপ তাহার অজানা নয়। ইহার পর কি করিবে ভাবিয়া সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। যদি সমস্ত পুতুলগুলাই ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়!

হালদার কিন্তু তাহা করিল না। সে একটা পুতুল তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিল—দেখিয়া বলিল—হুঁ বলিহারি, বলিহারি! তোর হাত তো ভাল রে। অনেকটা এনেছিস তো। অনেকটা এসেছে। তা'—ওই মেয়েটাকে এমন করে ঠাকুর বানালি কেন? ওটা তো একটা—। একটা কুৎসিত কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

নলিন চুপ করিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। আশপাশে কতকগুলি লোক ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, দারোগার ভয়ে একটু দূরে-দূরে ছড়াইয়া ছিল, এই-বার তাহারা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

—কি নলিন, কি হয়েছে ভাই?

নলিন চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। উত্তর দিতে সাহস হইল না। একজন প্রত্যক্ষ-দর্শী চুপি-চুপিই বলিল—ওই পুতুল।

—কোন্‌ পুতুল?

—এই যে—নতুন ঠাকরুণ-পুতুল গড়েছে নলিন; এই দেখে একেবারে চটেমটে লাল। লাথি মেরে একটা পুতুলকে ভেঙে—

—কি হয়েছে? কি হয়েছে ভাই? কি ব্যাপার?

নলিন এবার প্রমাদ গণিল। লোক জমিতেছে। ব্যাপারটা লইয়া হৈ-চৈ শুরু

হইবে। হয়তো হল্লা করিবে। তাহার পর মরণ হইবে তাহার। আবার আসিবে হালদার দারোগা, ইহারা সকলে যে যেদিকে খোলা পাইবে পালাইবে। দারোগা তাহাকে লইয়া পড়িবে। সে এবার বলিল---কিছু হয় নাই ভাই, কিছু হয় নাই! যাও যাও সব---আপন আপন পথে যাও। আমি দোকান বন্ধ করব। সর—সর।

—কিছু হয়নি তো তোমার কপাল কাটল কি করে? একটি ছেলে আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া সামনে দাঁড়াইল। ছেলেটি গৌরের অনুচর। খবরের কাগজ ফেরি করিয়া বেড়ায়। সে কথাবার্তা ঠিক শুনিতে পায় নাই—বেশ খানিকটা দূরেই ছিল। কিন্তু দারোগার লাথি মারিয়া পুতুল ভাঙা দেখিয়াছিল! কাছে থাকিলে সে প্রতিবাদ করিত, কিন্তু আসিতে আসিতে দারোগা চলিয়া গিয়াছে। নলিন গৌরের চেলাকে দেখিয়া ভড়কাইয়া গেল।

ছেলেটি বলিল—আমি দারোগার লাথি-মারা স্বচক্ষে দেখেছি। দূরে ছিলাম—ব্যাপারটা কি ঠিক জানি না। নলিন তোমাকে বলতে হবে। বল কি হয়েছে!

এবার প্রত্যক্ষদর্শীটি উৎসাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল—নলিন না বলুক—আমি বলছি। সব দেখেছি আমি—সব শুনেছি। এই—এইখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমিও ওই পুতুল দেখছিলাম—দারোগা এসে দাঁড়াল, আমি আর এগুতে পারলাম না। পাশের ওই দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম—দারোগা চলে যাক।—

অসহিষ্ণু দর্শকের দলের মধ্য হইতে কে বলিল—কি হয়েছিল তাই বলহে বাপু। এত ভনিতা শুনব না আমরা।

লোকটি এবার আনুপূর্বিক ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া গেল। বেশ একটু উত্তেজিত-ভাবেই সে সমস্ত কথা বলিয়া গেল। শেষে বলিল—যাবার সময় সে গাল দিয়ে গেল, বলে গেল—

—কি? কি বলেছে—বল?

—বললে---। বললে একটা খারাপ মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর তৈরী করেছে। বললে—বললে তুই বেটাও মজেছিস নাকি?

জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবং জনতাও তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রায় শত-খানেক লোক জমিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়—এদিক ওদিক হইতে আরও লোক এই জনতা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

—কি?—কি? ব্যাপার কি?

—এ তো বড় অন্যায়! এ যে অত্যাচার। অরাজক নাকি? কতক লোক সংবাদটা শুনিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

—কি? কি হয়েছে? সর, সর সব। হটো-হটো। সুরপতি আসিয়া দাঁড়াইল।—কি হয়েছে? সুরপতি জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—যাও—যাও সব। সরে যাও লক্ষ্মীরা সব। আমি এসেছি, জীবন এসেছে—সব শুনে যা হয় করছি আমরা। যাও তোমরা, যাও! ভিড় করো না।

জীবন ডাকিল—নলিন !

নলিন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিছু বা কাহাকেও দেখিতেছে, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—দৃষ্টিতে প্রশ্ন—ভ্রূর কুঞ্চনরেখায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—নলিন ! এই !

নলিন চমকিয়া উঠিল।—আজ্ঞে ?

—কি হয়েছে ? ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার আর কি শুনবেন ? ওই সব যা বলছে—তাই সত্যি।

—না। তোর মুখ থেকে শুনব। চল, ভেতরে চল, বসতে দে। সুরপতিদা।

—যাই।

ভিড় তখন সরিতে শুরু করিয়াছে। সুরপতি আবার বলিল—তোমরা যাও ভাই—কবিগান শোন গিয়ে। আমাদের ওপর ভরসা রাখ। আমরা প্রতিকার করব। অন্যায় করলে, দারোগাই হোক আর হাকিমই হোক—আমরা ছাড়ব না। যাও, যাও।

সুরপতি এবং জীবনের অনুচরের দল, তাহারাই মেলার ভলেন্টিয়ার, তাহারাও জনকয়েক জুটিয়াছিল—তাহারা লোকজনদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

সুরপতি ভিতরে আসিয়া বসিল।—বল তো নলিন কি হয়েছে। সত্যি বলবি বাবা। কিন্তু—

সচকিত হইয়া সুরপতি বলিল—ঘটনার সময় যারা ছিল—তারা, মানে তাদের চিনিস তো তুই ? এঃ—এঃ—বড্ড ভুল হয়ে গেল ! তাদের—

জীবন বলিল—তুই এমন করে কি দেখছিস বল তো ?

নলিন বলিল—ভিড়ের মধ্যে মনে হল—

কথা তাহার শেষ হইল না—পর পর একটা-দুইটা-তিনটা পটকার আওয়াজের মতো শব্দ উঠিল ; কিন্তু পটকার আওয়াজ নয়।

সুরপতি চমকিয়া উঠিল।—পিস্তল ? কি হল ? দরবারী হালদার—?

ওদিকে মেলার আসরে প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। লোকজন ছুটিয়া পলাইতেছে।

—কি হল ?

জীবন ও সুরপতি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।—কি হল।

—দারোগাকে গুলি করেছে।

—দারোগাকে গুলি করেছে—কে ?

—একটি ছেলে।

—ছেলে ?

—হ্যাঁ। চিৎকার করে বললে—আমার মাকে তুমি অসতী বলেছ—

তাহার কথার উপরেই নলিন বলিয়া উঠিল—আমি দেখেছি—আমি দেখেছি। আমি যে তাকেই খুঁজছিলাম। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। বিশু দাদাঠাকুরের ছেলে। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল—

সুরপতি ও জীবন ছুটিয়া গেল আসরের দিকে। দরবারী হালদারকে যে গুলি

করিয়াছে সে অজয়ই বটে। বিশ্বনাথের ছেলে। ন্যায়রত্নের পৌত্র। দরবারী হালদার আসরে গিয়া বসিবার পূর্বেই ভিড় ঠেলিয়া অজয় আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া পিস্তল তুলিয়া ধরিল, চিৎকার করিয়া বলিল—তুমি আমার মাকে অসতী বলেছ। তোমাকে আমি—

হালদার শুধু থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখে কোন কথা ফুটিল না। ভয়ে সে অবশ হইয়া গিয়াছিল।

পরপর তিনটি গুলি সে ছুঁড়িয়াছিল।

দুইটা গুলি দরবারীকে লাগিয়াছিল। একটা গুলি গিয়া লাগিয়াছে দরবারীর পাশের একটা বাঁশের খুঁটিতে। দরবারীর ডান বাহুতে এবং কাঁধে গুলি বিঁধিয়াছে। অজয় ধরা পড়িয়াছে।

সংবাদটা বিদ্যুতের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

অরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দেবু তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল কি থেকে কি হয়ে গেল। কিন্তু।

অরুণা কেমন হইয়া গিয়াছিল। অজয় দরবারী হালদারকে গুলি করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে? দরবারী হালদার তাহার সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলিয়াছিল বলিয়া অজয় তাহাকে গুলি করিয়াছে? সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিয়াছে—তুমি আমার মাকে অসতী বলেছ। তোমাকে আমি—। শুধু এই কথা কয়টিই তাহার মাথার মধ্যে —মনের মধ্যে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ঘরে যে আলোটা জ্বলিতেছিল সে আলোটা যেন ক্রমশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া গেল। আকাশে আলো ঝলমল করিয়া উঠিল।

দেবু বলিয়াই গেল—কিন্তু আমি ভাবছি, ব্যাপারটাকে Political Case-এ না দাঁড় করায়। শ্যামসুন্দরের রাজত্ব। অজয়ের পিছনে Political ছাপ আছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে। আবার একটা conspiracy কেস না হয়।

অরুণার কানে শব্দগুলি প্রবেশ করিলেও তাহার কোন অর্থ মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিল না। তাহার সে মগ্নভাব বিচিত্র, সে যেন নিজের মধ্যে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে অন্তরলোকে শুধু ধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল অজয়ের কথাগুলি—

—"তুমি আমার মাকে অসতী বলেছ। তোমাকে আমি—।"

সে তাহাকে মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে—তাহার মর্যাদা রক্ষার জন্য সে দরবারী হালদারের মতো দুর্দান্ত পুলিশ কর্মচারীর সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া তাহাকে গুলি করিয়াছে। ভয় করে নাই, পালায় নাই।—পরমুহূর্তেই অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল সে। যেন একটা শ্বাসরোধী যন্ত্রণায় সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অজয়ের ফাঁসি হইবে! তাহার জন্য!

কাহাকে লইয়া বাঁচিবে সে? কি লইয়া বাঁচিবে? দিদি—তাহার দিদি, অজয়ের মায়ের কাছে কি বলিবে সে? একদিন বিশ্বনাথকে সে কাড়িয়া লইয়াছিল। আজ

আবার অজয়—তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন অজয় চলিয়া যাইবে তাহার জন্য।

সব আলো মুহূর্তে নিভিয়া গেল। বায়ুমণ্ডলের বায়ুস্তর যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। নিঃশ্বাস লইতে পারিতেছে না সে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া দেবু শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—বউদি! অরুণাদি।

—দেবুবাবু! শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল—স্বর বাহির হইল না, শুধু প্রশ্বাসের বাতাস শব্দোচ্চারণে বায়বীয় ধ্বনি তুলিল—আমি কি করব? পরক্ষণেই বলিল—আমি মরব দেবুবাবু। আমাকে খানিকটা বিষ এনে দিতে পারেন?

দেবু এবার আরও শঙ্কিত হইয়া বলিল—আপনি স্থির হোন। অরুণাদি!

—স্থির? স্থির হব!

পরমুহূর্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—আমি একবার জয়তারা আশ্রমে যাব। দাদুর কাছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।

থর থর করিয়া সে কাঁপিতেছিল।

দেবু বলিল—না। এই রাত্রে বের হবেন না আপনি। ওদিকে এই ব্যাপার নিয়ে মুসলমানেদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে পুলিশ মোতায়েন হয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একজন ছুটিতেছিল। সে নলিন। সে ছুটিয়া চলিয়াছিল জয়তারা আশ্রমের দিকে। নলিনের অন্ধকারে বড় ভয়। সে ভয় আজ তাহার নাই। কোন ভয়ের একবিন্দু অস্তিত্ব সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না। সাপের ভয়, মানুষের ভয়, ভূতের ভয়—ভয় অনেক। আজ কোন ভয় নাই তার। সে যেন আজ সব ভয়কে জয় করিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়কে সে খবর দিতে চলিয়াছে। এই অতিবড় ভয়ঙ্কর বিপদে তাহার আর কাহারও কথা মনে হয় নাই। শুধু মনে হইয়াছে এই বৃদ্ধের কথা। তিনি হয়তো পারেন—তিনিই পারেন পরিত্রাণ দিতে।

ভয় তাহার নিজের জন্য নয়। ভয় অজয়ের জন্য। এ কি করিল অজয়বাবু? পরক্ষণেই মনে হইতেছে, ঠিক করিয়াছে অজয়বাবু। বিশু দাদাঠাকুরের ছেলে সে, ঠিক করিয়াছে। আবার পরক্ষণেই অজয়ের শাস্তির কথা ভাবিয়া সে অধীর হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতিবেগ বাড়িতেছে—সে জোরে ছুটিতেছে।

—কে? অন্ধকারের মধ্য হইতে কে প্রশ্ন করিল।

নলিন থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

—কে?—ভারী গলার আওয়াজ। চেনা মনে হইলেও ঠিক চিনিতে পারিল না।

—আমি!

—কে? নলে?

—হ্যাঁ। কে ডাকছেন আপনি?

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এক দীর্ঘকায় মূর্তি—রামভল্লা। সে প্রশ্ন করিল—যাবি কোথা?

—জয়তারা-তলায়। ঠাকুরমশায়ের কাছে। খবর দিতে।

—খবর দিতে যেতে হবে না। আমি খবর দিয়ে এলাম।

—কি বললেন? সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রামের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কি বললেন? শুনলেন—শুনে যেমন পাথরের মতোন থাকেন তেমনি থাকলেন —তারপর বললেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

—বললেন—নারায়ণ নারায়ণ। পুতুলের মতোই কথাগুলা উচ্চারণ করিয়া গেল নলিন।

—চল ফিরে চল।

—ফিরে যাব?

—হ্যাঁ চল। গিয়ে আর কি করবি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নলিনও ফিরিল। খানিকটা আসিয়া অকস্মাৎ সে রামকে জিজ্ঞাসা করিল—রামভাই!

—উঁ।

—কি হবে বল দিকিনি?

—সাজা হবে।

—সাজা হবে?

—মরে তো ফাঁসি হবে। না মরে তো আট-দশ বছর মেয়াদ কি কালাপানি।

তাহারা বসতির মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন জংশন শহরটা যেন নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। পথের মোড়ে ছোট ছোট দলে মানুষেরা জমিয়া ওই কথাই আলোচনা করিতেছে। রাম বলিল—চল, একবার মায়ের ওখান হয়ে যাই। অরুণা দিদিমণির ওখান।

—না। তুমি যাও। আমি চললাম।

—যাবি না?

—না। নলিন হন হন করিয়া চলিয়া গেল। কি বলিয়া সে অরুণাদিদির সামনে দাঁড়াইবে? কেন সে তাঁহার সাদৃশ্য লইয়া পুতুল গড়িল! সেই, সেই তো সমস্ত অনর্থের মূলে। কি বলিবে সে; তিনি যদি বলেন—নলিন, এ তুমি কি করলে? কেন এ কাজ করলে? কি উত্তর সে দিবে।

আঃ—কেন সে এ কাজ করিল? বুক চাপড়াইয়া হায় হায় করিতে ইচ্ছা হইতেছে তাহার। সে ঘুরিল। জনতা বসতি পিছনে ফেলিয়া সে নদীর চরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই বুকে করাঘাত করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। নদীর দুই তীরের ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাহার চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

—এই। নলিন।

নলিন বোধহয় শুনিতে পাইল না।

—ওরে। ওরে। এই।

—কে ?

—আমি ভূপতি। ভূপতি ছুতার তাহাকে ডাকিতেছে।

—কি ?

—পুলিশ তোকে খুঁজছে।

—পুলিশ ?

—হ্যাঁ। তুই পালা।

—পালাব ? কেন ?

—লোকে বল্‌ছে তোকে-সুদ্ধ জড়াবে মামলাতে।

—জড়াবে ?

—হ্যাঁ।

নলিন নদীর ঘাট হইতে উঠিয়া আসিল। বলিল—চল। দেখি কি বলছে পুলিশ।

*　　　　*　　　　*

রাম আসিয়া অরুণার বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। দেবু প্রশ্ন করিল—কে ?

—আমি রাম।

—রাম ? তুমি একটা কাজ করতে পার ভাই ?

—মা কই ? আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

—অরুণাদিদির খুব অসুখ রাম। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। জ্ঞান হচ্ছে, আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আনতে পার ?

কাকে ডাকব ?

—যাকে হোক। দেবকী সেন কবরেজকেও ডেকো। বুঝেছ ?

—কবরেজ তো জয়তারা মায়ের থানে রয়েছেন। তিনি ঠাকুরমশায়ের কাছে গিয়েছেন।

—ঠাকুরমশায় খবর পেয়েছেন তাহলে ?

—পেয়েছেন।

—অজয়ের মা ? তিনি শুনেছেন ?

—হ্যাঁ। আমি দিয়ে এলাম খবর, শুনলেন—শুনে—বার-দুই নারায়ণ-নারায়ণ বললেন—তারপর মা ঠাকরুণকে ডাকলেন। বললেন—মনকে শক্ত কর, একটা কঠিন সংবাদ দেব। মা ঠাকরুণ মুখের দিকে চাইলেন—বললেন—বলুন। অজয়ের খারাপ খবর ?

ঠাকুর বললেন—এখানকার দারোগা মেলার মধ্যে অরুণাকে অসতী বলে গাল দিয়েছিল। অজয় মেলার মধ্যে ছিল, সে তাকে গুলি করেছে।

তিনি শুনে চুপ করে রইলেন। আমি চলে এলাম। মায়ের থান থেকে বেরুচ্ছি দেখলাম কবরেজ ঢুকছে। খানিকটা এসে দেখি—নলে! সে চুপ করিয়া গেল। বলিল—আলো নিয়ে কারা যেন আসছে গো।

মোড়ের মাথায় একটা হ্যারিকেনের আলো, পিছনে কয়েকজন লোক।

দেবু বলিল—তুমি ভাই একটু তাড়াতাড়ি যাও। ওরা যে হবে লোক। ডাক্তার দেখ একজন।

রাম চলিয়া গেল।

আলোটা আসিয়া দাঁড়াইল অরুণারই বাড়ির দরজায়। আলোর পিছনে—দেবকী সেন, ঠাকুরমশাই, অজয়ের মা, জয়তারা আশ্রমের পুরোহিত আর দেবকী সেনের কয়েকজন শিষ্য।

অরুণা কই ?—প্রশ্ন করিলেন জয়া।

—তাঁর অসুখ। সংবাদটা শুনে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জয়া দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

—আপনিও আসুন কবরেজমশাই, একবার দেখুন - একখানি আসন পাতিয়া দিয়া ন্যায়রত্নকে বলিল—আপনি একটু বসুন।

—না, পণ্ডিত। আমিও ভিতরে যাব।

—আসবেন ভিতরে ? আপনি ?

—আসব বইকি।

ন্যায়রত্ন ভিতরে আসিয়া অরুণার শিয়রে বসিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দুঃখ জয় করার সাধনার কষ্টের চেয়ে বড় কষ্ট আর বোধহয় নাই।

তাহার পরই ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা থম থম করিতে লাগিল। শুধু টাইমপিস ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া চলিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই অরুণা প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতেছিল নহিলে প্রায় নিস্পন্দ। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল। ভোরের আলো তখন ফুটিতেছে—অরুণা চোখ মেলিল। জয়াকে দেখিয়া চিনিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জয়া বলিল—অরুণার জ্ঞান হয়েছে দাদু।

- হয়েছে। এইটিই আমি চাইছিলাম। জীবনে তো প্রার্থনা করি না। আজ এই প্রার্থনাই করছিলাম বসে বসে। অজয়কে নিয়ে যাবে পুলিশ। সে দেখা করে প্রণাম করতে চেয়েছে। আশীর্বাদ তার প্রয়োজন।

ওদিকে পুব আকাশ লাল হইয়া উঠিতেছিল। ন্যায়রত্ন সেইদিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—

'হিরণ্ময়েন.পাত্রেন সত্যাত্যাগ পিহিতং মুখং
তত্বং পুষন্নপাবৃণু—সত্য ধর্মায়দৃষ্টতে।'

* * *

সেইদিনই অজয়কে পুলিশ সদরে লইয়া গেল।

যাইবার সময় সে সকলের শেষে অরুণাকে প্রণাম করিল—একবার শুধু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—মা !

অরুণা কিছু বলিতে পারিল না। আবার সে চেতনা হারাইয়া মেঝের উপর আছাড়

খাইয়া পড়িয়া গেল।

ছ-বৎসর পর।

উনিশশো ছেচল্লিশ সাল।

দ্বারমণ্ডল জুড়িয়া আগুন জ্বলিতেছে। রাত্রিকাল, কৃষ্ণপক্ষ। রাত্রির শূন্য মণ্ডল আগুনের লেলিহান শিখায় রক্তাভ ধূম্রপুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে। ঊর্ধ্বলোকের আকাশ দেখা যায় না। গোটা শহরটা জুড়িয়া উঠিতেছে বহু মানুষের সমবেত আর্ত চিৎকার; বীভৎস হিংস্র চিৎকার। প্রচণ্ড ক্ষোভের চিৎকার। সে ভয়াল চিৎকারে নিশীথিনী ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছে। ধ্যানমগ্না তামসীর তপস্যা যেন মুহুর্মুহু বিঘ্নিত হইতেছে। অথবা কোন এক যুগসন্ধির মহালগ্নে রাত্রি হইয়া উঠিয়াছে কালরাত্রি। নিশীথিনী সৃষ্টির প্রথম ক্ষণের আদিম উল্লাসে আজ নৃত্যপরা হইয়া উঠিয়াছে। তার চারিদিক ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে হিংসা—রক্ততৃষ্ণা পৈশাচিক উল্লাস।

কার্তিকের শেষ।

হেমন্তের আকাশে মধ্যে মধ্যে উল্কাপাত হয়। একটা উল্কা মধ্য আকাশ হইতে সুদীর্ঘ নীলাভ একটি রেখা টানিয়া পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি আসিয়া মিলাইয়া গেল। রক্তাভ ধূম্রপুঞ্জের মধ্যেও সে একটি বিস্ময়কর রূপমাধুরীর রেখা টানিয়া দিয়া গেল। কিন্তু তাহা দেখিবার কাহারও অবকাশ ছিল না। আকাশের দিকে চোখ তুলিবার কাহারও অবকাশ নাই। চোখ-কান-নাসারন্ধ্র ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিও আজ যেন আপন স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। শুধু কি তাই? রাত্রিতে কুকুর ডাকে লোকালয়ে, মানুষ ঘুমায়। আজ কুকুরের ডাক শোনা যায় না। বোধহয় আজ তাহারা রাত্রির এই ভয়াল রূপ দেখিয়া ওই ঘরের মাথার আগুনের আলোয় মানুষের মুখাবয়বের দৃষ্টিতে মহাভয়ঙ্কর প্রত্যক্ষ করিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অথবা মানুষের কোলাহলে কুকুরের চিৎকার ঢাকা পড়িয়াছে।

দ্বারমণ্ডলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে দাঙ্গার আগুন। উনিশশো ছেচল্লিশ সালের নভেম্বর মাস। আজ অপরাহ্ণ হইতে শুরু হইয়াছে।

১৬ই আগস্ট কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দাঙ্গার আগুন জ্বালাইয়াছে। কলিকাতার পর অক্টোবরে নোয়াখালি। তাহারই আগুন উল্কার টুকরার মতো ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে দ্বারমণ্ডলে। আগুন জ্বলিতেছে চারিদিকেই। চুড়িপাড়ায়, ব্যাপারীপাড়ায়, টিকেপাড়ায়, তাঁতীপাড়ায়, তেলিপাড়ায়, নতুনপটিতে। পুরানো দ্বারমণ্ডলের সদর বাজারে জুতাপটির মোড়ে, হিন্দু-মুসলমান এলাকার সংযোগস্থলে, গলির মুখে ছুরি—ডাণ্ডা—লাঠি—ভোজালি চলিতেছে। রেললাইনের ওপারে নতুন বাজার এলাকায় বসতি বিচিত্র। হিন্দু-মুসলমান মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে ছোরা—লাঠি চলিতেছে—পাড়ার ভিতরে এখানে ওখানে।

এত বিস্ফোরক যে জমা হইয়াছিল—এ কে অনুমান করিয়াছিল? এত মিলনের চেষ্টা, এতকালের একত্র বসবাস, এত প্যাক্ট, এত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সত্ত্বেও মনের ঘরে এত বারুদ, এত বিষ ছিল!

দেবকী সেন অট্টহাস্য করিয়া বলিল—সোমনাথ, দেবগিরি, পানিপথ, মথুরা—তার আগে বৌদ্ধ সংঘারাম—বাংলায় বৌদ্ধ পল্লীতে পল্লীতে যারা মরেছিল তাদের মেদ মজ্জা অস্থিচূর্ণে প্রস্তুত এই বিস্ফোরক? কোটী মানুষের অশান্ত আত্মা মুক্তি না পেয়ে এ দেশের জলে বাতাসে মিশেছিল। আজ তারা জেগে উঠেছে, উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে তো একজনের দেখা হয়েছে। আমার বিধবা বোনের!

উনিশশো ছেচল্লিশ সাল।

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ দৃশ্যত শেষ হইয়াছে। ইংরেজ যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে দেখিয়াছে ইউরোপে, প্রশান্ত মহাসাগরে যে বহ্নি সে নির্বাপিত করিল মনে করিয়াছিল সেই বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সাম্রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আগুন জ্বলিবে। ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে আগুন জ্বলিবে—তাহাতে পুড়িয়া সে ছাই হইয়া যাইবে। পরিত্রাণের পথ অপসরণ।

আর এক পথ—ওই আগুনে ভারতবর্ষের আত্মাকে দগ্ধ করা।

ইতিহাস সে ভুলিয়া যায় না। তাহার শিক্ষাই ইতিহাসের পাঠ।

আর একবার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনি আগুন জ্বলিয়াছিল। সেই কারণে কূটনৈতিক চেষ্টায় ইতিহাসের মুখ সে পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দিতেছে। বর্তমান ইতিহাসের ছক ভাঙিয়া দুশো বৎসর পূর্বের ইতিহাসের ছকে ঘুঁটি বসাইতেছে।

সতেরশো পঞ্চাশ হইতে সতেরশো একষট্টি সালের ইতিহাসের ছক।

ভারতবর্ষের মানুষের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্য শক্তি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শৃঙ্খলা নাই, দিকে দিকে অরাজকতা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ। তারই প্রতিক্রিয়ায় অবরুদ্ধ-শ্বাস মানুষ মুক্তি পাইবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, শিয়া-সুন্নী, শাক্ত-বৈষ্ণব, জৈন-বৌদ্ধ, চাষী-মধ্যবিত্ত, জমিদার-সামন্ত-রাজা সব এক নব জাগরণে জাগিতেছে। ওদিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া আসিতেছে অভিযানকারী বাহিনী। এর আগেই গিয়াছে ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর, কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা। পাঞ্জাব সীমান্ত হইতে পার্বত্য দেশের ঘরে ঘরে দামড়ির দামে বিকাইতেছে—হিন্দু-মুসলমান কন্যা বধূ। ক্ষেতে খামারে হাজার হাজার ক্রীতদাস কাজ করিতেছে। নাদির শার বাহিনীর অশ্বারোহীরা ঘোড়ার লেজের সঙ্গে তাহাদের হাতে গলায় বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বিক্রি করিয়াছে। আটক হইতে দিল্লি পর্যন্ত পথের দুধারে মাটিতে এখনও কালো রং মিলায় নাই। গ্রাম শহর ক্ষেত খামার পুড়িয়াছিল তাহারই দাগ। ক্ষেত্র কর্ষণের সময় লাঙলের ফালের ডগায় আজও উঠে অজস্র হাড়, মানুষের মাথা। নাদিরের অভিযানের কালে এ পথে রক্ত-পঙ্কের কথা আজও মানুষ ভুলিতে পারে নাই।

আবার তাহারা আসিতেছে।

এদিকে দাক্ষিণাত্যের শক্তি-কেন্দ্র হইতে পূর্ব বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা!—উত্তরে অযোধ্যা-দিল্লি-পাঞ্জাব পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্র বর্গী বাহিনীর অশ্বক্ষুরে বিধ্বস্ত। প্রতি শত নরনারীর মধ্যে অন্তত পাঁচজন অঙ্গহীন, কাহারও নাই নাক, কাহারও কান, কাহারও

হাতের আঙ্গুল।

সামন্তে সামন্তে এ উহার ঘরে আগুন দিতেছে, ও উহার ঘরে ডাকাতি করিতেছে

ইহারই মধ্যে সেই যুগে যুগোপযোগী জাগরণে জাগ্রত হইয়া মানুষেরা দল বাঁধিতেছে। বিভিন্ন দল একটি নেতৃত্বে সংযুক্ত হইলেই বিরাট শক্তিতে পরিণত হইবে পাঞ্জাবে শিখেরা, অযোধ্যায় জাঠ-চাষীরা দল বাঁধিয়াছে। দিকে দিকে পরমাণু মিলিয়া অণু অণু মিলিয়া বস্তুখণ্ডের মতো কঠিন পদার্থে পরিণত হইবার কামনা জাগিতেছে

মহারাষ্ট্রে কামনাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা নীতিগত আমূল পরিবর্তন করিয়া এই মিলিত শক্তির নেতৃত্ব করিতে ব্যস্ত।

ওদিকে দিল্লির অভিজাত মুসলমান আমীরদের বিভিন্ন দলের গোপন বৈঠকে মন্ত্রণা চলিয়াছে। পাঞ্জাবে, রোহিলখণ্ডে, অযোধ্যায়, ফয়জাবাদে বৈঠক বসিয়াছে মনের তুলাদণ্ডে ওজন চলিতেছে মুসলিম বাদশাহী ভারী অথবা এই মারাঠা নেতৃত্ব ব অন্য কোন নেতৃত্ব ভারী? অভিযানকারীরা মুসলিম হইলেও তাহারা বিদেশী, তাহার পর—ইসলামী নেতৃত্ব হইলেও সে যে হইবে পরাধীনতা—বন্ধন—এ সত্য তাহার অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু তবু নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানদণ্ডের যে দিকে চাপানো আছে মুসলিম বাদশাহী সেই দিকে পড়িতেছে একটি আঙ্গুলের সুকৌশল চাপ। সেই দিকটাই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে বারংবার।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্র শিবিরে চলিয়াছে অনুরূপ দ্বন্দ্ব।

মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব বড় অথবা এই সম্মিলিত জাগরণ বড়?

এই অবস্থার মধ্যে প্রতিদিন জীবন হইয়া উঠিতেছে উত্তরোত্তর উত্তপ্ত, অবস্থা হইয় উঠিতেছে অসহনীয়। বহুদিন ঝঞ্ঝা নাই, বর্ষণ নাই, প্লাবন নাই—দিকে দিকে আবর্জনাপুঞ্জ জমিয়া জমিয়া পাহাড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে জীবনও শুষ্ক রসহীন হইয়া পরিণত হইতে চলিয়াছে বস্তুপুঞ্জে। বিদ্রোহী প্রাণ-শক্তি বহ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই বস্তুপুঞ্জকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছে।

পানিপথে সংঘর্ষ হইয়া গেল।

অভিযানকারী আফগান-শক্তি ও সম্মিলিত ভারতবর্ষের শক্তির মধ্যে নয়। সংঘর্ষ হইল অভিযানকারী আফগান মুসলিমবাহিনী ভারতীয় মুসলিম আমীরবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে একক মহারাষ্ট্র বাহিনীর। অন্যান্য হিন্দুশক্তি সন্দিগ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ঔদ্ধত্যে তিক্ত হইয়া দূরে সরিয়া রহিল।

সংঘর্ষে সব ধ্বংস হইয়া গেল।

মহারাষ্ট্রশক্তি পরাজিত হইয়া পানিপথে পড়িয়া রহিল। আকাশ ছাইয়া উঠিয়া আসিল মৃত মাংসাশী খেচরের দল পঙ্গপালের মতো, চারিদিকে শৃগাল কুকুর ছুটিয়া আসিল। শবগন্ধে বায়ুস্তর দূষিত হইল। ওদিকে দিল্লিতে ফিরিয়া মারাত্মক আহত আমীরশক্তি শেষ শয্যা পাতিল, আহত বাঘের মতো পার্বত্য বন্দরে আশ্রয় লইল আফগানশক্তি। সেও নখ-দন্ত-বাহু হারাইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সেইদিনকে স্মরণ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতার দুর্গে দুর্গে ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ওদিকে বন্দরের ঘাটে ঘাটে বাঁধা রণতরীর কামান-গুলির মুখ সমুদ্রের দিক হইতে ফিরাইয়া ভারতবর্ষের দিকে ঘুরিতেছে। প্রতীক্ষমান সৈন্যদল বন্দরের জেটিতে সিঁড়ি ফেলিতেছে। জাহাজের উপর রণবাদ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে গান বাজিতেছে—

Rule Britannia, Rule the Waves···
When Britain first at Heaven's Command
Arose from out the Azure main
This was the Charter of Land.

ওই গান গাহিতে গাহিতে তাহারা নামিল।

শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ সেদিন হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

সেদিন তাহারা শূন্য আসনের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিল—অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ আপন ললাটে হাত রাখিয়া বলিয়াছিল—এই আমাদের ভাগ্য। বিধির বিধানেই বোধহয় তোমরা এদেশে আসিয়াছ। তোমরাই বস ওই শূন্য সিংহাসনে। তাহারা বসিয়াছিল।

আবার তাহারা সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের মানুষের দুই শত বৎসরের ইতিহাসের পটভূমিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

দুই শত বছর পিছাইয়া দিতে পারিলে সেখানে দাঁড়াইয়া সোমনাথ, দেবগিরি, মথুরা, কাশী স্পষ্ট দেখা যাইবে।

বস্তুতান্ত্রিক ইংরাজ—জৈব প্রকৃতি নিখুঁতভাবে বুঝিতে পারে। সে দর্শন তাহাদের দিব্য দর্শন না হইলেও সূক্ষ্মতম দর্শন। সে জানে—সঙ্গে সঙ্গে সেই কালের লীলা প্রকটিত হইবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

বন্দরে বন্দরে জাহাজ সাজানো রহিয়াছে।

দুর্গে দুর্গে রণক্লান্ত সৈন্য।

হোক। যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না। ক্ষতবিক্ষত ভারতবর্ষ আবার তাহার ললাটে করাঘাত করিয়া তাহাদের আহ্বান করিবে।

—এস—বস।

তাহার আয়োজন নিখুঁতভাবে হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মালাবার গিরিগাত্রে জিন্নাভবনে বৈঠক শেষ হইয়া গিয়াছে। আঙুলের টিপে ইসলামের দাবী দেশ জাতি অপেক্ষা ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে সুউচ্চ-গিরিশিখর ও উত্তাল সমুদ্র পার হইয়া আরবে নিবদ্ধ হইয়াছে। ওই তাহাদের দেশ—ওইখানেই তাহাদের আপন সমাজ। এই দেশে ওইখানকার মানুষের খণ্ডাংশ তাহারা। এখানে তাহারা স্বতন্ত্র, পৃথক। দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অতএব, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি।

এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বাস তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এই সত্য প্রমাণ করিবার জন্য বাংলায় সুরাবর্দির নেতৃত্বে রক্ততাণ্ডব শুরু হইয়াছে।

হিন্দুরাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই মরণ তাণ্ডবে নাচিতে শুরু করিয়াছে।

স্বারমণ্ডলে বাধিয়াছে সেই দাঙ্গা।

স্বারমণ্ডলের ইতিহাসও যে ভারতবর্ষের, ইতিহাসেরই খণ্ডাংশ। সেই ইতিহাসেরই ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ। সাত বৎসর পূর্বে জয়তারার আশ্রমের অংশ লইয়া যে দাঙ্গা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছিল, যে দাঙ্গার মীমাংসার জন্য ন্যায়রত্ন আসিয়া থাকিয়া গিয়াছেন এখানে, সেই দাঙ্গা আজ নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ন্যায়রত্ন স্থবির হইয়াছেন।

অজয় জেলে। মুক্তি তাহার আসন্ন। সম্ভবত দিন কয়েকের মধ্যেই। সাত বৎসর জেল হইয়াছিল অজয়ের।

জয়া—অজয়ের মা নাই। তিনি দেহ রাখিয়াছেন। এখন অরুণাই তাঁহার সেবা করে।

দেবকী সেন আসিয়া বলিল—জয়তারা আশ্রম ওরা আক্রমণ করবেই। তাহার হাতে একখানা তলোয়ার।

অরুণা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—তলোয়ারে ওই দাগ—

—রক্তের। তিনজনকে কেটেছি আমি।

—কেটেছেন?

—উপায় ছিল না। নইলে তারা আমাকে কাটত। পাড়া বাঁচাচ্ছিলাম। ওরা আক্রমণ করতে এসেছিল। আপনাদের কিন্তু এখানে আর থাকা হবে না। ওরা এখানটা আক্রমণ করবে। ঠাকুরমশায়ের উপর ওদের কঠিন আক্রোশ, এবং তারও চেয়ে বেশী আক্রোশ এবং ঘৃণা আপনার উপর।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। বলিলেন—হবারই কথা। আক্রোশ আমার উপর আর অরুণার উপরই হবে। কিন্তু স্থানত্যাগ তো করতে পারব না সেন মহাশয়।

দেবকী সেন বলিল—আপনি কি জয়তারা আশ্রমের কথা ভাবছেন?

—ভাবছি বইকি।

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আশ্রম আমরা রাখব। জঙ্গলের চারিদিকে এরই মধ্যে অন্তত একশো লোক এসে গিয়েছে। আরও লোক আসছে। এখানে যদি ঢোকে—ঢুকতে পারে—তবে জানবেন জংশনের সমস্ত হিন্দু মরে গিয়েছে। একজনও বেঁচে নেই।

—তবে আমাকে যেতে বলছ কেন?

—বলছি অন্য কারণে। বন্দুক বেরিয়েছে, বন্দুক আরও বেরুবে। গুলি ছুটবে। তা ছাড়া এই রক্তারক্তির মধ্যে আপনি কি শান্তি পাবেন?

—তা হয়তো পাব না। পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তবু থাকব আমি। তুমি বরং অরুণাকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এস।

অরুণা বলিল—না দাদু, আমি যাব না। আমিও এইখানেই থাকব

দেবকী সেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। বলিল—দেখুন আমার কিন্তু সময় নেই। যা স্থির করবার করে ফেলুন। আমার অনেক কাজ। আজই শেষ রাত্রে সে কাজ আমাকে শেষ করতে হবে।

তাহার চোখ দুইটা ঝকমক করিয়া উঠিল। একটা নিষ্ঠুর সংকল্প সে ঝকমকানির মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া আবার মুখ লুকাইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—সেন!

—ঠাকুরমশাই!

—তুমি কি—

—আপনার কাছে লুকোবার কিছু নাই। আমি ওই যে কানপুরিয়া মুসলমান ফৈজুদ্দিন—যার বড় মনিহারীর দোকান আছে, তার বাড়িতে আগুন ধরাব। তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। অনেক দিনের।

অরুণা এবার বলিয়া উঠিল—না-না। এ আপনি কি বলছেন দেবকীবাবু? এই সর্বনাশা দাঙ্গা—এই গৃহবিবাদ—

—মিটে যাক। শান্ত হোক হিন্দু মুসলমান। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। কিন্তু ওর সঙ্গে বোঝাপড়াটা আমার ব্যক্তিগত। এই তার উপযুক্ত সময়। এ গেলে আর আসবে না। পাব না। এই বোঝাপড়ার জন্য আন্দামান থেকে ফিরে বহু সন্ধান করে এসেছি এখানে। অরুণা দেবী, আমার নালিশের আপোস নাই। আমার যুদ্ধের সন্ধি নাই, মার্জনা নাই। জানেন, আমি যখন আন্দামানে ছিলাম তখন আমার একটি মাত্র বিধবা ভগ্নী—সংসারের একমাত্র বন্ধন—তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একদল বর্বর, তার সন্ধান আর পাইনি, জানেন?

—জানি দেবকীবাবু, কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই অরুণা দেবী, ওই ফৈজুদ্দিনের বড় ছেলে—সেই—সেই ছিল ওই দলের নেতা। আমাদের ওখানে তখন ওদের চামড়ার ব্যবসা ছিল। আমি যখন ফিরলাম তখন ওদের চামড়ার ব্যবসা ফেল হয়েছে। ওরা নাই। কানপুর গিয়ে সন্ধান করলাম--সেখান থেকে এখানে। এখানে ওরা এসেছে তখন। আমি এলাম এখানে। আজ চোদ্দ বছর এখানে বসে আছি দেখা করবার জন্য—দেখা করব না?—শুধু তাই নয়, শুধু ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই যাচ্ছি না। ভাইফোঁটা আনতে যাচ্ছি। আমার বোন আজ ওর বাড়িতে রয়েছে। তার হাতে একটা তিলক পরে আসব। চন্দন ঘষতে হবে না। আমি যাই, আপনারা সাবধানে থাকবেন।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—তাই বা বলা কেন? মানুষের অহঙ্কার। যা ভাল বিবেচনা করবেন আপনারা—।

দেবকী সেন দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। অরুণা বিস্ময়ে আবেগে অভিভূত হইয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমার নালিশের আপোস নাই, আমার যুদ্ধের সন্ধি নাই, মার্জনা নাই! কথা কয়টা অরুণার কানের পাশে বাজিতে লাগিল। এত বড় আঘাত যা এই সুদীর্ঘ চোদ্দ

বছরেও এতটুকু মিলাইয়া যায় নাই। মানুষ লইয়াই তো সমাজ, সমাজ লইয়াই জাতি। মানুষে মানুষে সমাজে সমাজে এমন ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই আজ এই পরিণতি। তবু তাহার বিশ্বাস আছে। বিগত এক শতাব্দীর ইতিহাসে বার বার যে মিলনের চেষ্টা হইয়াছে তার ফল আজ না ফলুক—এই দুর্দিনের পর—দূর ভবিষ্যতে একদিন ফলিবেই।

একজন কেহ আসিয়া দাঁড়াইল।

—কে ?

—আমি গৌর।

অরুণা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তরুণ যৌবনে উপনীত গৌর দেবকী সেনের মতোই একখানা তলোয়ার হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার তলোয়ারেও রক্তের চিহ্ন!

গৌর দেবুর শিষ্য। অরুণা জানে দেবু আজও এই মুহূর্তে তাহার দল লইয়া এই দাঙ্গা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু মুসলমান নেতাদের লইয়া শান্তি কমিটি গঠন করিবার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেছে। শ্লোগান তৈয়ারি করিতেছে। পোস্টার লিখিতেছে। সে মনশ্চক্ষে দেখিতেছে—স্বর্ণ তাহাকে সাহায্য করিতেছে। তীব্রকণ্ঠে কঠিন নিন্দা এবং সমালোচনা করিতেছে—এই সাম্প্রদায়িকতার। শ্রমিক অঞ্চলে তাহাদের কর্মীরা ফিরিতেছে এবং এখনও পর্যন্ত সেখানে তাহারা দাঙ্গা বাধিতে দেয় নাই। সে চেষ্টা সফল হইবে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস, কিন্তু অরুণা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ওখানেও বাধিবে। আর দেবুদের এই চেষ্টার কোন বড় মূল্যও দেয় না অরুণা। কি করিয়া দিবে ? তাহারা তো হিংসা রক্তপাত বা হত্যায় অবিশ্বাসী নয়। সে শিক্ষা তো তাহারা কোনদিন দেয় নাই। তাহারা তো এর চেয়েও ব্যাপক হত্যা-কাণ্ড চায়, রক্তের নদী বহাইয়া দিয়া সমস্ত কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া সমান করিয়া দিতে চায়! তবে ? তাহাদের বক্তব্য সেই বড় রক্তপাতের প্রতীক্ষায় এই ছোট রক্তপাতটা স্থগিত রাখা। এই রক্তপাতের উন্মাদনাটাকে আরও লালিত করিয়া, সবল করিয়া, সাম্প্রদায়িকতার বদলে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডে পরিণত করা।

ফল তাহার আছে।

বৃহৎ—বিপুল এক সাম্যবাদী দেশ।

অরুণার প্রিয়তম বিশ্বনাথের জীবন-স্বপ্ন, অরুণার জীবন-স্বপ্ন! কিন্তু তবু অরুণার ওই রক্তপাতে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। রক্তপাত, যুদ্ধ, একটা আর একটাকে টানিয়া আনে। আনিবেই—আজ না হোক—কাল। একটা যুদ্ধ আর একটা যুদ্ধের ভূমিকা রচনা করে। একটা বিপ্লব আর একটা বিপ্লব আনে। আদর্শের জন্য না হোক—দলগত প্রাধান্যের জন্যও আসে। ব্যক্তিগত প্রাধান্যের জন্যেও—তবে সবই আদর্শের নামে।

এই কয়েক বছরের জীবনে—এই বৃদ্ধের কাছে সে অনেক শুনিয়াছে! সব সে যুক্তি দিয়া সত্য বলিয়া মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু হৃদয় দিয়া না মানিয়া পারে নাই। একদিন কাব্যালোচনা করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন—ভাই, তোমরা অনেক

বিদেশী সাহিত্য কাব্য পুরাণ পাঠ করেছ । আমি তা পড়ি নাই। কিন্তু এক মহাভারত পড়েই মনে হয়েছে এর পর আর হয় না। সমস্ত জীবনটা ওই ভারত-কথা উপলব্ধি করতে করতেই কেটে গেল। ব্যাসদেবের তুল্য দিব্য-দ্রষ্টা আর কেউ হয় না। কৃষ্ণ চরিত্রের কথা ভাবি আর বিস্ময় লাগে। ব্যাসদেব তাঁকে পরমপুরুষ করে সৃষ্টি করলেন। তাঁর কল্পনায় তাঁর অনুভূতির দিব্য-দর্শনের পরম-পুরুষ। তিনি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গীতা শোনালেন। বললেন—আমি এদের মেরে রেখেছি—তুমি নিমিত্ত মাত্র। তুমি শরক্ষেপ করে লৌকিক মৃত্যু ঘটাবে মাত্র। বললেন—আমিই সেই! সব ভাবনা পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও। বললেন—যুগে যুগে আমি পাপক্ষয়ের জন্য আবির্ভূত হই। তুমি যুদ্ধ কর, এর কোন পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের পর গান্ধারী যখন অভিসম্পাত দিলেন যে—আমাকে যেমন তুমি বংশনাশের নিষ্ঠুর সন্তাপ দিলে—আমার অভিসম্পাতে তোমাকেও পেতে হবে অনুরূপ সন্তাপ। বিধাতার স্রষ্টা ব্যাসদেব, কি সূক্ষ্ম তাঁর বিচার! তিনি তাঁর কল্পনার পরমপুরুষকেও আঘাতের ফলে প্রতিঘাতের এই অমোঘ নীতির ফল থেকে অব্যাহতি দিলেন না। জ্ঞাতি কলহে—কৌরব-পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পঞ্চ পাণ্ডব ছাড়া বাকী সব শেষ হয়েছিল। এ যুদ্ধের মূলে ছিলেন—কৃষ্ণ। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে—সমুদ্রতটে দ্বারকায় হল প্রভাস। তাঁর নিজের কুলে—আত্ম-কলহে যদুবংশ একদিনে ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। দ্রোণ মিথ্যা পুত্রশোকের সংবাদে বিচলিত হয়ে অস্ত্র ফেলে দিলেন, চোখ থেকে নেমে এল পুত্রশোক সন্তাপের অতি উষ্ণ শোকাশ্রু। তিনি যোগাসনে বসলেন রথের উপর। তবু ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়ে তাঁর শিরচ্ছেদ করলে। কর্ণ নিরস্ত্র—পৃথিবী গ্রাস করেছে রথচক্র, তিনি টেনে তুলছেন,—অর্জুনকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রতিজ্ঞা, বললেন—সূতপুত্র এবং ক্ষত্রিয়ে সমান নয়, পশুকে যেমন নিরস্ত্র বধে পাপ নাই তেমনি কর্ণকে নিরস্ত্র বধেও তোমার পাপ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণকে তিরস্কারের ছলে স্মরণ করিয়ে দিলেন—দ্যূত-সভা, যাজ্ঞসেনীর লাঞ্ছনা, সর্বোপরি অভিমন্যুবধের কথা। কর্ণকে বধ করলেন অর্জুন। কিন্তু বিধাতার স্রষ্টা ব্যাসদেব—পরম পুরুষকেও এর প্রতিফল থেকেও নিষ্কৃতি দেননি। নিরস্ত্র চিন্তামগ্ন যদুপতি যখন বৃক্ষকাণ্ডে দেহভার রেখে সম্মুখের দিকে চেয়ে আছেন—তখন তাঁর রক্তাভ পদযুগল দেখে মৃগভ্রমে শরাঘাত করল জরা ব্যাধ। আর তাতেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। অমোঘ যে প্রকৃতির নীতি, যাতে প্রতি ধ্বনিতে তোলে প্রতিধ্বনি, প্রতি আঘাতে তোলে অনিবার্য প্রতিঘাত, উত্তাপে আনে বর্ষণ, বর্ষণে আনে শৈত্য, সেই নীতিকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ব্যাসদেব! তাই তিনি তাঁর রচনায় বিধাতাকেও এই নিয়মের ক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দিতে পারেননি। এর চেয়ে বড় শাস্ত্র—শাস্ত্র বল শাস্ত্র, পুরাণ বল পুরাণ, সাহিত্য বল সাহিত্য,—আর কিছু নাই—আমার কাছে আর কিছু নাই।

অভিভূত হইয়া গিয়াছিল অরুণা।

ভাগবত-কথকের অপূর্ব কথকতায় যে পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে বহুক্ষণ

সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। কানের পাশে ওই কথাগুলিই যেন গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল। পরে ভাবনা যখন তাহার ক্রিয়াশীল হইল, তখন সে বিস্মিত না হইয়া পারে নাই। ধ্বনির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিধ্বনি, উত্তাপের প্রতিক্রিয়ায় বর্ষণ, বর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় শৈত্য, কুরুক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাস, কৌরব-বংশের ধ্বংসের প্রতিফলে যদুবংশের ধ্বংস, নিরস্ত্র দ্রোণ কর্ণের মৃত্যুর ফলে নিরস্ত্র কৃষ্ণের শরাহত হইয়া দেহত্যাগ—অপূর্ব সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্ট সকল ঘটনা সত্য হোক বা না-হোক—তাহাকে এমন করিয়া পরম্পরায় সাজাইয়া মহাসত্যরূপে প্রকাশ সত্যই সুদুর্লভ। বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ, ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় আত্মসঞ্জাত দ্বন্দ্ব—মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, সমাজে সমাজে। তাহার নূতন দিনের উপলব্ধিতে অপরূপভাবে মিলিয়া যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় মানিয়া লয়—এই চিরাচরিত রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে মানুষের জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে যে পরিবর্তিত রূপই আসুক—যত সার্থকতাই সে লাভ করুক—আজ হোক কাল হোক তবু আর একটি রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম তাহার পরিণতি হিসাবে অবশ্যম্ভাবী।

তাই দেবুদের ওই বড় রক্তাক্ত সংগ্রামের স্বপ্নের সঙ্গে তাহার স্বপ্ন আর মেলে না। তাহার স্বপ্ন আজ পৃথক।

কিন্তু সে কথা যাক। দেবুদের এই ছলনাময় শান্তি প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করিবে না, সে জানে। সে জানে—মানুষ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবে না। যাহারা উৎকট রকমের শাক্ত—সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে—তাহারা বৈষ্ণব সাজিয়া অহিংসার কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। ওই প্রাকৃতিক নিয়মেই করিতে পারিবে না।

কিন্তু গৌর আসিল কেন? গৌরের তো আসার কথা নয়।

সে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভাই অরুণা, রাত্রি হয়েছে বিশ্রাম কর। উৎকণ্ঠা হবেই। কিন্তু তার তো উপায় নাই। সতর্ক থাকলেই হবে। বিশ্রাম কর।

ইঙ্গিতে ন্যায়রত্ন নিজের বিশ্রামের সময়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অরুণা লজ্জিত হইল। তাঁহার বিছানা করিতে হইবে। আহার অবশ্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই করেন তিনি। সামান্য আধপোয়া দুধ। তাহা সারা হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। রাত্রি এদিকে কিছু হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিল সে। বলিল—এই যে, বিছানা করে দিই।

জয়তারা আশ্রমে ছোট তিন কুঠারী মাটির একখানা ঘর, সামনে একটুকরা বারান্দা—ন্যায়রত্ন তৈয়ারি করাইয়া লইয়াছেন। একখানিতে তিনি নিজে থাকেন, একখানি রান্নার জন্য, অপরখানিতে থাকে অরুণা। পূর্বে থাকিতেন অজয়ের মা জয়া।

ঘরের মধ্যে কাঠের পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বালিয়া অরুণা তাড়াতাড়ি বিছানা করিয়া ফেলিল। বিছানাই বা কি? দুইখানা কম্বল, একটা নামমাত্র বালিশ। দুইখানা চাদর। একখানা পাতিবার, অপরখানা তসরের—সেখানা পায়ের কাছেই ভাঁজ করা থাকে, কোনদিন শরীর অসুস্থ বোধ করিলে বা বর্ষাবাদলে শীত অনুভব করিলে গায়ে দেন। ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়স হইল চুরাশি, সুতরাং শীত অনুভবের দোষ কি? আবার ঘরের সব জানালাগুলি খোলা থাকা চাই। তবে এইবার শরীর যেন ঘন ঘন

অসুস্থ হইতেছে। অজয়ের গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর হইতেই এটা হইতেছে। এই লইয়া অরুণার মনে আত্মগ্লানি আছে—লজ্জা আছে, আবার অভিমানও আছে। সে কি তাঁহার মতো পরিচর্যা করে না? বা করিতে পারে না? অরুণা এদিক দিয়া যত প্রকার বৈজ্ঞানিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন—তাহা করিয়া থাকে। জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লয়। রান্নাবান্না আঢাকা রাখে না। ঘরের আশপাশ—মেঝে, এগুলি ফিনাইল দিয়া শোধন করিয়া লয়।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়—অজয়ের গর্ভধারিণীর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহটাই ইহার হেতু। তাঁহার অভাবেই তিনি মনে মনে মৃত্যু কামনা করিতেছেন। সে একটা কথা বুঝিয়াছে। এই মানুষটির মনে এমন একটি ইচ্ছাশক্তি আছে—যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি প্রায় ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিতে পারেন। জয়ার অভাবে—সেই ইচ্ছার বীজ কি মনের গভীরে উপ্ত হইতেছে? সে জয়ার অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই। ন্যায়রত্ন তাহাকে জয়ার আসনে বসাইতে পারেন নাই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া বলিল—আসুন দাদু, বিছানা হয়ে গেছে, উঠুন।

ন্যায়রত্ন উঠিলেন। ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

অরুণা বাহিরে আসিয়া এবার গৌরকে ডাকিয়া বলিল—গৌর!

—অরুণাদি।

হাসিয়া অরুণা বলিল—তুই অমন করে তলোয়ার হাতে—? বাকীটা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিল না অরুণা। বলা তাহার ঐটুকুতে হইয়া গিয়াছে।

গৌর বলিল—থাকতে পারলাম না, অরুণাদি। দেবুদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। এ আমার সহ্য হয় না। আমি দেবকীদাদার সঙ্গে চলে এলাম।

একটা ট্রেনের হুইশিল বাজিল।

রাত্রি এগারোটার ট্রেন। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। সদর শহর হইতে জংশনে আসিবার ট্রেন।

অরুণা চমকিয়া উঠিল।

অজয় যদি নামে! সে তো যে কোন দিন খালাস পাইবে!

অরুণা বলিল—হ্যাঁরে, স্টেশনে লোক আছে তো?

গৌর বলিল—সে ঠিক আছে। আর অজয় আজ আসবে না। আমি খবর নিয়েছি আরও সাতদিন দেরি হবে। তার রেমিশন কাটা গিয়েছে হাঙ্গার স্ট্রাইকের জন্য।

অজয় জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করিয়াছিল। তখন একবার অরুণা তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। অজয় তাহাকে স্মিতমুখেই সম্ভাষণ করিয়াছিল—তাহাকে মা বলিয়া সে অনেকদিন আগেই স্বীকার করিয়াছে। সেইদিন, যেদিন সে দরবারী হালদারকে গুলি করিয়াছিল—সেই দিন। জেলখানায় সেদিন তাহাকে মা বলিয়া হাত ধরিয়াছিল। ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে অনন্ত সার্থকতা লাভ করিবে।

হঠাৎ একটা দুরন্ত চিৎকারে সে চমকিয়া উঠিল। কোথায় একটা প্রচণ্ড আক্রমণ

আরম্ভ হইল। রাত্রির অন্ধকার যেন চিড় খাইয়া গেল।

দেবকী সেন?

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অরুণা।

—দাদু!

—ভিতরে এস। বাইরে থেকে উৎকণ্ঠা বাড়িয়ো না।

—ঘুম যে আসবে না দাদু! সে যে আরও কঠিন উৎকণ্ঠা ভোগ করব।

—ভিতরে এস। আমার কাছে বস। গল্প বলি।

বাহিরে আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। আগুন লাগিয়াছে।

সেই রাত্রে কোলাহল শুনিয়া এবং রাত্রির অন্ধকারে শূন্যমণ্ডলে আগুনের ছটা দেখিয়া প্রথমেই অরুণার দেবকী সেনের কথা মনে হইয়াছিল। দেবকী সেনের চোখের কোণে সে বনস্পতির বীজের মতো ওই আগুনের প্রথম অগ্নিকণা দেখিয়াছিল। ভুল তাহার হয় নাই। দেবকী সেনই বটে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া সে দীর্ঘদিন এই জংশন শহরে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বোধকরি এই দিনটির জন্যই তাকাইয়া আছে ফৈজুল্লা মিঞার প্রকাণ্ড বড় বাড়িটার দিকে! ইটের নিরন্ধ্র দেওয়াল ভেদ করিয়া খুঁজিয়াছে তাহার বিধবা বোনকে।

সে যখন আন্দামানে ছিল—তখনই সে হারাইয়া গিয়াছে। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ডিসেম্বরের শেষ রাত্রে পূর্ববঙ্গের এক পল্লীগ্রামের মাথার উপরের নিশীথ রাত্রির আকাশ তাহার সাক্ষী। মানুষেরা কেহ কিছু বলিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় সুমিত্রাকে সকলে দেখিয়াছিল, কিন্তু পরদিন সকালে আর কেহ তাহাকে দেখে নাই। শুধু দেখা গিয়াছিল ঘরের একটা দেওয়ালের খানিকটা কাটা। দরজাটা খোলা, ঘরের ভিতরের সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত। অনুমান করিতে কাহারও এতটুকু সংশয় হয় নাই; দ্বিধা হয় নাই যে—এই ধরনের পাপানুষ্ঠানের চিরাচরিত পদ্ধতিতে গভীর রাত্রে দেওয়াল কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া সুমিত্রাকে দুর্বৃত্তেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন পাপের পর অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ধর্ষিতা হতভাগিনীর অচেতন দেহটাও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সুমিত্রাকে পাওয়া যায় নাই।

রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া দেবকী সেন যেন ধ্যানযোগে—এই নক্ষত্রলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর ইতিহাস জানিয়াছে, নক্ষত্রেরাই তাহাকে যেন সে দিনের কথা বলিয়াছে। বলিয়াছে—সুমিত্রা মনে মনে ডাকিয়াছিল তাহার দাদাকে—দেবকীকে। ভারতবর্ষ উদ্ধারের ব্রত লইয়া আন্দামানের কারাকক্ষে শুইয়াও দেবকী তখন বড় বড় তত্ত্ব চিন্তা করিতেছিল। জাতিহীন সমাজ—স্বাধীন ভারতবর্ষ—সমৃদ্ধ দেশ—আক্রোশহীন কলুষহীন একজাতি—একপ্রাণ এক বিরাট দেশ—সে কি অপরূপ সুখ স্বপ্ন! সুমিত্রা বুঝি তাহার পর ভগবানকে ডাকিয়াছিল। তাহার পর অন্ধকার চৈতন্যহীনতার মধ্যে নিঃশেষে তলাইয়া গিয়াছিল। রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইলে

দেবকীর কানে আজও সেই কাহিনী কেহ যেন ফিস ফিস করিয়া বলিয়া যায়। রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া তাই সে পাগল হইয়া ওঠে।

আন্দামান হইতে ফিরিয়া সে কিছুদিন পাগলের মতো ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কোথায় সুমিত্রা! গ্রামে গ্রামে দীনহীন পাগলের মতো ঘুরিত—প্রত্যাশা করিত—কোন দুরধিগম্য পল্লীগ্রামের এক গৃহাঙ্গনে তাহাকে বন্দিনী অবস্থায় দেখিতে পাইবে। মাস ছয়েক ঘুরিবার পর সে সন্ধান পাইল সুমিত্রার। একজন মুসলমানই তাহাকে সন্ধান দিয়াছিল। বলিয়াছিল—এ কাজ স্থানীয় মুসলমান বা হিন্দু বদমায়েসদের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। এ কাজের মূলে ছিল ওই ফৈজুল্লা মিঞা! দূর পাঞ্জাব বা সিন্ধু কোন্ দেশে তাহার বাড়ি—কেহ জানে না। এদেশে আসিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। ফৈজুল্লাই একদিন ব্যবসার কাজে তাহাদের গ্রামে আসিয়া সুমিত্রাকে দেখিয়াছিল। তাহার পরই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এবং ফৈজুল্লা সাহেব এ অঞ্চল হইতে তাহার ব্যবসা-কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বড় কেন্দ্রে বসবাস করিতেছে। ক্রমে সন্ধান করিয়া এই ধারণা দেবকী সেনের মনে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ায়—সে খুঁজিয়া এই জংশন শহরে ফৈজুল্লাকে আবিষ্কার করিয়াছে এবং এমনই একটি দিন আসিবে, এই দেশের ইতিহাসে—আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রতিঘাতের মতো—এমনি একটি দিন অনিবার্য গতিতে আনিয়া দিবে—এই বিশ্বাস লইয়া এইখানে আজ সে আট বৎসর বসিয়া আছে। নামটা সে পাল্টায় নাই—কিন্তু তাহার দেশ—তাহার অন্য পরিচয় এতদিন কাহাকেও বলে নাই। একদিন শুধু একজনেব কাছে বলিয়াছিল।

তাই অরুণার অনুমানে ভুল হইল না। নিশীথ রাত্রে ওই কোলাহলের মধ্যে দেবকী সেনের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না, ভুল হইল না। ওই আগুনের ছটার মধ্যে দেবকী সেনের চোখের কোণের বহ্নিকণা এবং হাতের মশালের আগুনের প্রতিচ্ছটা সে মুহূর্তে আবিষ্কার করিল।

বাজারের একটা তে-রাস্তার মোড়ের উপর ফৈজুল্লার বাড়ি। নিচে এ জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মনিহারীর দোকান। যে কোন সময়ে অন্তত লক্ষ টাকার মাল তাহার দোকানে মজুত থাকে। এ জেলার এবং পার্শ্ববর্তী একটা জেলার ছোট দোকানদারেরা ফৈজুল্লার দোকান হইতেই মাল কিনিয়া কারবার করে। ফৈজুল্লার দোকান হইতেই পিছনে একটা দিক ক্রমশ পুরাপুরি মুসলমান অধ্যুষিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনটা রাস্তার একটা রাস্তার দুইটা দিক ইতিমধ্যে তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। এ দিক দিয়া দেখিলেই যেন মনে হয়—ইহার পিছনে একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল বা আছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অন্যরূপ। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার দিক দিয়াও প্রধান। এখানে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা ঘন সন্নিবদ্ধ হইয়া বাস না-করিয়া স্বস্তি পায় না। স্বসম্প্রদায়প্রীতি এবং ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতসম্ভূত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ঠিক দুইটা দলে ভাগ করিয়া—দাবা বোড়ের ছকের মতো আপনা হইতেই সাজাইয়া তুলিয়াছিল—এবং তুলিতেছিল। গোটা ভারতবর্ষের ছকেই এমনি ধারায় সন্নিবেশ

সাজিয়া উঠিতেছিল। তাহারই প্রতিফলন জংশনেও পড়িয়াছিল। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে—খেলার ধারাটা অকস্মাৎ পৃথিবীর ছকের খেলার প্রভাবে এমনই দাঁড়াইল যে, সংঘাত আসিল অবশ্যম্ভাবী রূপে। দেবকী সেন পাইয়া গেল তাহার বহু প্রতীক্ষার সুযোগ।

এতক্ষণ পর্যন্ত দুই পক্ষ দুই সীমানায় দাঁড়াইয়া পরস্পরের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছিল। দুই-চারিটা চোরাগোপ্তা মারও—ছুরি, লাঠি এদিকে ওদিকে চলিতেছিল।

রাত্রে প্রথম আগুন জ্বলিল।

আগুন জ্বলিতেছিল—মুসলমান পল্লীর প্রান্তেই প্রথম।

পল্লীর প্রান্তে কয়েক ঘর হিন্দুস্থানী বসতি ছিল। এ শহরে তাহারা আগন্তুক। এ শহরে তাহারা নানা ব্যবসায় করে। ঘর কয়েক জুতা সেলাইয়ের ব্যবসা করে, ঘর দুয়েক আছে—তাহারা ছোলা মটর ভাজে, মুড়ি ভাজে, অর্থাৎ ভুজাভুজির দোকান করে, এক ঘর ছাগল পুষিয়া দুধ বিক্রি করে, ঘর দুই-তিন ঘোড়ার সহিস কোচম্যানের কাজ করে। আগুন লাগিল প্রথম এই পাড়ায়। জন দুই খুনও হইল।

খবরটা বিদ্যুতের মতো ছড়াইয়া পড়িল।

একটা মানুষই যদি প্রাণের আতঙ্কে চিৎকার করে—তবে সেই চিৎকারেই আকাশ চিরিয়া যায়। এ একটা পাড়ায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষ প্রাণের আতঙ্কে যে চিৎকার করিল—সে চিৎকার মুহূর্তে শহরটার সকল কোলাহল ছাপাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ তাহারা ছাদে উঠিয়া দেখিল শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আগুন জ্বলিতেছে। একদল মানুষ বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল পথের উপর। পথে-পথে তখন খবর ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে—আগুন, আগুন! চামারপাড়ায় সহিসপাড়ায় আগুন! দশ-পনেরো জনকে কেটেছে!

শঙ্খ বাজিয়া উঠিল চারিদিকে।

জনতা জমিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘকায় মানুষ হাঁক মারিয়া সামনে লাফ দিয়া পড়িল।

—দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ভেড়ার পাল সব! বলিয়াই সে একটা হাঁক মারিয়া উঠিল—ডাকাতের হাঁক—লাঠিয়ালের হাঁক—আ-বা—বা-বা-বা!

আর কেহ নয়—রামভল্লা! কাপড় সাঁটিয়া হাতে চার-হাত পাকা বাঁশের লাঠি লইয়া পিছনের অন্ধকার হইতে অকস্মাৎ সে যেন একটা দৈত্যের মতো সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

—রাম—এই রাম—রাম!

ডাকিল রামের বর্তমান মনিব জীবন দে। সে জংশনের বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এখন অবিসম্বাদী নেতা। রাম এই মুহূর্তে মনিবের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল না। পিছু ডাকায় প্রচণ্ড ক্ষোভে সে ক্ষুব্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—কে? কে রে শুয়ারের বাচ্চা!

জীবন ভড়কাইয়া গেল ! তবুও সে কোনমতে সাহস সঞ্চয় করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—আমি।

—কে ? এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রাম তাহার দিকে চাহিল। চাহিয়াও চোখ যেন তাহার চিনিতে চাহিতেছিল না।

জীবনই বলিল—কি ? হল কি তোর ? আমাকে চিনতে পারছিস না ? ক্ষেপে গেলি নাকি ?

এবার রাম তাহাকে চিনিয়া বলিল—দে মশায় !

—হ্যাঁ।

—এস, এগিয়ে চল। সহিসপাড়া জ্বলছে—চামারদের ঘর জ্বলছে। খুন হয়েছে দেখছ না !

—দাঁড়া। পুলিশে খবর দিয়েছি—পুলিশ আসছে।

—আঃ ! একটা চিৎকার করিয়া উঠিল রাম। পুলিশ কি করিবে ? কি হইবে ! পুলিশের সাহায্যে যাহারা মার খাইয়া সেই মার খাওয়ার প্রতিবিধান করে—রাম সে দলের মানুষ নয়। সে জীবনকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া উঠিল—পুলিশ ! পুলিশ ! যাও-যাও —ঘরে খিল দাও গে, যাও।

ঠিক এই মুহূর্তে একখানা তলোযার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল দেবকী সেন। সে সাজিয়া আসিয়াছে। হাতে তলোয়ার—কাঁধে দড়ির মালায় ঝোলানো রিভলবার। বায়ু এবং বহ্নি একসঙ্গে মরণোল্লাসে মাতিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া ধ্বনি দিয়া ছুটিয়া চলিল।

দেবকী ধ্বনি দিল—বন্দেমাতরম্।

রামভল্লা ও ধ্বনিতে যোগ দিতে পারিল না—সে আ-বা-বা-বা করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর সে ধ্বনি দিয়া উঠিল—কালী মায়িকী জয়।

গোটা জনতাটা যেন জমাট হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। ছুটিয়া চলিল তে-রাস্তার দিকে। ওদিকে মুসলমান জনতাও চিৎকার করিতেছিল—আল্লা হো-আকবর !

ফৈজুল্লার ছাদ হইতে বন্দুকের গুলি ছুটিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পাঁচ-সাতশো উন্মত্ত মানুষের সে অভিযান যেন বাঁধভাঙা নদীর জলরাশির মতো প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন। সংখ্যায় অল্প মুসলমান জনতার প্রতিরোধ ভাসিয়া গেল।

তারপর কোথা দিয়া যে কি হইল—সে কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। মুসলমান পল্লী জ্বলিয়া উঠিল। চিৎকার—আর্তনাদ উঠিল।

কে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—ফৈজুল্লা পালাচ্ছে মোটরে চেপে।

দেবকী সেন ছুটিল।

রামও ছুটিল। ফৈজুল্লার উপরে তাহারও প্রচণ্ড ক্রোধ। অহেতুক। কিন্তু ক্রোধটা সত্য। তাহার পিছনে ছুটিল একদল লোক।

সত্য সংবাদ ! ফৈজুল্লার বাড়ির পিছনের দিকে সরু একটা গলিপথে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরটায় স্টার্ট দেওয়া হইয়াছে। জনতা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। একজন

মানুষকে চাপা দিয়া গাড়ি চালাইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু এ একটা জনতা—তাহার উপর পথটা সংকীর্ণ।

দেবকী সেন হাঁকিয়া বলিল—কাঠ ফেলে দাও পথের উপর।

ফেলিয়া দিবার দরকার হইল না। গাড়িটা থামিয়া গেল। গাড়ি খুলিয়া নামিল ফৈজুল্লা। হাতে তাহার বন্দুক। তাহার সঙ্গে তিনটি মেয়ে, গুটি চারেক শিশু। ফৈজুল্লা দাঁড়াইয়াছে—সে লড়িয়া মরিবে। ইরান তুরান হইতে যাহারা একদা পাহাড় ডিঙাইয়া আসিয়া হিন্দুস্থান জয় করিয়াছিল সে তাহাদের বংশধর। সে ভীরু নয়। একদিন যাহাদের তাহারা জয় করিয়াছিল—আজ আবার তাহাদের কাছেই মাথা হেঁট করিতে হইবে বলিয়াই সে মৃত্যু ধ্রুব জানিয়াও সহস্রের বিরুদ্ধে শত জনের নেতৃত্ব লইয়া লড়িতে উদ্যত হইয়াছে। নিজে সে পলাইতেছিল না, মেয়েদের পাঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এই পথটুকু শুধু নিজে বন্দুক লইয়া তাহাদের পার করিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া আসিবার সংকল্প করিয়াছিল।

সে বন্দুক হাতে দাঁড়াইল।

দেবকী সেন বাঁ হাতে তলোয়ার ধরিয়া ডান হাতে রিভলবার খুলিয়া লইল।

অকস্মাৎ তিনটি মেয়ের একজন বোরখা খুলিয়া জনতার দিকে চাহিয়া বলিল—আমাদের মারবেন মারুন—আমাদের এই ছেলেদের—এই শিশুদের—।

সে আর বলিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবকী সেন?

এক মুহূর্তে যেন সে বোবা, পঙ্গু হইয়া গেল। স্থির দৃষ্টি--কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে যেন কিছু বলিতে চাহিল কিন্তু গলা দিয়া বাহির হইল শুধু একটা জড়িত স্বর—জান্তব ধ্বনির মতই ভাষাহীন; শুধু স্বর—বেদনার্ত—বিস্ময় বিমূঢ়।

ওই মেয়েটিই তাহার হারানো বোন সুমিত্রা। সুমিত্রার কোলে একটি শিশু; বোরখার আবরণের মধ্যে সে সযত্নে শিশুটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। পাছে এই আবরণের জন্য সে কাঁদে, চিৎকার করে—সেইজন্য তাহাকে স্তন্যপান করাইতেছিল। সুমিত্রার মুখ দিয়াও আর কথা সরিল না। সেও এক মুহূর্তে পঙ্গু হইয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। জিভ আড়ষ্ট হইয়া গেল। তবে যাহা বলিবার ছিল তাহা অগোচর রহিল না; যদিও বা এতটুকু সন্দেহ থাকিত তাহা নিরসন করিয়া দিল একটি ছ-সাত বছরের ছেলে। সে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আম্মা।

দেবকী সেন স্থিরদৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে অনর্গল ধারায়। অপরিসীম আতঙ্কের ছায়াও পড়িয়াছে সে মুখে। কিন্তু কই—নিষ্ঠুর আত্মগ্লানি বা আত্মার অনির্বাণ চিতাবহ্নিতে দহনের চিহ্ন কোথায়? ওই আতঙ্ক এবং চোখের জলের অন্তরালে যে মুখখানি—সে মুখ এক মায়ের মুখ। যে মা মাতৃত্ব-গৌরবে—মাতৃত্ব-সুখে পরিতৃপ্ত—সে মায়ের মুখ! আর ওই বড় ছেলেটির মুখে ফৈজুল্লার মুখের প্রতিবিম্ব।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত—যেন সুদীর্ঘ একটা কাল বলিয়া মনে হইতেছিল।

অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দে শুদ্ধ এই ক্ষণটি চকিত হইয়া উঠিল, হিংস্র উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

বন্দুক ছুঁড়িল ফৈজুল্লা।

সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মানুষ সে, তাহার রক্তে একটু যুদ্ধ-বিগ্রহের রক্তপাতের ধারা আছে। দুশো বছরও হয় নাই তাহাদের পূর্বপুরুষ, আহম্মদ শা আবদালীর লুণ্ঠন ও অবাধ হত্যাকাণ্ডের কালে লড়াই করিয়া মাশুল দিয়া, নির্যাতন ভোগ করিয়া বাঁচিয়াছে। একশো বছরও হয় নাই—সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে। তাহার উপরে ফৈজুল্লা বাংলাদেশে আসিয়া কৃষিধর্মী কালো বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তাহার নীল রক্ত ও গৌরবর্ণের আভিজাত্য-বোধের গৌরবে এবং প্রচুর সম্পদ অর্জনের অহঙ্কারে—স্বভাবের দিক দিয়া অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বোধের প্রীতিটা একান্তভাবেই মৌখিক। শুধু দল ভারি করিবার একটা ছল মাত্র। সকলের হোক বা না-হোক—ফৈজুল্লার প্রকৃতিটা একান্তভাবে এই। ভারতবর্ষের যে অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে তাহাদের সাম্রাজ্য বলিয়া মনে করে, এবং ইংরেজ চলিয়া গেলে—ভারত-বর্ষকে ঠিক সেই পুরাতন বাদশাহী মুলুক হিসাবে চায়—সে তাহাদেরই অন্যতম। এতগুলি হিন্দু আক্রমণকারীর সম্মুখে ভয়ও যে তাহার হয় নাই এমন নয়। এই হিন্দুদের সম্মুখে তাহারই পত্নীর এই সকাতর—অশ্রুসজল বিনীত ভাব তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়াও তুলিল। ভয় এবং ক্রোধ দুই মিলিয়া তাহাকে করিয়া তুলিল অধীর। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো—কিসে কি হইবে বিবেচনা করিল না—বন্দুকটা তুলিয়া ধরিয়া ফায়ার করিয়া বসিল।

ফায়ার সে করিল দেবকী সেনকে লক্ষ্য করিয়া কিন্তু হাত তাহার কাঁপিয়া গেল। একটা সমবেত জনতার সম্মুখে সে একা। বীর্য এবং সাহস তাহার যতখানিই হোক—ভয় এক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক। হাত কাঁপিল তাহার ভয়ে, তাহার ফলেই বুলেট সোজা বুকে না বিঁধিয়া বাঁ-কাধে গিয়া বিঁধিল। দেবকী সেন মাটিতে পড়িয়া গেল।

সুমিত্রা চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সে চিৎকার ঢাকা পড়িয়া গেল—প্রচণ্ডতর হিংস্র আর-একটা চিৎকারে। সে চিৎকার গভীর অরণ্যে অন্ধকার রাত্রে আহত বাঘের চিৎকার যে না-শুনিয়াছে সে অনুমান করিতে পারিবে না। তাহার পর যে কি হইল—কেমন করিয়া হইল—সে কেহ বুঝিতে পারিল না। ওই চিৎকার দিয়া উঠিল রামভল্লা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হইল—কতকগুলা ইট। ফৈজুল্লা আবার বন্দুক তুলিল—কিন্তু তাহার পূর্বেই তাহার বুকে আসিয়া পড়িল আধখানা একটা ইট। সে টলিয়া গেল—হাত হইতে বন্দুকটা খসিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া পড়িল রামভল্লা। হাতের লাঠিখানা অন্ধকার রাত্রের মশালের আলোতে একবার বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ফৈজুল্লা পড়িয়া গেল। মাথাটা তাহার দু ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

উন্মত্ত জনতা ছুটিয়া চলিল। সম্মুখেই ফৈজুল্লার বাড়ির পিছনের দরজা। আহত দেবকী সেন চিৎকার করিয়া উঠিল—না—না। না।

ওই মুহূর্তে ওই কথার কোন মূল্য নাই।

লুণ্ঠন-লোলুপ জনতা খোলা দুয়ার দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। নৈশ অন্ধকার কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিল। বাড়ির ভিতরে আশ্রয়প্রার্থী নরনারী চিৎকাব করিয়া উঠিল।

ওদিকে শহরের পশ্চিম প্রান্তে আরও এক জায়গায় বীভৎস কাণ্ড চলিয়াছিল। সে ওই পতিতা পল্লীতে। পল্লীটার ঠিক পিছনের দিকে একটি মুসলমান পল্লী। পতিতা পল্লীকে দূরে রাখিয়া—হিন্দু পল্লীর সহিত খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া শুরু হইয়াছে। হিন্দুরা এখানে ওই ব্যবধানভূমিতে দাঁড়াইয়া ঘাঁটি গাড়িয়াছে। সেইখানেই তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে ওই দেহ-ব্যবসায়িনী পল্লীটায় আগুন ধরাইয়া—ঘরে ঘরে হানা দিয়া একটা বীভৎস তাণ্ডব শুরু হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মেয়ে হাতজোড় করিয়া বলিয়াছে—যেখানে লইয়া যাইবে চল। যাহা বলিবে—সেই আদেশই মানিয়া লইব। আমাদের প্রাণে মারিয়ো না। কতকগুলি মেয়ে কোন রকমে ঘর দুয়ার ফেলিয়া পলাইয়া গিয়া রেলওয়ে ইয়ার্ডে মালগাড়িগুলির তলায় উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

পল্লীটার প্রান্তে নলিনের ঘর। তাহার পুতুল গড়িবার ও পোড়াইবার আস্তানা। ঘরখানিকে সে সাজাইয়া, সামনেটা নিজের হাতে মাটি দিয়া লেপিয়া রঙ দিয়া মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল! খানিকটা জায়গায় ফুলের গাছ পুঁতিযাছিল। নলিনের ঘরখানা জ্বলিতেছে। ধোঁয়ার মধ্যে মানুষ পোড়ার উৎকট গন্ধ উঠিতেছে। নলিন উহারই মধ্যে পুড়িতেছে।

প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল নলিনের উপর। কেহ তখন ভাবিতেও পারে নাই যে এমনটা হইবে। কলিকাতায় পনেরই আগস্ট অ্যাকশনের মতো—ঠিক ওই পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিল ফৈজুল্লা। ময়ূরাক্ষীর ওপার হইতে, এদিকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে একটা সংকেত অনুযায়ী রাত্রিকালে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা ছিল। কিন্তু সে কল্পনা অনুযায়ী কাজ হয় নাই। অকস্মাৎ বাজারে সামান্য ঝগড়া-ঝাঁটি উপলক্ষ করিয়া একজন মুসলমান মাংসবিক্রেতা একজন হিন্দু খরিদ্দারকে ছুরি মারিয়াই ব্যাপারটা শুরু করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আরও ছুরির আঘাত হইল। জন-চারেক মুসলমানও ডাণ্ডার আঘাত এবং ছুরি খাইল। ইহার পরেই রাত্রির প্রথম প্রহরেই ফৈজুল্লার নিজের পল্লীর মুসলমানেরা তাহাদের পল্লীর ওপাশে অবস্থিত হিন্দু পল্লীটিতে আগুন ধরাইয়া খুন হাঙ্গামা শুরু করিয়া দিল। ওদিকে ওই পতিতা পল্লীতেও অতর্কিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নলিন তখন স্টেশনের ধারে তাহার গ্রীন কেবিনে—দোকানে বসিয়াছিল। ওদিকে আগুন দেখিয়া সে কেবিন বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। তখন হিন্দু পল্লীর প্রান্তে হিন্দুরা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু অগ্রসর হইতেছে না। ওই হতভাগিনীগুলির জন্য কাহারও কোন তাগিদও নাই। আর পাড়াটায় এমনভাবে একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে আগুন ধরাইয়াছে যে যাইতেও ভরসা হয় না।

নলিন কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুতুল—তাহার পুতুল গড়িবার ছাঁচ—তাহার তুলি, রঙ, খোদাইয়ের যন্ত্র, জীবনের সাধনার সব—সব—সব যে ওইখানে।

কে একজন চিৎকার করিয়া ডাকিল—এই—এই—কে ?

নলিন চিৎকার করিয়া উত্তর দিল—আমার ঘর। আমার পুতুল—আমার সর্বস্ব।

—নলিন—নলে !

—না—না-না !

দেখিতে দেখিতে সে ওই জ্বলন্ত পল্লীটার গলিপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। জ্বলন্ত ঘর-গুলির মধ্যে গলিপথ। ছোট-ছোট খুপরির ঘর। ঘরের মধ্যে নারীকণ্ঠের চিৎকার ও বর্বর মানুষের বীভৎস উল্লাসধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। একটা খোলা জায়গায় একটা তরুণী হতভাগিনীর উপর একজন পুরুষ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জনকয়েক সেই পাশব দৃশ্য দেখিয়া উল্লাসে চিৎকার করিতেছে। নলিনের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে ছুটিয়া গিয়া নিজের বাড়িতে ঢুকিল। ঘরের দরজা ভাঙা, ভিতরের সবকিছু বিপর্যস্ত, সব তছনছ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

হঠাৎ পিছন হইতে জন দুই-তিন আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

অরুণার মুখের আদল লইয়া সে দেবীমূর্তি গড়িয়াছিল—সেকথা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। সেই ব্যাপার হইতে দরবারী শেখ দারোগার উপর গুলি চলিয়াছিল তাহাও তাহাদের মনে আছে। নলিনের সে সব কথা মনে পড়িল না। সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন আমার এ সর্বনাশ করলি ?

একজন ছুরি বাহির করিল—শালা হারামী !

নলিন সভয়ে চোখ বুজিল।

একজন বলিল—আগে শালার মুখে থুক্ দে। দে !

মুহূর্তে—এই কথাটিতে নলিনের কি হইয়া গেল। একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহে সে যেন জ্বলন্ত চকিত হইয়া উঠিল। এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরের ঘরটার কোণ হইতে একখানা খাঁড়া লইয়া দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—আয়।

দুয়ারের ফাঁকে খাঁড়াখানা ঝলসিয়া উঠিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল আক্রমণকারীরা। এমন ক্ষেত্রে প্রবেশ করা আর নিজের মুণ্ড দেওয়া এক কথা। ঘরের মধ্যে আর জানালা বা দরজা নাই।

একজন বলিল—বেরিয়ে আয়। কথা দিচ্ছি জানে তোকে মারব না।

নলিন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—শুধু তু জাত দে !

নলিন আবার হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলোয় দরজার ওপাশটা আলোয় আলোময় হইয়া গেল। এরই মধ্যে একজন বাহিরে গিয়া মশাল ধরাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

—বেরিয়ে আয়—নইলে পুড়িয়ে মারব।

নলিন, ভীরু—মুখচোরা নলিন বোধহয় পাগল হইয়া গিয়াছে। তবুও আলোকিত দুয়ারের সম্মুখে খাঁড়াখানা লইয়া বাতাস কোপাইতেছে, মশালের আলোয় বাহির হইতে—সেই দৃশ্য আরও ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে, আর শোনা যাইতেছে তাহার অট্টহাসি। হা-হা। হা-হা-হা!

লোকে বলে নলিন পিতৃপরিচয়হীন! সেই অপবাদে সে জাতিহীন! পতিতের আশ্রয় বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় লইয়া সে একপাশে চিরদিন পড়িয়া আছে। এখানে আসিয়া পতিতাদের পাড়ার একপ্রান্তে ঘর বাঁধিয়াছে।

—দে তবে আগুন।

আগুন ধরিয়া উঠিল! একেবারে এ-দিক হইতে ও-দিক!

সেই আগুনের ধোঁয়ায়—মানুষের মাংস-মেদ-মজ্জা দহনের গন্ধ উঠিতেছে। ওদিকে রেললাইনের দিক হইতে সমবেত চিৎকার আগাইয়া আসিতেছে। হিন্দু কুলির দল।

—কালিমায়িকী জয়!

—আপনি এখনো জেগে রয়েছেন দাদু?

দাঙ্গা চলিতেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ। সেদিন গভীর রাত্রে অরুণা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল।

অরুণা বিনিদ্র হইয়াই ছিল, অকস্মাৎ বাহিরে কিছুর শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া আলো জ্বালিতেই পাশের ঘর হইতে ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভয় নেই ভাই। কোন নিশাচর চতুষ্পদ শুকনো পাতার উপর ছুটে পালাচ্ছে। আজকের তাণ্ডবের রাত্রে মানুষ এলে তারা রব না-করে আসতো না। তাণ্ডবের ধর্মই হল উন্মত্ত উল্লাস।

বাহিরে জংশন শহরে দাঙ্গা চলিয়াছে। এখনও পর্যন্ত শাসক-সম্প্রদায় অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। লোকের ধারণা—এ অক্ষমতা অভিপ্রায়মূলক। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান—এ দেশের লোককে বুঝাইতে চান—চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চান যে, বিবদমান এই দুই সম্প্রদায় একমাত্র তাঁহাদেরই সুশাসনে—এবং সুদৃঢ় ব্যবস্থার মধ্যে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিতে পারে। অন্যথায় হিংসা-দ্বেষে জর্জর জান্তব আবেগে পরস্পরের টুঁটি কামড়াইয়া দেশের মাটি রক্তাক্ত করিয়া দিয়া শ্মশান করিয়া তুলিবে।

দেবুদের দল শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বত্র ঘুরিতেছে—প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সে কথা থাক। কমিটি করিয়া, সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া—আপোস করা যায়—রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহার নাম সন্ধি, মামলার ক্ষেত্রে তাহার নাম আপোস, মিটমাট—পঞ্চজন তাহাতে সাক্ষী থাকে—আদালতে স্বাক্ষর শীলমোহর দেয়। কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন তাহাতে হয় না। সে বুঝাপড়া স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই তো—এই জংশনেইএইবার লইয়া এই দাঙ্গা কত বৎসর ধরিয়া ধূমায়মান—তাহার হিসাব সঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

এখানকার প্রাচীন লোকেরা বলে—যেদিন তুর্কীরা আসিয়া এদেশে জবর-দখল গাড়িয়াছে সেইদিন হইতে। ইতিহাসের তারিখ দেখ—খুঁজিয়া পাইবে। শত শত বৎসর হইয়া গেল—এই অত্যাচার তাহারা সহ্য করিয়া আসিতেছে। ইহা কি সহ্য হয়? ইহার একটা মীমাংসা প্রয়োজন।

ইরসাদ বলে—আরও অনেক কাল আগে হইতে। ইতিহাসে তাহার তারিখ সঠিক খুঁজিয়া পাইবে না। শত শত বৎসর কি—হাজার, দুই হাজার বৎসর। যখন এই দেশে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া জবর দখল গাড়িয়াছে—সেইদিন হইতে। শূন্য পুরাণ খুঁজিয়া দেখ,—দেখিতে পাইবে—এই পলিমাটির দেশের খাঁটি বাসিন্দারা ওই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল—তখনই তুর্কীরা আসিয়া তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছিল। সেই পরিত্রাণের জন্যই তাহারা এই উদার ইসলামকে গ্রহণ করিয়াছিল। এ বিবাদের মোড় ফিরিয়াছে—ওই কাল হইতে! মীমাংসাটুকুই শুধু বাকি।

দেবুরা বলে—হিন্দু প্রবীণদের কথাটা নিতান্তই মাঝখানের কথা। ইরসাদের কথাটা আংশিক সত্য। আসল সত্যটা আজ চাপা পড়িয়াছে। সেটা হইল প্রাচীন ঝগড়াটা যাই থাক না সেটা মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল উভয় পক্ষের চরম দুঃখের মধ্যে। ইংরাজ উভয় পক্ষকে কেনা বাঁদীর মতো আয়ত্তে আনিয়া দুই পক্ষের ঘাড়ে দুটি পা রাখিয়া যেদিন হইতে পদসেবা লইতে শুরু করিয়াছিল, সেই দিন দুই পক্ষই বুঝিয়াছিল—বিবাদটা মিথ্যা। কিন্তু আজ আবার নূতন কৌশলে ইংরাজই আবার সেই ঝগড়াটা নূতন ফুৎকারে জাগাইয়া তুলিয়াছে। দুই স্ত্রীর স্বামী যাহারা, তাহাদের এ কৌশলটা চিরকালের কৌশল। আদরের তারতম্য করিয়া—আজ ইহাকে সুয়োরানী উহাকে দুয়োরানী করার কৌশল। কেনা বাঁদীরাও এই কৌশলে আসল দুঃখের সত্য ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে জ্বলিয়া মরে।

আসল কথা যাহাই হউক—বিবাদটাই আজ সত্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম দিন রাত্রেই দেবকী সেন গুলিতে আহত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ফৈজুল্লা সাহেব মরিয়াছে, কিন্তু দুই পক্ষের নেতার অভাব হয় নাই। তাহাদের স্থান পূর্ণ হইয়াছে। ওদিকে হইতে আসিয়া ফৈজুল্লার স্থান গ্রহণ করিয়াছে দৌলত হাজির নাতি—হবিবর রহমান। তাহার পৃষ্ঠদেশে আছে ইরসাদ মোক্তার। এদিকে দেবকী সেনের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে গৌর। তিনকড়ির ছেলে গৌর—তাহার পাশে আছে রামভল্লা। তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আছে জীবন দে, সুরজমল শেঠ, এমন কি প্রচ্ছন্নভাবে সুরপতি-বাবুও আছে। থাকিবেই। মানুষের জীবনে যতকাল হিংসা আছে—ততকাল থাকিবে। ব্যক্তির জীবন শেষ হয়—কিন্তু তাহার জীবনের হিংসার অন্ত হয় না। সে হিংসা সঞ্চারিত হয় উত্তরপুরুষের জীবনে। সংক্রামিত হয় পার্শ্ববর্তীর জীবনে।

মধ্যে মধ্যে এক-আধজন নলিন আসে—তাহারাই মরিবার সময় কোন হিংসাকে রাখিয়া যায় না। তাহাদের উত্তরাধিকারীও থাকে না। পৃথিবীতে তাহারা অকাজের কাজী। গান করে, ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে।

এই কথাগুলিই অরুণা মনে-মনে ভাবিতেছিল।

দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন সকালেই গৌর জয়তারা আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—সারা বাজারে সে ঘুরিতেছে। তাহার মধ্যে অকস্মাৎ যেন দেখুড়িয়া গ্রামের দুর্ধর্ষ তিনকড়ি মণ্ডল জাগিয়া উঠিয়াছে। রামভল্লা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে। বলিয়াছে—ওরে—তোকে দেখে আমার যে তিনু দাদাকে মনে পড়ছে রে!

দেবু তাহাকে নিরস্ত করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু দেবুকে সে এককথায় বলিয়া দিয়াছে—না!

বার বার দেবু তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রতিবারই গৌর একই উত্তর দিল—না! শেষবার সে এমন হাঁক মারিয়া 'না' কথাটা উচ্চারণ করিল যে দেবু চমকিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে গৌরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

গৌর রামকে বলিল—জয়তারার আশ্রম রাখবার লোক চাই রামকাকা। দেবকী দাদা আমাকে ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার তো ওখানে থাকলে চলবে না। কাকে পাঠাবে বল দেখি?

রাম গৌরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাকে পাঠাব বাবা? রামের দল তো অনেকদিন ভেঙে গিয়েছে!

—তাহলে?

একটু ভাবিয়া রাম বলিল—বলিস তো আমি যাই। এদিকে ভদ্রলোকের দলে আমার সুবিধেও হবে না। ওদের ওই লোহার ডাণ্ডাবাজী—ছোরা—বোম—পটকা—ও সবও আমি বুঝি না। আর বন্দেমাতরমেও আমার ধাত গরম হয় না। তুই বুঝিস, ওসব ছোকরাদের নিয়ে তুই যা হয় কর। আমি যাই জয়তারা মায়ের থানে—জয়তারা—জয়কালী বলে লাঠি ধরে বসি। যদি মরি—মায়ের থানে মরব। ড্যাংডেঙিয়ে স্বগ্‌গে চলে যাব। সতীশ বাউড়িকে যদি পাই—দেখুড়েতে খবর একটা পাঠাব। ভল্লাদের যে দু-চার জন আছে—আনিয়ে নোব—বুঝলি।

সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। রামভল্লা লাঠি হাতে জয়তারা আশ্রমে আসিয়া বসিয়াছে। সন্ধ্যা নাগাদ দেখুড়িয়া শিবকালীপুর হইতেও ভল্লাদের আরও জন কয়েক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ন্যায়রত্ন বিচলিত হইয়াছেন কি হন নাই এ কথা বুঝা যায় না। নিয়মিত কার্যসূচী যথানিয়মে পালন করিয়া চলিয়াছেন। অরুণা কয়েকবারই এ কথা তুলিয়াছিল, ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন—চিন্তা করে কি করবে ভাই? আমার সামর্থ্য গিয়েছে—কি করব? এখন স্থির হয়ে যা ঘটবে—যা অনিবার্য তারই প্রতীক্ষা করতে হবে। তোমার সামর্থ্য তুমি জান। তবে যদি চিত্ত তোমার উতলা হয়—তা হলে তোমার নিরাপদ স্থানে যাওয়াই ভাল।

দেবকী সেনের আহত হওয়ার সংবাদ, নলিনের মৃত্যু সংবাদও শুনিয়াছেন। বলিয়াছেন—সেন তো এরই জন্যে সাধনা করেছে। তার কর্মের—তার সাধনার এই অনিবার্য পরিণতি! শুধু নলিন বেচারীই গেল অহেতুক!

কথাগুলি যেন হিমশীতল। এতটুকু আবেগ নাই, আসক্তি নাই, শুধুই যেন যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করিয়া গেলেন। অরুণা আর কথা বাড়ায় নাই। নীরবে আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছিল। কাজ বলিতে ন্যায়রত্নেরই সেবা পরিচর্যা। একটা ভাবনা তাহার বুকের মধ্যে অহরহ কম্পন তুলিয়া চলিয়াছে!—অজয়—! অজয়ের যে খালাস পাওয়ার কথা! সে যদি খালাস পায়! সে যদি আসে! কিন্তু এই বৃদ্ধের সম্মুখে সে কথা তুলিতে সাহস করে নাই। কে জানে—হয়তো ওই নামটি উচ্চারণ করিবামাত্র ওই বৃদ্ধের আজন্ম তপস্যায় সঞ্চয় করা এই ধৈর্যের আবরণ খসিয়া পড়িবে, মমতাকাতর মনুষ্যহৃদয় অকস্মাৎ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া জয়তারা আশ্রমের এই আরণ্য পরিবেশের শান্ত স্তব্ধতা ভাঙিয়া—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে উপহসিত হইবেন একান্ত অসহায় মানুষের মতো। তাহা হইলে—ন্যায়রত্নের যেমন এবং যত লজ্জাই হোক না কেন—তাঁহার সাধনা, তাঁহার বিশ্বাস একান্তভাবে মূল্যহীন হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়ুক না কেন—অরুণার লজ্জার তুলনায় সে কতটুকু? বিজ্ঞান ও বাস্তববাদের পথ হইতে ঘুরিয়া যে পথে সে মোড় নিয়াছে—সে পথ যে এই ভূমিকম্পে ধ্বসিয়া অতল গহ্বরের শূন্যতার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন যে ওই গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া নিজেকে শেষ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর অরুণার গত্যন্তর থাকিবে না।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু কথা তুলিলেন ন্যায়রত্ন নিজেই। বলিলেন—অজয়ের তো মুক্তির দিন আজ কালের মধ্যেই। না?

অরুণার মুহূর্তে মনে হইল—পায়ের তলার মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে—গহ্বরটা সৃষ্ট হইতে শুরু করিয়াছে।

—অরুণাদিদি! ন্যায়রত্ন আবার ডাকিলেন।

—এ্যাঁ! কোনমতে অরুণা উত্তর দিল।

অজয়ের মুক্তির কথা বলছিলাম।

হ্যাঁ—আজই তো আসবার কথা।

—এলে তো সকালের ট্রেনেই আসত।

—হ্যাঁ। সাধারণত—সকালেই ছাড়া পেয়ে থাকে বন্দীরা।

ন্যায়রত্ন আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। নীরবে জয়তারা আশ্রমের অরণ্যশোভার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পল্লবে পত্রবে অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিতেছে। কোটি কীট পতঙ্গের সম্মিলিত ধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। মন্দিরের সম্মুখের মুক্ত অঙ্গনটুকুর উর্ধ্বে একটুকরা আকাশ দেখা যায় শুধু; সেখানে থরে থরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে জ্যোতির্লোক। মাটি হইতে আকাশের ওই জ্যোতির্লোক পর্যন্ত যেন আলোক সংকেতে একটা কানাকানি চলিতেছে।

অরুণা আর থাকিতে পারিল না। সে তাহার ধৈর্যের শেষ সীমায় বোধকরি উপনীত হইয়াছিল। সে অকস্মাৎ ন্যায়রত্নের পায়ে হাত দিয়া বলিল—দাদু কি হবে?

—অজয়ের উপর সব নির্ভর করছে ভাই। যদি মুক্তি পেয়ে চলে এসে থাকে তবে তার এখানে এসে অনেক আগে পৌছনো উচিত ছিল। তা যখন আসেনি তাহলে—

—তাহলে কি ?

—তা হলে বিপদ ঘটেছে।

—দাদু ! চিৎকার করিয়া উঠিল অরুণা।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—উতলা হয়ো না ভাই।

—তাই কি ঘটেছে ? আপনি জেনেছেন ?

—না ভাই—তা জানব কি করে ?

—না দাদু, আপনি পারেন—আপনি জানতে পারেন। আমাকে লুকোচ্ছেন আপনি। আমাকে বলুন—

—না ভাই। কিছু জানতে পারি না। এতকালের সাধনায় পারি শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে। অনিবার্যকে সহ্য করতে। শোকাশ্রুকে সম্বরণ করতে। আনন্দ বিহ্বলতাকে দূরে রাখতে। জানি না কিছু—অনুমান করছি মাত্র। তবে আমার অনুমান—তাকে এই সময়ে মুক্তি দেবে না। সে যে পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করতে গিয়েছিল— সে মুসলমান, তোমার অপমান করেছিল বলেই সে তাকে হত্যা করতে গিয়েছিল। এই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় তাকে কি মুক্তি দিতে পারে ?

অরুণা শান্ত হইল কিন্তু চোখে তাহার ঘুম আসিল না।

হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘরের পিছনে পাতার উপর পদশব্দ শুনিয়া—অরুণা চকিতে উঠিয়া আলো জ্বালিল। পাশের ঘরে ন্যায়রত্ন শুইয়া ছিলেন। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল, দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়া সেই আলো দীর্ঘ রেখায় ও-ঘরে গিয়া পড়িতেই ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভয় নেই ভাই। কোন নিশাচর চতুষ্পদ—শুকনো পাতার উপর ছুটে পালাচ্ছে। আজকের তাণ্ডবের রাত্রে মানুষ এলে তারা রব না করে আসত না। তাণ্ডবের ধর্মই হোল উন্মত্ত উল্লাস।

অরুণা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি এখনো জেগে রয়েছেন দাদু ?

ন্যায়রত্ন জাগিয়া আছেন—কিন্তু সে জাগিয়া থাকা এক অদ্ভুত জাগিয়া থাকা। বহির্জগতের শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তকিছুর সঙ্গে যোগ রাখিয়াও যেন যোগ নাই। যে প্রচণ্ড প্রবহমান স্রোতে দুই তীরের মাটি ধ্বসিয়া পড়িতেছে—মূল ছিঁড়িয়া বনস্পতি আছাড় খাইয়া পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে—সেই প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে বিপুলভার শিলাখণ্ডের মতো তিনি যেন অনড়—অথচ তাঁহার নাড়ীতে যেন টান পড়িতেছে। স্থির দৃষ্টি মেলিয়া ঘরের চালের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অথচ ওই চালখানার কাঠ-খড় কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে নাই। তাঁহার সমস্ত চেতনা যেন বিপুলভার শিলাখণ্ডের মত কোন গভীরে অতল জলস্রোতের তলায় ডুবিয়া রহিয়াছে।

অরুণা মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই বৃদ্ধের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকার কথা নয়। আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসর তাঁহার ধ্যানমগ্নতা সে নিত্য দেখিতেছে। কিন্তু আজ যেন তাঁহার সেই নিত্যকার রূপের সঙ্গে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আজ যেন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া তন্ময় হইয়া যান নাই; আজ

যেন তাঁহার অন্য রূপ—আজ যেন তিনি নিজের অন্তরলোকের মধ্যে ডুব দিয়াছেন। কি যেন খুঁজিতেছেন।

সমস্ত জীবন ধরিয়া আত্মার সর্বোত্তম প্রিয় বস্তু বলি দিয়া সংসারের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-শোক—সমস্ত কিছুর নাগালের বাহিরে যে একটি মনের আসন তিনি লাভ করিয়াছেন—যে আসনে বসিয়া অহরহের জন্য একটি সুপ্রসন্ন হাস্যমাধুর্যের অধিকারী হইয়াছেন—সেই আসন কি টলিয়াছে তাঁহার? সে হাস্যমাধুর্যের প্রদীপটি কি নিভিয়া গিয়াছে আকস্মিক কোন বাত্যা বিক্ষোভে? নিরাসক্ত যে মানুষটি এই কয়দিনের দাঙ্গার প্রচণ্ডতার মধ্যেও ঘুমাইয়াছেন—তিনি আজ এই গভীর রাত্রেও বিনিদ্র কেন?

তবে কি—?

অরুণার মুহূর্তে সন্দেহ হইল—বোধহয় অজয়ের কোন সংবাদ আসিয়াছে। সেই সংবাদের আঘাত—আজ—এতদূরে উঠিয়াছে যে—সুখ-দুঃখ-আনন্দ-শোকের নাগালের বাহিরে—উর্ধ্বে স্থাপিত তাঁহার মনের আসন পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে—তাঁহাকে টানিতেছে এই মাটির পৃথিবীর বুকে এবং তিনি প্রাণপণ সাধনায় আরও—আরও উর্ধ্বলোকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্বনাথের সঙ্গে ন্যায়রত্নের শেষ সাক্ষাৎ যেদিন হয়—সেদিন অরুণা উপস্থিত ছিল! সে স্মৃতি মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে। এই জংশন শহরেরই ডাকবাংলোয় বিশ্বনাথ তাহারই হাত ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছিল—সেই মুহূর্তেই ন্যায়রত্ন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপবীতহীন বিশ্বনাথকে দেখিয়া ন্যায়রত্নের সেই মূর্তি, হৃদয়ের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব ঝড়ের বেগে বহিয়া গিয়াছিল—তাহার শব্দ তিনি প্রকাশ হইতে দেন নাই। সে দ্বন্দ্বের গতিবেগে জীবনের আশাতরু সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছিল—শিকড়ের টানে হৃদয়-ক্ষেত্রটা ফাটিয়া বোধকরি চৌচির হইয়া গিয়াছিল—তাহারও কোন লক্ষণ তিনি বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে দেন নাই! শুধু একবার বলিয়া উঠিয়াছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ। আজিকার এই স্তব্ধ জাগ্রত ন্যায়রত্নের সঙ্গে সেদিনের ন্যায়রত্নের যেন একটা সাদৃশ্য আছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা আকুল প্রশ্ন বুকের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ফাটানো আর্তনাদে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু জিহ্বাগ্র পর্যন্ত আসিয়া সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কঠোর সত্যবাদী চিকিৎসককে জীবন-সংশয় রোগী সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে যেমন রোগীর পরমাত্মীয়ের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া যায়—তেমনি ভাবেই ভয়ে সে অভিভূত হইয়া গেল। শুধু নীরবে শঙ্কাতুর অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া মাটির পুতুলের মতোই বসিয়া রহিল।

ঘরের প্রদীপটার শিখা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। অরুণার খেয়াল ছিল না। ন্যায়রত্ন একসময় বলিলেন—প্রদীপের তেল বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। একটু তেল দাও তো ভাই!

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরও আজ যেন অন্যদিনের কণ্ঠস্বর হইতে স্বতন্ত্র, পৃথক। কেমন যেন, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না। অরুণা কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিল, প্রদীপে নতুন করিয়া তেল দিয়া নতুন সলিতা দিয়া শিখাটি উজ্জ্বল করিয়া দিল এবং সেই উজ্জ্বল আলোয় একবার কোনমতে সাহস করিয়া ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিল।

ন্যায়রত্ন তাহার সে দৃষ্টি অনুভব করিলেন, তাহার মুখের দিকে না-চাহিয়াও হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—এইখানে বস।

অরুণা বসিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না! ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ন্যায়রত্ন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন! এবার সে কোনোমতে বলিয়া ফেলিল—দাদু? এই একটি শব্দের মধ্যেই তাহার আবর্ত বিক্ষুব্ধ অন্তরের সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইল! অন্তত নিজে সে তাই মনে করিল—মনে করিল সব প্রশ্ন করা হইয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন শান্ত ধীরকণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন—ভাই!

—বলুন, দাদু বলুন! আমি সব সইতে পারব। আপনি বলুন।

ন্যায়রত্ন ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তুমি কি বুঝতে পারছ কিছু? আমার আকৃতিতে কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে?

অরুণা বিস্মিত হইয়া গেল, কি বলিতেছেন তিনি—সে বুঝিতে পারিল না। সে নির্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আজ সূর্যোদয়ের পর থেকেই—তাই বা কেন—ঘুম ভাঙার পর থেকেই মন যেন আমার অতীত-কালের দিকে ফিরল। দিনের বেলা থেকেই স্মরণ করছি অতীত কালের কথা। রাত্রি হল—নারায়ণ স্মরণ করে শুলাম—নিদ্রা কোনমতেই এল না। প্রদীপের শিখা অনুজ্জ্বল হয়ে এল—চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মতো দেখতে লাগলাম বিগত প্রিয়জনকে। বিশ্বনাথ এল প্রথমে! তারপর জয়া, তারপর শশীশেখর, বউমা, তারপর শশীশেখরের মা, আমার মা, আমার পিতৃদেব—একে একে সকলেই এলেন! স্পষ্ট চোখে দেখলাম। তারপর কত লোক—এ অঞ্চলের কত ঘটনা কত কথা! ভূত কাল—তার রুক্ষ যবনিকা তুলে ধরেছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকাশ নক্ষত্র সীমাহীন স্থান সমস্ত কিছু যেন আমার মানসলোক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তুমি হঠাৎ ভয় পেয়ে এসে ঘরে ঢুকলে—তার ফলে মন সজাগ হল! কানে এল বাইরের শুকনো পাতার উপর কোন চতুষ্পদের ছুটে যাওয়ার শব্দ। তোমাকে নিশ্চিন্ত করে—আমি নিশ্চিন্ত হলাম! আমার অবস্থা আমি বুঝতে পারলাম।

ধীরে-ধীরে অতি মৃদুস্বরে তিনি কথা বলিতেছিলেন। যেন এক নিস্ফল শীতনিশীথে বৃদ্ধ বিরলপল্লব বনস্পতির শাখাগ্র হইতে একটির পর একটি পাতা ঝরিতেছিল। কখনও বা এক সঙ্গে দুই-তিনটি।

অরুণা অবাক হইয়া শুনিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল বাহিরে যেন নামিয়া আসিয়াছে এক সীমাহীন রাত্রি। কেহ যেন অতি মন্থর পদক্ষেপে পদপাত করিয়া চলিয়াছে; সে যেন হারাইয়া যাইতেছে। তিনি কি বলিতেছেন তাহাও সে যেন সম্যক বুঝিতেছে না।

একটু বিশ্রাম লইয়া ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে তাঁহার ডান হাতখানি তুলিয়া অরুণার কোলের উপর রাখিয়া বলিলেন—আয়ুর্বেদ তো তোমার পিতৃকুলের বেদ। বৈদ্য-ব্রাহ্মণের কন্যা তুমি—দেখ তো আমার নাড়ীটা—দেখ তো ভাই।

অরুণা চমকিয়া উঠিল এইবার। বলিল—শরীর কি খারাপ হয়েছে দাদু ?

—শরীর ? খারাপ ? না—সে তো কিছু নয়।

—তবে ?

—তবু বুঝতে পারছি—আমাকে যেতে হবে। দেখ না নাড়ীটা।

—আমি তো দেখতে জানি না—

—জান না ?

তিনি এবার নিজেই নিজের নাড়ী ধরিয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। অরুণার সর্বশরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল, গলায় যেন কি বাধিয়াছে, সর্বদেহে ঘাম দেখা দিয়াছে। কিছুক্ষণ পর ন্যায়রত্ন নাড়ী ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—যেতে হবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। নাড়ী দেখে বুঝবার মতো শক্তির তীক্ষ্ণতা আর নাই। না থাক ; আমার আঙুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করে দেখ, বুঝতে পারবে।

দেখিল অরুণা—আঙুলের ডগাগুলিতে, নখের মাথায় হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—অনুমান হয় সপ্তাহকাল মধ্যেই মুক্তি আসবে।

অরুণা উৎকণ্ঠাভরে বলিল—এ কথা কেন বলছেন দাদু ? কোন অসুখ তো আপনার নেই।

—না। অসুখের তো প্রয়োজন নাই ভাই। এ যে আমার সমাপ্তি, মনের মধ্যে, দেহের সর্বেন্দ্রিয়ে আমি তার স্পর্শ পাচ্ছি। অজয় তার আগেই আসবে।

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটা গভীর নিশ্বাস লইয়া চোখ বন্ধ করিলেন।

হঠাৎ বলিলেন—কে ? কে ? অ—তুমি! ঋণ শোধ নিতে এসেছ ?

চকিত হইয়া অরুণা ডাকিল—দাদু ! দাদু ! দাদু !

ন্যায়রত্নের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অরুণার মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দৃষ্টি দেখিয়া অরুণা কিছুটা আশ্বস্ত হইল। দৃষ্টিতে স্বাভাবিক চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হইল। তবু সে আর একবার ডাকিল, দাদু !

ন্যায়রত্ন একটু হাসিয়া বলিলেন—তুমি ভীত হয়েছিলে ? তন্দ্রাঘোরে আমি বোধ হয় প্রলাপ বকেছি ?

—হ্যাঁ দাদু— ! কি বলছিলেন যেন।

—প্রলাপ নয় ভাই। আচ্ছন্নতার মধ্যে অতীত কাল এসে যেন আমার সামনে দাঁড়াচ্ছে। এসে দাঁড়াল যেন দৌলত হাজির বাপ, তার সঙ্গে পীরপুরের ঠাকুর সাহেব। বললে—ঋণ পাব—শোধ দিয়ে যাও। মনে মনে হিসেব করছিলাম—ওদের পাওনার দাবী সত্য না মিথ্যে।

অরুণা বুঝিতে পারিল না। চুপ করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ন্যায়রত্নকে সে বুঝিয়াছে—তাহার কথা সাধারণ অর্থে বুঝিতে গেলে ঠকিতে হয়। ন্যায়রত্নের ঋণ—

অর্থ ঋণ তিনি কখনও কাহারও কাছে করিয়াছেন বলিয়াও তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

ন্যায়রত্ন কিন্তু আর কথা বলিলেন না। চিন্তাকুল স্থির দৃষ্টিতে নীরবে ঊর্ধ্বলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন, যে পাওনার কথা মুহূর্ত পূর্বে বলিলেন---সেই দাবীর হিসাব খতাইয়া দেখিতেছেন। স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পর বলিলেন--ওদের সঙ্গে বিশ্বনাথকেও দেখলাম। সে তাদের পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষী দিতে এসেছিল।

অনেক কাল আগে --সে-ই, আমাকে বলেছিল, বিশ্বনাথই আমাকে জানিয়েছিল— দৌলত হাজির বাপের কাছে আমাদের ঋণের কথা।

বিশ্বনাথ তখন রাজনীতি চর্চা করতে শুরু করেছে। সে কথা সে আমার কাছে গোপন রেখেছিল। আমাকে একদিন বললে—দাদু আমি এই অঞ্চলের ইতিহাস উদ্ধার করতে চাই। আপনি যদি কয়েক জায়গায় অনুরোধ করেন, তা হলে তাঁদের বাড়ির কাগজ-পত্র দেখতে পাই। পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের বাড়িতে অনেক পুরানো কাগজ আছে। পুরানো আমলের তামার পাতে লেখা নানা আকারের সনদ আছে, সেগুলো দেখলে জানতে পারব--অনেক ইতিহাস।

পীরপুরের ঠাকুর-সাহেবদের বংশ প্রাচীনতম অভিজাত মুসলমান বংশ। প্রবাদ আছে ওঁরা হলেন--আরবের এক বিখ্যাত সাধকের বংশ। ভারতবর্ষে এসে দেশ পর্যটন করতে করতে একদা আসেন ঐ জংশনে। পীরপুরে তখন ছিলেন এ অঞ্চলের এক গুরুবংশ। আমাদেরই জ্ঞাতি বংশ। সেই বংশের সঙ্গে হয় তাদের বিরোধ। রাজা তখন মুসলমান। সুতরাং যজমানদের উপর নির্ভরশীল এই নিরীহ ব্রাহ্মণ বংশকে উচ্ছেদ করতে তাদের বেগ পেতে হল না। সেই ভিটায় এই মুসলমান গুরু বাস করেন বলেই তাঁদের উপাধি ঠাকুর। এঁরা মহদ্বংশ। আমাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে এঁদের বিশেষ সম্প্রীতি জন্মেছিল; জীবন—জগৎ—জগদীশ্বর নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে। সাধকের বংশ, সর্বজন-মান্য। দিল্লীর বাদশার প্রদত্ত বহু নিষ্কর এঁরা ভোগ করেন। এঁদের বাড়িতে প্রাচীন কালের বহু নিদর্শন আছে। আমি পত্র লিখে দিলাম। বিশ্বনাথ তাঁদের বাড়ির কাগজ ঘাঁটতে লাগল। একদিন এসে বললে--

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইলেন। কথা বলিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বিশ্বনাথ একদিন বিচিত্র এক সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল।

পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের ঘরে তামার পাতের উপর যে নিষ্কর জমির সনন্দ— তাহা বাদশাহী ফরমন নয়, আসলে সে সনন্দ দেবনাগরী অক্ষরে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রাঢ়ের অধিপতি--কোন এক পরম ভট্টারকের ব্রহ্মত্র প্রদানের অনুশাসন। তাহাতে লেখা আছে—এই রাঢ়ভূমির প্রত্যন্ত সীমায় যেখানে অনার্য অধ্যুষিত অরণ্যভূমি ধর্ম এবং পুণ্যের গতিরোধ করিয়াছে, যেখানে--ওই আরণ্যভূমের অনার্য-শবর নিশ্বাস-বায়ুর সহিত নিত্য আসিয়া কলুষিত করে বায়ুমণ্ডলকে, যেখানকার ভাষায় অনার্য

ভাষার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়—যেখানকার মানুষের জিহ্বায় দেবভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ না—সেই ভূখণ্ডে বেদ-পরায়ণ, দেবভাষা-পারঙ্গম, ধর্ম ও সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টিসম্পন্ন ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরান্তর্গত—মহা-উপাধ্যায় সামশেখরেশ্বর দেবশর্মাকে এই নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইল। যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী বর্তমান থাকিবে, তাবৎ স্বকীয় ধর্ম ও কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের কল্যাণে যজ্ঞাচরণ করিয়া এবং তাহাদের সকল অনাচারের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া এই নিষ্করভূমিকে অধিকার করিয়া থাকিবেন।

এই অনুশাসন মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বংশের অনুশাসন। মূল অনুশাসন ন্যায়র বা তাঁহার পিতাপিতামহ দেখেন নাই : তবে শুনিয়াছেন—তাম্রপত্রে ঠিক এই কথা খোদিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই শ্লোকটি এখনও তাঁহাদের ঘরে প্রাচীন শা গ্রন্থসমূহের সঙ্গে একখানি তুলোট কাগজে লেখা আছে। কুলপরিচয় হিসাবেও শ্লোকটি এই বংশের বালকদের মুখস্থ করানো হইত। বাল্যকালে ন্যায়রত্ন শিবশেখরেশ্বর শিখিয়াছিলেন এই শ্লোক; তিনিই শশীশেখর এবং বিশ্বনাথ বা চন্দ্রশেখ শিখাইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ উত্তেজিত হইয়াছিল—উত্তেজনা তাহার স্বাভাবিক।

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—এতে বিস্ময়ের কি আছে? ঠাকুর বংশের আদিপুরু যিনি আমাদের ওই জ্ঞাতিবংশকে উচ্ছেদ করেছিলেন—তাদের ঘর দ্বার অধিকা করেছিলেন বাহুবলে—তাঁরা ওখানা পেয়েছিলেন সেই দখলের সময়েই। বাড়ির ধর্মগ্রন্থ শাস্ত্রগ্রন্থ আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে, কিন্তু ওখানা তামার। তাছাড়া তাঁদের অংশের জমিগুলিও তাঁরা দখল করে নূতন বাদশাহী ফরমান নিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পর বিশ্বনাথ আসিয়া একখানি প্রাচীন পুঁথির নকল তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—পড়ুন, দাদু।

সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকে শ্লোকে রচিত পুঁথি।

কোন সুপণ্ডিতের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই; ভাষার লালিত্য, রচনার পারিপাট্য ও শুদ্ধতা প্রশংসার যোগ্য।

ন্যায়রত্ন পড়িতে শুরু করিলেন।

প্রাচীন রাঢ়, দেবতা অধ্যুষিত স্থান। ব্রহ্মা কমণ্ডলুবাসিনী বিষ্ণুপদোদ্ভূতা পরম বৈষ্ণবী শিবজটাবিহারিণী গঙ্গার ধারা এই ভূমির একপ্রান্তে—অপর প্রান্তে ঝাড়খণ্ড অরণ্যভূম। অরণ্যমধ্যে অনার্যের বাস; এই অনার্যভূমির সকল কলুষ নাশ করিয়া দেবাদিদেব ঝাড়খণ্ডেশ্বর বৈদ্যনাথ বিরাজিত। তাঁহার অঙ্গের বিভূতি বায়ুস্তরে মিশ্রিত হইয়া সুকল্যাণ বিতরণ করে সকল সময়ে। রোগ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেব-বিভূতি-মাহাত্ম্যপূত এই বায়ুস্পর্শে রোগ নাশ হয়, শক্তি লাভ হয়। এই ভূমির গাভীসকল সুরভির বংশোদ্ভূতা। এই গাভী সকলের ঘৃতে দুগ্ধে পঞ্চগব্যে দেবতা পরিতৃপ্ত হন, যজ্ঞের সকল অগ্নি লেলিহান হয়ে এই ঘৃতাহুতি গ্রহণ করেন এবং পূর্ণ ফল প্রদান করেন।

এই ভূমির মধ্যে সমাজপতি—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরান্তর্গত মহামহোপাধ্যায়—শাস্ত্রজীবী—শেখরেশ্বর বংশোদ্ভূত আমি—একশাখার শেষ শেখর দেবভাষায় এই শেষ রচনা করিতেছি।

জাতির ষড়যন্ত্র আমাকে অন্যায়রূপে ধর্মাচরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিল। জাতিতে পাতিত্ব দোষ ঘটাইল। অরণ্যের অভ্যন্তরে তৃণভূমিতে কস্তুরীমৃগ আপন নাভির সুরভিতে বিভোর হইয়া থাকে। ব্যাধ চক্রাকারে সেই তৃণভূমিতে অগ্নি সংযোগ করে। অগ্নিচক্র ক্রমশ গোলকগণ্ডীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া অগ্রসর হয়। দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হওয়া ছাড়া মৃগের তখন আর উপায় থাকে না। এ ষড়যন্ত্র ঠিক তদ্রূপ। পরিত্রাণ নাই।

আমার অবস্থা ওই মৃগের মত। এ ষড়যন্ত্র ঠিক একটি অগ্নিচক্র। দেবতাকে ধ্যান করিয়া, প্রাণপণে ডাকিয়াও নিষ্কৃতি নাই; দেবতার বিরূপতার হেতু বুঝিলাম না। মরীচিকাকে বারিপ্রবাহ ভ্রম করিয়া মরুভূমিতে আসন পাতিয়া যে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়, প্রচণ্ড তৃষ্ণার ক্ষণে বারি অন্বেষণে অগ্রসর না-হওয়া পর্যন্ত তাহার যেমন ভ্রম ভাঙে না, ঠিক তেমনি ভাবেই আজিকার কঠিন বিপন্ন অবস্থায় আমার ভ্রম ভাঙিল। দেবতা মিথ্যা—অথবা পঙ্গু, শক্তিহীন। বহু পুরুষ ধরিয়া ব্যর্থ সাধনা ও মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। আজ ভ্রম ভাঙিয়াছে।

আরব দেশের রুমী জালাল সাধু দ্বারমণ্ডলে আসিল। আমি কি তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম?

দ্বারমণ্ডল—এই ভূখণ্ডের প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বারে একদা এক বিধর্মী যোগী আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। পুরাতন রাজশক্তির পতন ঘটিয়াছে। বাধা তাহাকে কে দিবে?

এই দ্বারমণ্ডল দিয়া একদা মুণ্ডিতমস্তক ক্ষপণকেরা প্রবেশ করিয়াছিল। কে বাধা দিয়াছিল? তাহারা অবাধে সমগ্র ব্রাত্য সমাজের মধ্যে তাহাদের উদ্ধত অনাচার প্রচার করিয়াছিল!

দ্বারমণ্ডলে জয়তারা আশ্রমের প্রবেশপথের পার্শ্বে মহাভৈরব নাকি সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি নাকি মহাকাল। তিনিই নাকি তাঁহার মহাশূলাগ্রে সকল অধর্ম, সকল অনাচারকে রোধ করিয়া আছেন। যদি তাহাই হয়, তবে ক্ষপণকেরা কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? তবে কি ক্ষপণকেরা মহাকালের অপেক্ষাও অধিক শক্তিধর? তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম কি সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রচারিত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়? অথবা—মহাভৈরবের লিঙ্গ-মূর্তি নিতান্তই এক প্রস্তরখণ্ড?

প্রস্তরখণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই, নিতান্ত প্রস্তর খণ্ড। দেবশক্তি, যাহা একদা এই মূর্তির মধ্যে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন—সে শক্তি অদৃশ্য হইয়াছে। পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহা অনাচার কুটীল স্বার্থবুদ্ধি আশ্রয় করিয়াছে এখানকার সমাজকে—সমাজপতিদের কয়েকজনকে। দেবতা তাঁহাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই দেবতার ইঙ্গিতেই

আরব হইতে একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মের সাধক রুমী জালাল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—এই ভূখণ্ডের প্রবেশদ্বার—দ্বারমণ্ডলে।

দ্বারমণ্ডলের ঘাটে তখন অসংখ্য বাণিজ্যতরী নদীতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। বায়ুপ্রবাহে বিভিন্নবর্ণে অনুরঞ্জিত ধ্বজা পতাকাগুলি উড্ডীয়মান ছিল শূন্যমণ্ডলে।

দামামায় আঘাত দিয়া সাধু রুমী জালাল ঘাটে অবতরণ করিল। তাহার সঙ্গে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক শিষ্য। তাহাদের কটিদেশে বিলম্বিত ছিল সুদীর্ঘ শাণিত কৃপাণ। পৃষ্ঠদেশেছিল ঢাল। বাম হস্তে ছিল সুদীর্ঘ ভল্ল।

রুমী জালাল বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিল—শাস্ত্রের বিচারে, সাধুত্বের বিচারে এবং অলৌকিক শক্তির বিচারে আমি সকলকে পরাভূত করিয়া প্রমাণ করিতে আসিয়াছি—পুত্তলিকা উপাসনা মিথ্যাচার! এই উপাসনা যাহারা করে—তাহারা কাফের। আল্লাহতালা তাহাদের ক্ষমা করেন না; অমৃতমার্গের মহিমা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। অনন্ত নরকে—দোজখে তাহাদের স্থান হয়।

দ্বারমণ্ডলে যেন যুদ্ধের দামামা বাজিল। যুদ্ধ দাও বলিয়া তাহারা উপস্থিত হইল।

দ্বারমণ্ডল ঘাটে সমবেত জনতা ভয়ে অভিভূত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। জয়তারা আশ্রমের প্রবেশদ্বারে প্রস্তরখণ্ড নিশ্চল হইয়া রহিল। দেবতা চলিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন এই পর্যন্ত পড়িয়া মুখ তুলিয়া বলিয়াছিলেন—এ পুঁথি তুমি কোথায় পেলে?

—ঠাকুর সাহেবদের বাড়িতেই। খুব পুরনো একটি বেতের ঝাঁপির মধ্যে অনেক সংস্কৃত পুঁথি পেলাম। শুনলাম—ওদের সেই আদি প্রতিষ্ঠার কাল থেকে এই পেটি ওঁদের বাড়িতে আছে। ওঁদের বিশ্বাস—ওর মধ্যে আছে এক হিন্দু সাধুর তপস্যার ফল। তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। ওঁরা কেউ সংস্কৃত জানেন না। আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেলাম। দেখলাম—

বিশ্বনাথ আবিষ্কার করিয়াছিল।

সে আবিষ্কার মিথ্যা নয়। পীরপুরের বিখ্যাত মুসলমান ঠাকুর সাহেবদের বংশ মহাগ্রামের বিখ্যাত হিন্দু গুরু-বংশের জ্ঞাতি। কয়েকশত বৎসর পূর্বে মুসলমান স্পর্শদোষে পতিত হইয়াছিলেন। পতিত করিয়াছিলেন—মহাগ্রামের হিন্দু গুরু-বংশ—অর্থাৎ জ্ঞাতিরা। রুমী জালাল দ্বারমণ্ডলে আসিয়াছিলেন সশস্ত্র শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে লইয়া। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—হয় আমাকে বিচারে পরাস্ত কর—অথবা আমার ধর্ম গ্রহণ কর।

পঁচিশজন দীর্ঘদেহ সশস্ত্র শিষ্য উচ্চকণ্ঠে তাহার জয় ঘোষণা করিয়াছিল। দ্বারমণ্ডলের অধিবাসীরা ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। পঁচিশজনের পশ্চাতে পাঁচশত বা পাঁচ সহস্রের অস্তিত্ব অনুমান করিতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই। বাংলাদেশে তখন মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদার আর ফৌজদারের অধীনে আছে ফৌজ; কাজী আছেন স্থানে স্থানে। বিচার আছে—বিচারে ন্যায়ও আছে, কিন্তু ধর্ম যে ন্যায়ের

অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। পঁচিশজন শিষ্য এখানকার সহস্র মানুষের কাছে কিছু নয়, কিন্তু ---সে সংবাদ যখন কাজী অথবা ফৌজদারের নিকট পৌছিবে তখন পাঁচশত বা সহস্র অশ্বারোহীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিতে দ্বারমণ্ডলের আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

পীরপুরের ঠাকুর সাহেবদের পূর্বপুরুষ—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরান্তর্গত মহাউপাধ্যায় বংশোদ্ভব বিধুশেখরেশ্বর এই সাধু রুমী জালালকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া বাসস্থান ও আহার্যে পরিতুষ্ট করিয়া দ্বারমণ্ডলের এই আসন্ন বিপর্যয় নিবারণ করেন। মহা-উপাধ্যায় মাত্র দেবভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন না—রাজভাষা ফারসি ও আরবী ভাষাতেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন।

রুমী জালালের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বিধর্মী গ্রাম্য গুরুর মুখে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শুনিয়া উচ্চ চীৎকারে উল্লাস প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—সূর্যালোকের মতো দিব্যভাষা এই অন্ধকারের মধ্যেও আসিয়া আপনার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরাক্ষীতটে দ্বারমণ্ডল বন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল।

সেদিন বিধুশেখরেশ্বর এই অঞ্চলের পরিত্রাতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। যে শ্রদ্ধার তিনি অধিকারী ছিলেন—সে শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রুমী জালালের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। বিধুশেখর শুধু পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্নই ছিলেন না। তিনি ছিলেন যোগ পারঙ্গম। যে যোগাভ্যাসে দেহ স্বাস্থ্যলাভ করে, আয়ু দীর্ঘ হয়, সেই যোগে তাঁর পারঙ্গমতা ছিল অসাধারণ। বন্ধুত্বের ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সাধনতত্ত্বের আলোচনায় এই যোগবিদ্যার শক্তি এবং তত্ত্ব রুমী জালালের কাছে তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। রুমী জালালের ছিল উদরের পীড়া। মধ্যে মধ্যে কঠিন যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করিতেন : শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতেন। মহা-উপাধ্যায়—যোগপারঙ্গম বিধুশেখরেশ্বর তাঁহাকে যোগাভ্যাসে অন্ত্রধৌতির পন্থায় অভ্যস্ত করিয়া সেই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করেন। রুমী জালালের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। শুধু তাই নয়—যৌগিক সাধনতত্ত্বে তাঁহার অনুরাগ হইয়া উঠিল গাঢ় হইতে গাঢ়তর। তিনি গোপনে যোগ শিক্ষায় বিধুশেখরেশ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

অন্যদিকে বিধুশেখরেশ্বর রুমী জালালের সাহচর্যের ফলে---মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় রত হইলেন। স্থানীয় কাজীর দরবারে—ফৌজদারের কাছারীতে তিনি নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল---আরবী ফার্সী উর্দু বয়েৎ আওড়াইয়া তিনি জগৎ ও জীবন-রহস্যের তত্ত্ব নিরূপণে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। বিধুশেখরে-শ্বরের অঙ্গে ক্রমে নামাবলীর পরিবর্তে কাশ্মিরী শাল উঠিল—তাঁহার পুত্র কাজীর দরবারে উকীল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পরিধানে মুসলমানী পোশাক উঠিল। অগুরু চন্দনের পরিবর্তে আতরের গন্ধ তাঁহার নিকট প্রিয়তর হইয়া উঠিল। একদা ভাগবত পাঠের আসরে বসিয়া সাধুবাদ দিতে গিয়া অভ্যাসের বশে ভ্রমক্রমে তিনি 'কেয়ামত'-'কেয়ামত' ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আশ্চর্যের কথা গুরুজনের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তিনি লজ্জা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে লজ্জা এতই সপ্রতিভ যে কপট লজ্জা বলিয়াই প্রতিভাত হইল।

সেইদিনই প্রথম সংঘর্ষ বাধিল।

বিধুশেখরেশ্বরের জ্ঞাতিভাই মহাগ্রামের শেখর বংশের জ্যোতিশেখরেশ্বর বলিলেন —বিধুশেখরেশ্বর কুলধর্মই শুধু বিপন্ন করেন নাই—এই আচরণের দ্বারা জ্ঞাতিত্বও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তোমার পুত্র কাজীর দরবারে দাসত্ব করিয়া আমাদের কুলধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং বিচ্যুতির ফল তোমার অবশ্যই অজ্ঞাত নয়। তাহার ফল সুদূরপ্রসারী। আশঙ্কা হয়—ভবিষ্যতে জাতি-ধর্মকেও বিপন্ন করিয়া সে বিরোধী আচার, এমন কি আহার গ্রহণেও বিরত হইবে না।

বিধুশেখরেশ্বর পুত্রের আচরণে মনে মনে ক্ষুব্ধ হন নাই, ইহা সত্য নয়। ক্ষুব্ধ তিনি হইয়াছিলেন; কিন্তু এমন প্রকাশ্যভাবে অপরের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া জ্ঞাতিদের নিকট হইতে এই অভিযোগ শুনিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। পাণ্ডিত্যে এবং জ্ঞানে তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং এই সময়ে প্রতিষ্ঠায়, আধিপত্যে তিনি এই অঞ্চলে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি আরও জানিতেন যে, এই জ্ঞাতি বংশ তাঁহার এই প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত। সাধু রুমী জালাল এই বংশের প্রধান জ্যোতিশেখরেশ্বরের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু জ্যোতিশেখরেশ্বর সসম্ভ্রমে তাঁহার সংস্রব এড়াইয়া চলিতেন। বলিতেন—আমার কাছে আপনি কি পাইবেন? যোগমার্গে আমার পারঙ্গমতা নাই। জ্ঞানমার্গে আমার অধিকার বিধুশেখরের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। আমার যাহা সম্বল—তাহা ধ্যানযোগে উপলব্ধির সামগ্রী। সে কেহ কাহাকেও দিতে পারে না—সাধনায় অর্জন হয়। আমি সামান্য।

এ কথা রুমী জালাল বিধুশেখরের নিকট গোপন রাখেন নাই। বিধুশেখর হাসিয়া বলিয়াছিলেন—জ্যোতিশেখর মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বলিয়াছে—। কিন্তু জ্যোতিশেখরেশ্বর সেদিনের সাবধানবাক্য শুনিয়া তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত ঈর্ষাকে স্পষ্ট অনুভব করিলেন এবং তাঁহার ক্ষোভ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলেন —কুলের জীবন যখন ক্ষীণ হয় তখনই কুলধর্মের কুলবন্ধনই তাহার রক্ষাকবচ, সেই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে, তখন এই বন্ধন ভাঙিয়া বাহিরে যাওয়ার তাহার শক্তিও থাকে না; কিন্তু কুলের জীবনে যখন গঙ্গোত্রী হইতে প্রবাহ নামে—দুকূল ভরিয়া যখন ওঠে—তখন কুলবন্ধন আর অনাবশ্যকই নয়—তাহাকে চালাইয়া চারিদিকের শুষ্ক শীর্ণ বিলখাল কৃষিক্ষেত্র জলে ভরিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে কুলবন্ধনকে রক্ষাই করে সে। কেবল আপন পরিধি কিছুটা প্রসারিত করিয়া লয়। সেটা দোষের নয়। আমার বংশে এখন গঙ্গোত্রীর প্রবাহ নামিয়াছে। এখন কুলবন্ধন আমার বংশকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চারিপার্শ্বের সকল ভূমি—শ্মশান হইতে দেবস্থল পর্যন্ত সমস্তই লেহন করিয়া, সমস্ত কিছুকেই আপন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে। ইহাতে শঙ্কিত হইবার কিছু নাই। কুলধর্ম বাহির হইতে সঞ্চয়নে সমৃদ্ধ হইতেছে, ইহাতে জাতিধর্মেরও শঙ্কার কোন কারণ নাই। সমাজের সমক্ষে যে অভিযোগ তুমি করিলে—তাহা নিতান্তই ঈর্ষাপ্রসূত বলিয়া আমি মনে করি।

জ্যোতিশেখর বলিয়াছিলেন—ঈর্ষার অভিযোগ যখন করিলে তখন আর কিছু বলিব

না। কিন্তু কূটতর্কের বা উপমার সাহায্যে সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা যায় না।

বিধুশেখরেশ্বর বলিয়াছিলেন—যাহা কূটস্থ তাহাই স্থির; কূটস্থের অর্থ অবশ্য তোমার জানা আছে। চিরস্থির। যাহা স্থিত তাহাই সত্য।

বলিয়াই তিনি স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাইতে যাইতেও আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ অর্থে মাত্র দেবভাষার শব্দই একমাত্র বলিয়া মনে করি না। ইহা ভ্রান্তি। তুমি নিতান্ত কূপমণ্ডুকের মতো নিজের রব ছাড়া অপর কোন বা কাহারও রব শ্রবণ কর নাই। সেই কারণেই এই ধারণার তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। যে আরবী শব্দ আমার পুত্র উচ্চারণ করিয়াছে সে শব্দের অর্থে সে সৎকে অসৎ বা অসুন্দরকে সুন্দর বলে নাই। সুতরাং ইহাতে এতখানি আশঙ্কার কি আছে? যাহা অনুদার—তাহাই সংসারে শঙ্কার বস্তু। শঙ্কা আমার জন্য নয়, শঙ্কা তোমার জন্য। চিন্তা করিয়া দেখিয়ো।

জ্যোতিশেখরেশ্বর আর কোন কথা বলেন নাই। প্রতিষ্ঠাবান এবং পণ্ডিত বিধুশেখরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং ভয় দুই-ই ছিল। সমাজের অভ্যন্তরেও এই লইয়া ফাটল ধরিল। বিধুশেখরেশ্বরের শিষ্যমণ্ডলী গুরুর প্রতিষ্ঠায় এবং আধিপত্যে স্বাভাবিকভাবেই গৌরব অনুভব করিত। রাজদ্বারে, কাজীর বিচারালয়ে, ফৌজদারের কাছারীতে গুরুর কল্যাণে তাহারা অধিকতর সুবিধা পাইত। ইহা ছাড়াও সামাজিক আচার ও বিচারের কঠোরতা শিথিল হওয়ায় তাহারা এক ধরনের মুক্তির আস্বাদও অনুভব করিত। অন্যদিকে জ্যোতিশেখরেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস বশেও বটে, বিধুশেখরেশ্বরের শিষ্যমণ্ডলীর এই আচরণের নিন্দা করিত, সে নিন্দা ক্রমে ঘৃণায় পরিণত হইল। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আচারে আচরণে তাহারা হইয়া উঠিল কঠোরতর। অবশেষে একদা চরম সংঘর্ষ বাধিল।

জ্যোতিশেখরেশ্বরের ব্রাহ্মণ-শিষ্য জমিদার রামনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। তাহার স্বগ্রামবাসী একজন দরিদ্র কৃষিজীবী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। ফৌজদারের কাছারীতে সে ছিল একজন চাকর। পলান্নের সুগন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া সে গোপনে ফৌজদারের গৃহে পলান্ন আহার করিয়াছিল এবং একদা মাদকের প্রভাবে অসাবধানতাবশত সে নিজেই কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর ছিল না। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সে তাহার স্ত্রী পুত্র-কন্যাকেও তাহার ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়া ফৌজদারের আশ্রয়ে নূতন সংসার পাতিবার সংকল্প করিল। কিন্তু জ্যোতিশেখরেশ্বরের শিষ্য জমিদার রামনারায়ণ বাধা দিলেন। ওই কৃষিজীবীর কয়েকজন বন্ধু সে বাধা কৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়া গোপনে ওই পরিবারটিকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিল। রামনারায়ণ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এই সাহায্যকারীদের। এই তিলপ্রমাণ কারণ ক্রমে পর্বত-প্রমাণ হইয়া উঠিল—রামনারায়ণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। তিলপ্রমাণ কারণ পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠিল যাঁহাদের উদ্যমে—তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি

দুইজন, একজন বিধুশেখরেশ্বর নিজে—অপরজন তাঁহার পুত্র ফৌজদার কাছারীর কর্মচারী। বিধুশেখরেশ্বর মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—এ অধিকার রামনারায়ণের নাই। তিনি সমাজপতি নহেন। তিনি শক্তি ও সম্পদের দম্ভে ন্যায় আচরণের নামে অন্যায় এবং অনধিকার চর্চা করিয়াছেন। আর কোন সমাজপতিরও কাহারও স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণে বাধা দিবার বা গ্রহণ করিলে সমাজে পাতিত্য দণ্ড ছাড়া অপর কোন দণ্ড দিবার অধিকার নাই। বিধুশেখরেশ্বর সাক্ষী মানিলেন এখানকার অন্যতম সমাজপতি জ্যোতিশেখরেশ্বরকে। জ্যোতিশেখরেশ্বরকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইল।

অপমানে ক্ষোভে রামনারায়ণ উকীল লইয়া গেলেন দিল্লী। সেখান হইতে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া যখন ফিরিলেন তখন তিনি নিজেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। বাড়ি ফিরিয়া তিনি সর্বপ্রথম নিজের মা ছাড়া অপর সকলকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহার মধ্যে ছিলেন বিধুশেখরের ভাগিনেয়ী রামনারায়ণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ। ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ না দিয়াই তিনি গ্রামে ফিরিয়াছিলেন। নহিলে বিধবা হয়তো পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। শুধু তাই নয়, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তিনি বিবাহ করিলেন।

বিধুশেখর ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলেন। ফৌজদার হাসিয়া তাঁহাকে পরোয়ানা দেখাইলেন। ফৌজদার স্থানান্তরে বদলী হইয়াছেন। এখানকার ফৌজদার হইয়া আসিয়াছেন—মালিক নাসির খাঁ। তিনি আর কেহ নহেন—তিনি রামনারায়ণ রায়।

মালিক নাসির খাঁ বিধুশেখরেশ্বরের কোন অসম্মান করিলেন না। সসম্মানে আসন দিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—আপনি কূপমণ্ডুক নহেন—আপনি সকল ধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতী। আপনি কি ওই ভাগ্যবঞ্চিতা যুবতী ভাগিনেয়ীর নিস্ফল জীবন—এবং অন্যায় বঞ্চনাকে সমর্থন করেন? এবং আপনার ভাগিনেয়ী যদি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন—তবে আপনার অসমর্থন বা প্রতিবাদ করিবারই বা অধিকার কি?

নতমস্তকে বিধুশেখরেশ্বর স্থান ত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরেই কাজীর আদালতে বিধুশেখরের পুত্র অভিযুক্ত হইলেন। অভিযোগকারিণী মালিক নাসির খাঁর বিধবা ভগ্নী। তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া পরিশেষে বিধুশেখরের পুত্র নাকি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইহার পর বিধুশেখরেশ্বরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর কি ছিল? কিন্তু ইহার জন্য বিধুশেখর এবং রামনারায়ণ উভয় পক্ষেরই আক্রোশ পড়িল—জ্যোতিশেখরের উপর।

*　　　*　　　*

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ইরসাদ মল্লিক রামনারায়ণ রায়ের বংশধর। বিশ্বনাথই তাকে জানিয়েছিল এ-কথা।

তিনি হাসিলেন—বলিলেন—স্বপ্নে দেখলাম—ইরসাদও এসেছে ঋণ শোধ নিতে। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম। বললাম—কারও কাছে আমার ঋণ নেই। আমি সমস্তকিছুকে অতিক্রম করে এসেছি। তুমি ফিরে যাও।" সে ফিরে গেল। না,

কারও কাছেই আমার কোন ঋণ নেই।

তিনি একটা প্রশান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইলেন।

অরুণা এতক্ষণ প্রায় শ্বাস রুদ্ধ করিয়া এই দীর্ঘ ইতিহাস শুনিতেছিল। অসংখ্য প্রশ্ন তাহার অন্তরের মধ্যে উঠিয়া একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু সে সব প্রশ্ন তুলিয়া এই ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটিকে সে বিব্রত করিতে চাহিল না। শুধু বিষণ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি হাত সে বরাবর তাঁহার পায়ের উপর রাখিয়াছিল, সে পায়ে উষ্ণতা নাই, শীতল। এতক্ষণে এই বিচিত্র উপাখ্যান বা ইতিহাস শুনিতে বসিয়া সে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে এটা তাহার সচেতন উপলব্ধির মধ্যে এক বিন্দু সাড়া তুলিতে পারে নাই। এইবার তাহার সে খেয়াল হইল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওই বিচিত্র বৃদ্ধের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সে সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? একজন চিকিৎসকের সাহায্যের প্রয়োজন যে অবিলম্বে। কিন্তু এই রাত্রির শেষ প্রহরের এই হিংসা-উন্মত্ত দাঙ্গার সময়ে কোন চিকিৎসক আসিবে। আসিতে পারিত এক দেবকী সেন। কিন্তু সে—। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল সে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে সন্তর্পণে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে রামভল্লা আছে—তাহাকে একবার পাঠাইলে হয় না? কিন্তু কাহার কাছে! সুরপতিবাবুর কাছে পাঠাইতে পারে। দেবুবাবুর কাছেও পাঠাইলে হয়। তাঁহারা কোন চিকিৎসক অবশ্যই লইয়া আসিবেন।

রামভল্লা গভীর ঘুমে তাহার বিরাট দেহখানাকে এলাইয়া দিয়াছে। নাক ডাকিতেছে। অনেক ভাবিয়া তাহাকে গায়ে ঠেলা দিয়া সে মৃদুস্বরে ডাকিল—রাম! রাম! রাম!

রামভল্লা ঘুমাইয়া পড়িলেও মনের মধ্যে দাঙ্গার ভাবনা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গায়ে ঠেলা পাইয়া জাগিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আচমকা হাঁক দিয়া উঠিল যে—অরুণার লজ্জার সীমা রহিল না। আশঙ্কাও হইল যে, হয়তো ন্যায়রত্ন চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। হয়তো সেই চাঞ্চল্যে তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবেন। সে তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরেই রামকে বলিল—চুপ কর রাম; ভয় নেই। চুপ কর! আমি—আমি! ভয় নেই।

রাঙা চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া রাম বলিল—মা! তুমি!

অরুণা মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া ন্যায়রত্নকে দেখিয়া লইয়া বলিল—হ্যাঁ আমি। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল সে। ন্যায়রত্ন স্থির হইয়া শুইয়া আছেন।

রাম বলিল—ডাকলে কেন মা?

—আস্তে বাবা। ঠাকুরের ঘুম ভেঙে যাবে। সবে এই একবার তাঁর তন্দ্রা এসেছে। সমস্ত রাত্রি ঘুমানান। একবার লাইন পার হয়ে ওপারে যেতে হবে বাবা।

—কেন?

—ঠাকুরের শরীরটা খারাপ হয়েছে। আমার যেন কেমন ভাল লাগছে না।

হাত-পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। মধ্যে মধ্যে বকছেন বিড়বিড় করে।

রাম ভুরু কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল—ঠাকুর নিজে কি বলছে গো? তেনাকে জিজ্ঞাসা করেছ?

—করেছি।

—কি বললেন?

অকস্মাৎ অরুণার বুকের মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কথা বলিতে গিয়া সে কথা বলিতে পারিল না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

—কাঁদছ কেনে? কি বলেছে ঠাকুর?

প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া অরুণা বলিল—উনি বলছেন—

—কি বলছেন? দেহ রাখবেন?

—হ্যাঁ।

—তা যদি বলে থাকেন,—তবে—বার কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাম হাসিয়া বলিল—তবে আর এই রেতে ছুটে গিয়ে কি হবে? ওঁকে শুধিয়েছ?

—ওঁকে কি শুধাব রাম?

—এই দেখ, ওঁকে না শুধিয়ে ডাক্তার বদ্যি ডাকে? উনি যদি বলেন—কেনে ডাকলে?

—আমার মন যে মানছে না বাবা। তাছাড়া অজয় ফিরে এসে যদি বলে—তুমি ডাক্তার ডাকলে না কেন?

—বলবে, উনি মানা করেছিলেন। চল—আমি শুধাই—। বলিয়া সে অরুণার সম্মতির অপেক্ষা করিল না। ভিতরে আসিয়া—তাহার স্বভাবসিদ্ধ উঁচু মোটা গলায় ডাকিল—ঠাকুরমশাই! বাবাঠাকুর!

—কে? ন্যায়রত্ন চোখ মেলিলেন।

—আমি রামভল্লা।

—কি?

—বলছি। আমার দেবতা মা বলছে—বদ্যি ডাকতে। বলছে—আপনি নাকি বলেছেন যে—এইবারে নাকি দেহ রাখবেন।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। বলিলেন—বদ্যি ডাকতে চায় অরুণা?

—হ্যাঁ।

—কি দরকার? কই অরুণা কই?

—বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে হয়তো! অ-দেবতা-মা! শুনছ গো! ঠাকুর ডাকছেন। ভেতরে এস।

অরুণার আর অস্বস্তির সীমা ছিল না। এই রামটা কি মানুষ! ছি-ছি-ছি!

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অরুণা!

অরুণা চোখ মুছিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

—বলুন।

—তুমি চিকিৎসক ডাকতে চাও ?

রাম বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ বলছেন। বলছেন—অজয় এসে যদি বলে—ডাক্তার ডাকনি কেন, তখন আমি কি জবাব দেব ?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ। অরুণা সত্য বলেছে। কালের পরিবর্তন হয়েছে। মহাগ্রামের ঠাকুর-বংশের দীক্ষায় শিক্ষায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হ্যাঁ—এ কথা অজয় বলতে পারে। আশ্চর্যের কথা নয়।

—তবে যাই ডেকে আনি।

—এখন কত রাত্রি ?

—শেষ প্রহর।

—তবে অপেক্ষা কর রাম। সকালে গিয়ে ডাকবি। বিলম্ব আছে এখনও।

—তবে আমি গিয়ে শুই গে। না কি ?

—হ্যাঁ। তবে—যখন যাবি—তখন আর এক কাজ করবি রাম।

—কি বলেন ?

—দেবু পণ্ডিতকে ডেকে আনবি।

—দেবু পণ্ডিতকে ?

—হ্যাঁ।

—এই দেখ বাবা! সে মতিচ্ছন্নটাকে আবার কেনে গো ? সে দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে আর বলছে—মুসলমানদের সঙ্গে মিটমাট কর। মিটিং কর। মিটমাট কর।

—ভালই বলছে সে। মন্দ তো বলেনি।

—না বাবা। মানতে পারলাম না। তুমি যখন বল মিটমাটের কথা—তখন তার মানে বুঝি। কিন্তু দেবুর ও কথার মানে বুঝতে পারি না। কেনে বুঝতে পারি না জান ? ও বলে কি ? ও বলে—দোষ মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর বেশি। ও আমি বুঝতে পারি। দাঙ্গা মন্দ—রক্তপাত ভাল না—এ কথা বুঝতে পারি ; কিন্তু যে বলে—হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা কর না, হিন্দু-মুসলমানে মিলে ভদ্দলোকদিগে মার, এই দেবু ঘোষ যাকে যাকে দেখিয়ে দেবে তাকে তাকে মার—তাদের সঙ্গে দাঙ্গা কর—তার কথা কি করে মানব বল ?

ন্যায়রত্ন ইতিমধ্যেই আবার ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার চোখের পাতা দুইটি আবার নিমীলিত হইয়া আসিয়াছে। তন্দ্রায় আবার তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

অরুণা অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—আর নয় বাবা রাম। বলিয়া সে মুদ্রিত চক্ষু দুটির পানে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। রাম অপ্রসন্ন মুখে বাহিরে গিয়া আবার একবার শুইয়া শরীরটাকে এলাইয়া দিল। নিজের মনেই কিছুক্ষণ বক বক করিতে করিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

অরুণাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রির শেষ প্রহরের একেবারে শেষের দিকে

ন্যায়রত্ন যেন বেশ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিশ্বাস বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। একসময় মনে হইল তাঁহার নাক ডাকিতেছে। হ্যাঁ! অতি মৃদু শব্দে তাঁহার নাক ডাকিতেছে! সে আশ্বস্ত হইয়া বিছানারই একপাশে শুইয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘুম ভাঙিল রাম ভল্লার ডাকে। তখন প্রভাতালোকে ঘরখানা ভরিয়া গিয়াছে। ন্যায়রত্ন প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিতেছে অজয়। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেবু ঘোষ এবং জংশনের প্রাচীন কবিরাজ দ্বারিক সেন।

অজয় মুক্তি পাইয়া ভোরের বাসেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ন্যায়রত্ন ক্লান্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—এস অজুমনি, এস। তোমার প্রতীক্ষাতেই বোধকরি দেহধারণ করে রয়েছি।

অজয় বলিয়া উঠিল—কেমন আছেন ঠাকুর?

—এখন ভাল। মাকে প্রণাম কর। প্রণাম কর।

ক্ষীণ প্রসন্ন কণ্ঠস্বর, মনে হয় দূর দূরান্তর—বা কাল কালান্তরের পার হইতে সে স্বর ধ্বনিত হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

ন্যায়রত্ন তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

লোকে বলিল—দেহ ত্যাগ করিলেন। প্রায় অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া তাহারা এ কথা যেন ঘোষণা করিয়া বলিতে চাহিল। বলিল—দেখ না, ভাল করে বুঝে দেখ না। বিচার করে দেখ না! অজয় ফিরে এল, তবে চোখ বুজলেন।

কেহ বলিল তিন দিন আগেই হত। তিনদিন আগেই শেষ রাতে ক্ষণ এসেছিল. ঘরের সীমানার মধ্যে অরুণা দিদিমণি পায়ের শব্দ শুনেছিল। ঠাকুর তাকে বলেছিলেন—জন্তু জানোয়ার। কিন্তু আসলে তিনি। ঠাকুর মশাই তাকে বলেছিলেন—সবুর কর বাপু। তিনদিন পরে এস। অজয় আসুক। তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হোক। তারপর এস।

কথাটার মূলে রামভল্লা। সেই নিজের বুদ্ধি ও বিশ্বাসমতো একথা প্রচার করিয়াছে। প্রথমদিন রাত্রে অরুণা তাহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া ডাক্তার ডাকিতে বলিয়াছিল; রাম তাহার কথা যাচাই করিতে সোজাসুজি ন্যায়রত্নকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দেবতা মা বলেছে বদ্যি ডাকতে। বলছে—আপনি নাকি বলেছ যে এইবারে নাকি দেহ রাখবেন।

ন্যায়রত্ন হাসিয়াছিলেন।

এত বড় কথাটার উৎপত্তি এই কয়েকটি কথাকে আশ্রয় করিয়া। ন্যায়রত্ন নূতন কালকে স্মরণ করিয়া বৈদ্য ডাকিতে বাধা দেন নাই। সকালেই প্রাচীন কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন আসিয়াছিলেন, অজয়ও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

দ্বারিক সেন নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—এতদিন কাশীবাস

করে—। বাকীটা আর বলিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া সমাগত ব্যক্তিদের কাছে বলিয়াছিলেন—আর সময় নাই। এ অবস্থায় ট্রেনে কাশী নিয়ে যাওয়া

বহুজনের মধ্যে কথাটা গুঞ্জিত হইয়া প্রায় কলরবে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং কথাটা অরুণা এবং অজয়ের কানে গিয়া উঠিতেও বিলম্ব হইল না। পরস্পরের মুখের দিকে তাহারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন চোখ বন্ধ করিয়া প্রশান্ত মুখে শুইয়াছিলেন। বাসনাকে তিনি বর্জনের চেষ্টা করিয়াছেন সমস্ত জীবন ধরিয়া। প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছেন—বাসনা তো আমি বিসর্জন দিয়েছি ভাই। তবুও যদি বাসনা তাঁহার এই পার্থিব দেহময় জীবনে অতি গোপনে—প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে ছায়ার মতো থাকিয়াই থাকে—তবে সে বাসনা ছিল অজয়কে দেখিবার বাসনা। অজয় ও অরুণার মধ্যে সকল বিদ্বেষ-বিরোধ অবসান দেখিবার বাসনা। সে বাসনাও তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মুখের প্রসন্নতা পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের মতো সম্যক-রূপে পূর্ণ।

হঠাৎ একসময় তিনি চোখ মেলিলেন—তুজনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন —কি? তোমরা বিষণ্ণ কেন?

অজয় কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—আপনার কি কষ্ট হচ্ছে ঠাকুর?

—কষ্ট? ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। কষ্ট তো নাই! বলিতে বলিতেই তাঁহার প্রসন্ন মুখ ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন—শাস্ত্রে জেনেছিলাম—যিনি জলে থাকেন তিনিই আছেন অগ্নিতে। যাঁর ছায়া অমৃত—তাঁরই ছায়া মৃত্যু। মৃত্যু ও অমৃতের মধ্যে তাঁরই স্পর্শ। আজ তা অনুভব করছি। শুধু মনে নয়—বুদ্ধিতে নয়, দেহ দিয়ে, সব চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করছি। মৃত্যুকে অমৃত বলেই মনে হচ্ছে ভাই; একটি প্রগাঢ় প্রশান্তি শান্ত সমুদ্রের মতো ধীরে ধীরে যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ন্যায়রত্নের জীবন ঠিক নিঃশেষিত তৈল প্রদীপের শিখার মতো ক্রমশ স্তিমিত হইয়া একসময় নিভিয়া গেল। ইহারই মধ্যে—ধীরে ধীরে কখনও কথা বলিয়াছেন—কমনও স্তব্ধ হইয়া বিশ্রাম করিয়াছেন বা নিজের এই অবস্থাকে আস্বাদন করিয়াছেন।

মানুষেরা অবাক হইয়া ওই আস্বাদন গ্রহণের দৃশ্য দেখিল। মৃত্যুকেই মানুষের সবচেয়ে বড ভয়।

এই কথার মধ্যে ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—ঋণ রইল মাটির কাছে। শোধের জন্য দিয়ে যাব দেহ। সে যা দিয়ে আমাকে ভরণ করেছে, পোষণ করেছে—তারই ফলে আমার এই দেহ—সে দেহ তার জন্য রইল। তবে পরম আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি। ভাগবত মহাভারত অনুশীলন করেছি সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য। যে সত্যকে মহা-ভারতের মধ্যে জেনেছিলাম—তাকে মিথ্যা বলে, অলীক বলে জগদ্ব্যাপী কোলাহল উঠেছিল আমার জীবনকালে; এই দেশেও সে কোলাহলের প্রচণ্ডতার শেষ ছিল না।

এখনও সে কোলাহল থামেনি—হয় তো বা প্রচণ্ডতর ভাবে তা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু তারও মধ্যে আমার উপলব্ধ সত্য ধ্রবতারার মতো অনির্বাণ স্থির দীপ্তিতে জ্বলছে। আমার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য পলক ফেলেনি।

আমি দেখেছি জীবনলীলা এই পুণ্যভূমে চলেছে মৃত্যুর অনুসরণকারিণী সাবিত্রীর মতো।

মহাভারত যখন প্রথম পড়েছিলাম—তখন মনে মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার—তাঁরও পরিণতি সামান্য মানুষের মতো? ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি—তিনি এই পুণ্যভূমের গুরু স্বরূপ—মন্ত্রদাতা। ভারতভূমের জীবন লীলাকে পরম পরিণতিতে উপনীত করবার জন্য—বার বার আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তাকে উপনীত করে দিয়েছেন। মহাভারতে—দ্বাপরে—কুরুক্ষেত্রে এদেশের মানুষকে হিংসা থেকে অহিংসায়—প্রেমে উপনীত করে দিয়েছেন। নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন হিংসার পরিণাম। রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যিনি প্রকট হলেন বিশ্বরূপে, কুরুক্ষেত্রে যিনি তৃতীয় পাণ্ডবকে বিশ্বরূপ দেখালেন, বললেন—কালে কালে লোকক্ষয়ের জন্য আমি আবির্ভূত হই, সৃষ্টির মধ্যে অধর্মের উচ্ছেদ করে—ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হই, তাঁর পরিণাম দেখ। গান্ধারী সামান্য মানবী, তার অভিসম্পাত তাঁকে মাথা পেতে নিতে হল। তিনি দেখলেন—ওই মাতৃহৃদয়ের মধ্যে হিংসার বিষক্রিয়া। জর্জর বিকল মাতৃহৃদয়ের শোচনীয় হিংসাতুর রূপ। ফলে খণ্ডিত ভারতকে কুরুক্ষেত্র ও অশ্বমেধের উপলক্ষে—রক্তাক্ত করে, শক্তির বলে অখণ্ড করে গড়ে তুললেন। কিন্তু দ্বারকায় তাঁর বংশে বাধল গৃহযুদ্ধ, খণ্ড খণ্ড হয়ে যদুবংশ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে একদিনে শেষ হয়ে গেল। নিজে অন্তর্হিত হলেন না, দেহত্যাগ করলেন না। ব্যাধের শরাঘাতে আহত হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে দেহত্যাগ করলেন। যদুকুলের বধূরা কন্যারা আরণ্য জাতিদের দ্বারা অপহৃত হল। ধন্য ব্যাসদেব! ধন্য স্রষ্টা! বিধাতার বিধাতা! বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বিধাতার ভ্রান্তির জন্য শাস্তি বিধানে।

এদিক দিয়ে দেখ—মহাপ্রস্থানের পথে ভারতের সাধক-পুরুষ চলেছেন তাঁর লক্ষ্যের পথে। পিছনে চাইলেন না। চললেন। উপনীতও হলেন। মহাভারতের শেষ এইখানে। কিন্তু তারপর চেয়ে দেখ—ভারতের জ্ঞান-পুরুষের পুনরাবির্ভাবের দিকে। তিনি এবার আবির্ভূত হলেন মুণ্ডিত মস্তক অমিতাভ রূপে। এসে বললেন,—হে ভারত, কুরুক্ষেত্রে তোমার হিংসার পথে চলার পর্ব শেষ হয়েছে। আরম্ভ কর নূতন মন্ত্রে তোমার সাধনা। অহিংসা মন্ত্র। তাই আমাদের বাংলা দেশে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের অনুসারী ভক্তদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন—রাধা-ঋণ পরিশোধের জন্য ব্রজধামের শ্যামকিশোর গৌরাঙ্গ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস কি জান—কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী প্রাণনাশক সাধনার পথ থেকে অগ্রসর করে দিতে মহাভারতের পার্থসারথী আবির্ভূত হয়েছেন অমিতাভ রূপে। এই পথ। হিংসা থেকে অহিংসায়, বিদ্বেষ—অপ্রেম থেকে প্রেমে.

আসক্তি থেকে নিরাসক্তিতে। সেই পথেই চলেছে ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ কতগুলি? মুষ্টিমেয়। তাদের মধ্যেই একটা অংশ আজও অহিংসায় বিশ্বাস করে। শক্তিতে হিংসায় আজও তাদের বিশ্বাস শুষ্ক. বুদ্ধির অহঙ্কারে মৃতপ্রায় শিংশপা বৃক্ষের মতো বেঁচে রয়েছে কিন্তু ভারতের বাকী অংশ সব বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসক। পারছে না তারা জীবনে তাদের মন্ত্রকে সফল করতে, তবু তারা বৈষ্ণব—এইটেই তাদের বড় পরিচয়—এইটেই সেই সত্যকে প্রমাণ করে। আজ জীবনের শেষ দিনে দেখলাম—সেই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে একটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছে—যেন আকাশের অক্ষয়-জ্যোতি নক্ষত্র মাটিতে নেমে এসেছে। এই এমন একটা বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষ গান্ধীজির সাধনার মধ্যে তার সাধনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে দেখে গেলাম। এই তো দেখে যাচ্ছি—বুঝে যাচ্ছি—ভ্রান্তিকে অবলম্বন করে জীবন কাটেনি। পৃথিবীতে এসে জেনে গেলাম সত্যকে—দেখে গেলাম সুন্দরকে—ধ্যান করে গেলাম মঙ্গলের। যারা এদেশের মানুষ হয়ে আদর্শকে ফলবতী করতে হিংসাকে প্রশ্রয় দেয়, কৌশলের নামে মিথ্যাচারকে আশ্রয় করে—তাদেরও ভালবেসে গেলাম। মনে মনে তাদের ভ্রান্তি নিরসনের কামনা করে গেলাম। ঋণ আমার নাই।

ন্যায়রত্নের কঠিন অসুখের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেই জংশন শহরে একটা অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

দাঙ্গাটা থামিয়া গেল এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। চারিদিক হইতে লোক—হিন্দু-মুসলমান সব ভিড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। ইরসাদও আসিল। দেবু আসিল, স্বর্ণ আসিল। কিন্তু তাহারা ভিতরে গেল না। যাইবার চেষ্টাও করিল না। কেমন যেন নিজেরাই দূরে সরিয়া থাকিল।

প্রায় দুইটা দিন। সে এক বিচিত্র উৎকণ্ঠা।

—কি হল?

—হয়ে—? অর্থাৎ 'হয়ে গেল নাকি?' কিন্তু প্রশ্নটা উচ্চারণ করিতে সঙ্কোচ হইল।

—এখন কি রকম?

—কত দেরি?

এমনি হাজার প্রশ্ন—হাজার জনের। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সংবাদ উচ্চারিত হইবামাত্র—লোকে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

আনন্দে স্বস্তিতে তাহারা যেন বাঁচিল।

আনন্দ বোধকরি—এমনভাবে মৃত্যুবরণের মধ্যে জীবনের জয় ঘোষিত হইল সেইজন্য। স্বস্তি নিশ্চিন্তরূপে উৎকণ্ঠা হইতে পরিত্রাণের জন্য।

মিছিল করিয়া সকলে ময়ূরাক্ষীর ঘাটে গিয়া তাঁহার সৎকার করিল। সেইখানে

শান্তি সমিতি গঠিত হইল। সমবেত সকলে প্রতিজ্ঞা করিল—যেখানেই যাহা ঘটুক না—এই অঞ্চলে—কখনই তাহারা পরস্পরের প্রতি হিংসা করিবে না। স্নান করিয়া পবিত্র অন্তরে হাসিমুখে তাহারা বাড়ি ফিরিল। সকলের চেয়ে বেশি বিগলিত হইল রামভল্লা।

আশ্চর্যের কথা। ঠিক আঠারো দিন পর—আবার দাঙ্গা বাধিল। একদা নিশীথ রাত্রে প্রচণ্ড উন্মত্ত কোলাহলে জংশন শহর আবার ভয়াল হইয়া উঠিল।

অজয় অরুণাকে বলিল—কাশী যাবে চল মা। টিকিট করে এনেছি আমি।

অরুণা তাহার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল—না। এখান ছেড়ে এক পাও আমি যাব না বাবা। দাদু কাল রাত্রে দেখা দিয়েছিলেন। অন্ধকার ঘরে ঢুকে তিনি বললেন—প্রদীপ জ্বালো ভাই। প্রদীপ নিভিয়ো না। নিভাতে নাই।
